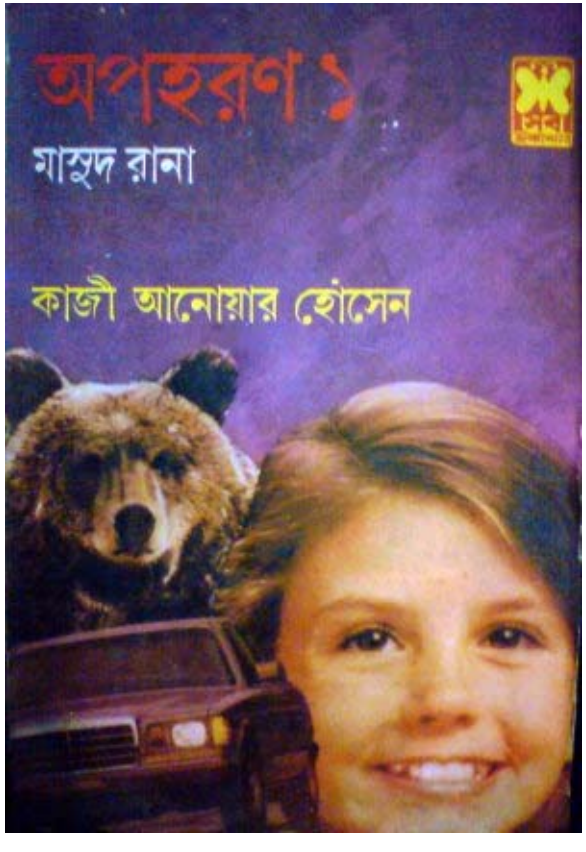

মাসুদ রানা

অপহরণ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৮৭

এক

দু'পা হাঁটছে, থামছে–একে ঠিক পায়চারি বলে না। অস্থির, আড়ষ্ট একজন লোক। এখন বেশ ভালই ফুটেছে ভোরের আলো, গবাক্ষ, গরাদহীন জানালা, চওড়া কার্নিস, ঝুল-বারান্দা, মিনার আর গম্বুজ আকৃতির ছাদ, কামান বসাবার সার সার চৌকো গর্ত, ইত্যাদি নিয়ে আকাশ ছোঁয়া দুর্গটা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো তার পিছনে। নারেসবরো গ্রাম থেকে বাঁক নিয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করে দুর্গের সামনে পৌঁচেছে রাস্তাটা, সেদিকে বার বার তাকাল রিচার্ডসন।

ভাঙাচোরা নিষ্প্রাণ দুর্গ, এপ্রিলের ভেজা ভেজা ভোরের আকাশে হেলান দিয়ে মুখ ভেঙচে আছে। বলা চলে পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ। ভারী, গম্ভীর চেহারার ফটকগুলোয় কোন্ কালে এক একটা আধমণ ওজনের তালা ঝোলানো হয়েছিল, শুধু মরচেই ধরেনি, চাবি ঢোকাবার ফুটোগুলো ধুলো ঢুকে বুজে গেছে। দুর্গটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব সামান্যই, ব্রিটিশ পর্যটন পুস্তিকায় খুঁজলে পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে দু'একটা লাইন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কাছ থেকে দেখলে নিঃসঙ্গ মনে হয় দুর্গটাকে, সময়ের সীমানা পেরিয়ে এসে বোবা পাথর বনে গেছে। এক সময় ভয়াবহ রক্তপাত ঘটেছে এখানে, পদাতিক সৈন্যরা ঝাঁক বেঁধে আসা-যাওয়া করেছে, খটাখট খটাখট ঘোড়ার খুরের

আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে দুর্গরক্ষীদের, কামানের মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠেছে গোটা এলাকা। একদিন সবই ছিল, আজ কিছুই নেই। কিন্তু রিচার্ডসনের তা মনে হলো না। অশুভ কিছু দেখতে পাচ্ছে, ঠিক তা নয়। ভূতুড়ে দুর্গের ছাদে কোন পেত্নীর কালো ছায়া হাঁটাচলা করছে না। বিদেহী কোন আত্মার করুণ বিলাপও শোনা যায়নি। এটা স্রেফ তার একটা অনুভূতি–যেন ভাঙা দেয়ালগুলোর কাছাকাছি এখুনি কিছু একটা নড়ে উঠতে পারে, হঠাৎ করে শোনা যেতে পারে আহত সৈনিকের আর্তনাদ। গোটা পরিবেশটা রোমাঞ্চকর আর রহস্যময় লাগল তার। মনে হলো, এখানে সে একা নয়। কালো জানালাগুলো থেকে উঁকি দিয়ে অশরীরী কারা যেন দেখছে তাকে।

বাস্তবে ফিরে এসে আবার রাস্তার বাঁকে তাকাল সে। গাড়ির আওয়াজ শোনার জন্য খাড়া করল কান। পাথরের ওপর দিয়ে পানি ছুটছে কলকল ছলছল–মৃদু, মধুর, কোমল একটা শব্দ। রাতের লণ্ডন থেকে একাকী গাড়ি চালিয়ে ভোর হবার খানিক আগেই এখানে পৌঁচেছে সে, নিশ্চয়ই এই পানির আওয়াজ শোনার জন্যে নয়। কোটের কলার খাড়া করল সে, ঠাণ্ডা বাতাস থেকে ঘাড়টা বাঁচল। তারপর পকেটে হাত ভরল গোলাপ কুঁড়ি বের করার জন্যে।

জোড়া গোলাপ কুঁড়ি হতে হবে, উইলিয়াম অবসন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে তাকে। অন্য কোন ফুলের কুঁড়ি হলে চলবে না। এটা একটা সঙ্কেত, দেখলেই যাতে চিনতে পারে রিচার্ডসনকে। যে সাবজেক্টকে নিয়ে এত কাঠ-খড় পোড়ানো তার কোড নেমও তাই–রোজ বাড, গোলাপ কুঁড়ি।

সেলোফেনের মোড়ক খুলে কুঁড়ি জোড়া বের করল রিচার্ডসন। অনেক নিচে, রাস্তার দিকে আরেকবার তাকাল। না গাড়ি, না গাড়ির শব্দ, কিছুই নেই। একটা কুঁড়ি থেকে পাপড়ি

ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটল সে। ভেতরে একটা অস্থিরতা বোধ করছে।

রিচার্ডসন যথেষ্ট লম্বা, কিন্তু এত লম্বা নয় যে আড়াই মণ ওজন মানিয়ে যাবে। বছরের পর বছর চেয়ারে বসে থেকে গায়ে চর্বি জমিয়ে ফেলেছে বেচারা। টকটকে লাল ফোলা মুখে চোখ দুটো চিকন একজোড়া ফাটল। বয়সের ভাঁজ পড়েছে চোখের চারপাশে, তবে সরু ফাটল জোড়ার ভেতর থেকে ঝিলিক দেয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কালো বোলার হ্যাট পরেছে সে, স্যুটটাও কালো, এ-ধরনের দেখাসাক্ষাতের জন্যে এটাই বোধহয় ঠিক রঙ। কোটের ভেতর তার কাঁধ দুটো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে, এত বছর ধরে এত সব গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেয়ার ফলশ্রুতি। চর্বিবহুল হলেও, তার ম্লান আঙুলগুলো লম্বা আর সরু। এই আঙুলে ধরা লাল গোলাপ কুঁড়ি বেমানান নয়।

মুখের সামনে একটা হাত এনে হাই তুলল সে। সব কাজ শেষ হলেও, রিপোর্টটা টাইপ করা বাকি ছিল। সন্ধে থেকে শুরু করে রাত আড়াইটা পর্যন্ত টাইপ করতে হয়েছে। সাথে সাথে রওনা হতে পারেনি, তার আগে সমস্ত প্রমাণ, চিহ্ন ইত্যাদি নষ্ট করতে হয়েছে। এক কাপ চা খাওয়ার বা পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যে চোখ বোজার সুযোগ মেলেনি। ক্লান্ত বটে, কিন্তু বিষণ্ন নয়। বগলের নিচে কালো লেদার ব্যাগে নিরাপদে রয়েছে রিপোর্টটা, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে গর্ব অনুভব করছে রিচার্ডসন। কর্নেল উইলিয়াম অবসন সময়টা ভালই বেছেছেন, দিনের আরম্ভ। রিচার্ডসনের বিশ্বাস তার জীবনে আজকের দিনটা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।

দুর্গের ভাঙাচোরা পাঁচিলের মাঝখানে পাথুরে গেটটা এখনও কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে। খোলা গেট দিয়ে রাস্তার অপর দিকটা দেখা যায়। এদিকে লোকবসতি নেই বললেই চলে,

কাফেটা খুললেও বেলা আটটার আগে সম্ভাবনা কম। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি, ঝাঁকড়া মাথাগুলো ঘন সবুজ। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে আসা রাস্তাটায় সর্বশেষ পিচ ঢালার পর কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে, খানা-খন্দে ভরা। পুব আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে দেখে আবার বাঁকের দিকে তাকাল রিচার্ডসন। গাছের পাতা ছাড়া কোথাও কিছু নড়ছে না। গোটা এলাকা নির্জন আর নিস্তব্ধ। কর্নেল আসছে না কেন?

কর্নেল উইলিয়াম অবসনের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই রিচার্ডসনের। কিন্তু লোকটা যে সি.আই.এ-র দ্বিতীয় ব্যক্তি, এটুকু তার ভাল করেই জানা আছে। এর আগে সম্ভবত প্রকাশ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় ফাঁস করার ঝুঁকি নেয়নি সে। কর্মকর্তারা এই সুযোগটা ভোগ করে–নেপথ্যে থাকে তারা, বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে। কর্নেলের মত রিচার্ডসনের চাকরিটাও নিরাপদ। ডেস্কে, প্রতিপক্ষের চোখের আড়ালে বসে কাজ করে সে। তবে কর্মকর্তারা রিভলভিং চেয়ারে বসে হুকুম দিয়েই খালাস, কাজের আসল ধকল সামলাতে হয় তার মত লোকদের। ডাটা সংগ্রহ করা, উপযুক্ত লোককে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া, রিপোর্ট লেখা, সম্ভাবনার নতুন দিক আবিষ্কারের জন্যে গবেষণা করা, সবই তাদের করতে হয়। কর্তারা পলিসি নির্ধারণ করে, পলিসি বাস্তবায়িত করে তারা। অতি মূল্যবান খুঁটিনাটি তথ্য কর্তাদের গোচরে আনার দায়িত্বও তাদেরই ওপর।

বগলের নিচে লেদার ব্যাগটা আরও জোরে চেপে ধরল রিচার্ডসন। একটা অসম্ভব অ্যাসাইনমেন্টের বিশদ রূপরেখা রয়েছে এই রিপোর্টে। অসম্ভব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এই রূপরেখা কাজে লাগতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা কাজটা করার দায়িত্ব এত থাকতে শুধু তাকেই দেয়া হয়েছে। এই পেশায় এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কর্তারা

তার কাজে দীর্ঘদিন ধরে সন্তুষ্ট, সেটাই প্রমাণিত হয়। এবার অনেক দিনের প্রাপ্য সম্মান জুটবে কপালে। না, সে কোন প্রচার পাবে না, জানে রিচার্ডসন। প্রশ্নই ওঠে না। কারণ গোটা ব্যাপারটা এক্কেবারে টপ সিক্রেট। সহকারী সহকর্মীরাও ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারবে না। তবে সবাই তার পদোন্নতি দেখতে পাবে, দেখতে পাবে ঘন ঘন কর্তাদের দফতরে ডাক পড়ছে তার। নতুন মর্যাদা পাবে সে, সবাই তাকে অন্য চোখে দেখবে। এতবছর ধরে যারা তাকে এড়িয়ে গেছে, অবহেলা করেছে, দেখেও না দেখার ভান করেছে, এরপর থেকে তারাই তার পরামর্শ পাবার জন্যে ভিড় জমাবে। খুশি হবে খাতির করার সুযোগ পেলে।

কর্নেলেরও যে কৃতিত্ব নেই, তা নয়, ভাবল রিচার্ডসন। এত লোকের ভেতর থেকে তাকে খুঁজে বের করেছে কর্নেল, এ-ও কম কথা নয়। নিজের প্রশংসা করা পছন্দ নয় তার, কিন্তু কর্নেল যে সেরা রিসার্চ অ্যানালিস্ট-কে খুঁজে বের করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কাজের জন্যে তারচেয়ে উপযুক্ত লোক আর কই! তাছাড়া, শুধু উপযুক্ত হলেই তো হয় না, বিশ্বস্ততাও থাকতে হয়। কেউ বলতে পারবে তার রেকর্ডে কোন লাল কালির আঁচড় আছে?

হঠাৎ থেমে পায়ের কাছে মাটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল রিচার্ডসন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? হাতের গোলাপ কুঁড়ির দিকে তাকাল সে। এটা কি অশুভ কোন লক্ষণ? ঝুঁকল সে, মাটি থেকে তুলে নিল অক্ষত, প্রায় তাজা একটা পাপড়ি। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কে জানে তার হাত লেগে কুঁড়ি থেকে খসে পড়েছিল। আগের পাপড়িটা থো থো করে মুখ থেকে ফেলে দিল সে, দ্বিতীয়টা দাঁতের মাঝখানে আটকাল। নিজের চারপাশে মাটিতে ভাল করে তাকাল, না, আর পড়েনি। সিধে হতে যাবে,

চোখের কোণে কি যেন নড়তে দেখে স্থির হয়ে গেল সে।

ডান দিকে।

দুর্গের নিচের ঢাল থেকে আসছে লোকটা। গোটা দুর্গটাকেই ঘিরে আছে ঢাল, পায়ে হাঁটা সরু পথ ধরে প্রশস্ত লনে উঠে আসছে সে। কোন তাড়া নেই, ধীর পায়ে, অলস ভঙ্গিতে। এতটা দূর থেকেও মনে মনে প্রভাবিত হলো রিচার্ডসন। আগন্তুককে মোটেও সি.আই.এ-র হোমরাচোমরা কেউ বলে মনে হলো না। পরনে দামী কোন স্যুট নয়, জুতো জোড়া ইটালিয়ান চামড়া দিয়েও তৈরি নয়। রঙ চটা জিনসের ট্রাউজার পরে আছে, পায়ে সাধারণ একজোড়া ম্লান রঙের জুতো, মাথায় নীল নাবিকের ক্যাপ, ভুরু পর্যন্ত নেমে এসেছে। এরচেয়ে নিখুঁত ছদ্মবেশ আর কি হতে পারে? একজন নাবিক, প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। আশ্চর্য, রিচার্ডসন ধারণাও করেনি, এত থাকতে ওদিক থেকে আসবে কর্নেল।

গোলাপ কুঁড়ির বোঁটা দুটো দু'আঙুলের মাঝখানে আটকে নিয়ে এগোল রিচার্ডসন। পায়ে হাঁটা দুর্গের যেখানে সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁচেছে, সেখানে থামল। আগন্তুক দশ হাতের ভেতর চলে এল। সবিনয় হাসির সাথে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'প্রাতঃভ্রমণ স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

'ভাগ্যিস সবাই সেটা বোঝে না!' জবাব দিল কর্নেল।

সরু পথটা ধরে দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, ঢাল বেয়ে নামল নিচের লনে। লনের কিনারা থেকে ঝপ্ করে নেমে গেছে মাটি, নিচে নদী। লনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল কর্নেল, নদীর ওপারে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। গ্রাম বলতে দু'চারটে কুঁড়ে ঘর, নদীর দিকে পিছন ফিরে আছে, লোকজন দেখা যায় না।

'বলুন,' মৃদু কণ্ঠে, কিন্তু কর্তৃত্বের সুরে অবশেষে জানতে

চাইল কর্নেল।

কর্নেলের বয়স তার চেয়ে কম, লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ বেড়ে গেল রিচার্ডসনের। পঁয়তাল্লিশ, বড়জোর পঞ্চাশ। সরু মুখে উদ্বেগের ছিটেফোঁটাও নেই, চেহারায় নগ্নভাবে ফুটে আছে অনভিজ্ঞতার ছাপ। 'সমস্যাটা নিয়ে দিনের পর দিন মাথা ঘামিয়েছি···,' শুরু করল রিচার্ডসন।

কিন্তু কর্নেল অবসন তাকে থামিয়ে দিল। 'টেকনিক সম্পর্কে নয়, আমি ফলাফল জানতে চাই। কাজটা সম্ভব?'

'জ্বী, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল রিচার্ডসন। 'জ্বী, কাজটা করা সম্ভব।'

নদীর দিকে পিছন ফিরল কর্নেল, ধীর পায়ে দ্বিতীয় ঢালের দিকে এগোল, যেদিক থেকে এসেছে সে। সসম্ভ্রমে খানিকটা পিছনে থেকে তাকে অনুসরণ করল রিচার্ডসন। ঢাল পেরিয়ে এল ওরা। প্রায় খাড়া পাড় বেয়ে নদীর দিকে নামতে শুরু করল। 'কিভাবে?' জানতে চাইল কর্নেল।

ঠিক সময়টাতে কোত্থেকে শুরু করবে ভেবে ইতস্তত করতে লাগল রিচার্ডসন। কর্নেল সংক্ষেপে শুনতে চাইবেন, বাহুল্যবর্জিত এবং বোধগম্য হওয়া চাই। তার জানা আছে, সতর্কতার সাথে মুখ খুলতে হবে তাকে, শব্দ নির্বাচনে ভুল করা চলবে না। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে কর্নেলের পাশে চলে এল সে। 'হোয়াইট হাউস থেকে এটা চুরি দিয়ে শুরু করব আমরা।' কর্নেলের হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ গুঁজে দিল সে, সংবাদপত্রের কাটিং।

মুহূর্তের জন্যে কর্নেল অবসনের নির্লিপ্ত চেহারা উল্লাসিত হয়ে উঠল। আইডিয়াটা তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তারপরই ভুরু কোঁচকাল সে।

সন্দেহগুলো কর্নেল মুখ ফুটে প্রকাশ করার আগেই রিচার্ডসন

তাড়াহুড়ো করে বলল, 'সম্ভাব্য সবচেয়ে যোগ্য লোককে দিয়ে কাজটা করাব আমরা। সেরা প্রফেশন্যালদের একজন হতে হবে তাকে। এমন একজন, যে পিছনে কোন প্রমাণ বা সূত্র রেখে আসে না, সব মুছে পরিষ্কার…'

'হ্যাঁ, বুঝলাম,' ঝাঁঝের সাথে বলল কর্নেল। 'এ-সব আমি জানি।' কাগজের ভাঁজ খুলে ফটোটা আবার একবার দেখল সে। 'কিন্তু তারপর কি হবে? হোয়াইট হাউস থেকে ওটা চুরি করা হলো, তারপর কি ঘটবে? কিভাবে ঘটবে?' গোটা প্ল্যানটা শুনতে চাইছে সে।

'চুরি করার পর, উদ্ধারের জন্যে আমরাই সূত্র যোগান দেব, স্যার,' বলল রিচার্ডসন। গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে শব্দগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করল সে। তার হাবভাবে দক্ষ সিভিল সার্ভেন্টের পরিচয় প্রকট হয়ে উঠল। হাত দুটো পিছনে, ধীর পায়ে হাঁটছে, বগলের নিচে লেদার ব্যাগ। 'দুনিয়ার যে সব জায়গায় গোলমেলে হয়ে উঠেছে পরিবেশ, বিশেষ করে যে-সব জায়গায় আমেরিকার মর্যাদা এখনই যায়-যায় অবস্থা, সূত্রগুলো সে-সব জায়গায় ছাড়া হবে। প্রয়োজনে গোপন তৎপরতা চালিয়ে পরিবেশ আরও গরম করে তোলা যাবে। প্ল্যানটা যদি সতর্কতার সাথে করি, ছোট বড় মিলিয়ে গোটা কয়েক বিষাক্ত কাঁটাও তোলা সম্ভব হবে–এগুলো উপরি পাওনা। সূত্রগুলো এমন হবে, চুরি যাওয়া আইটেম উদ্ধারে কোন সাহায্যে আসবে না। যাতে উদ্ধার করতে না পারে তার জন্যে কাজ করব আমরা।'

'হুঁ। ভাল। কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি,' বলল কর্নেল। তার চেহারা আবার উল্লাসিত হয়ে উঠল। 'তারপর, সবশেষে, সাবজেক্টকে জায়গা মত পৌঁছে দিয়ে পুরস্কার জিতে নেব।'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু যার প্রাপ্য তার ঘাড়ে সমস্ত দায় না চাপিয়ে নয়।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না কর্নেল। পাড় বেয়ে নামল সে। তীর ঘেঁষে এগোল। অন্যমনস্ক। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'খুবই ভাল। কাজটা আপনাকে দিয়ে সত্যি ভুল করিনি দেখছি। আমি সন্তুষ্ট।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে প্রশংসাটুকু উপভোগ করল রিচার্ডসন।

'কিন্তু এসবই জল্পনাকল্পনা মাত্র। এবার বলুন, যে সাবজেক্টের কথা ভাবছেন, তাকে কি চুরি করা সম্ভব?'

'জ্বী স্যার, এটাই আসল প্রশ্ন,' বলল রিচার্ডসন। 'আমার ধারণা, সম্ভব। আসলে, স্যার, আপনি জানেন, কোন কাজই অসম্ভব নয়।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে রিচার্ডসনের দিকে ফিরল কর্নেল অবসন, কটমট করে তাকাল। 'আমি আপনাকে সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে বলিনি। আমি বলেছিলাম ফ্যাক্টস যোগাড় করে…'

একটুও ঘাবড়াল না রিচার্ডসন। মনে মনে নিজেকে শক্ত করল সে, তিক্ত হলেও সত্যি কথাটা বলতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'জ্বী না, এই কাজের উপযুক্ত লোক আমি পাইনি। নেই।'

'হোয়াট!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল কর্নেল। 'নেই?'

শান্তভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রিচার্ডসন।

'সি.আই.এ. এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তে যে-কোন মুহূর্তে আমরা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি, কোটি কোটি ডলার খরচ করে হাজার হাজার এজেন্ট পোষা হচ্ছে, আর আপনি বলছেন এই কাজের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে না?'

'সি.আই.এ.-তে যোগ্য লোকের অভাব আছে তা আমি বলিনি, স্যার। কাজটা করতে পারবে এমন লোক বেশ

কয়েকজনই আছে। কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করে কাজটা আমরা দিতে পারি না। এই জন্যে যে, কাজটা কি জানার পর ওদের বেশিরভাগেরই হয় মাথা খারাপ হয়ে যাবে, নয়তো ভয়ে গা ঢাকা দেবে–যদি খবরের কাগজে বেনামা-চিঠি পাঠিয়ে সব ফাঁস করে দেয় তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। উপযুক্ত লোক নেই অর্থে আমি বলতে চেয়েছি সব দিক থেকে যোগ্য লোক নেই। কেউ কেউ খুবই ভাল, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয়। কারও মধ্যে রয়েছে আনুগত্যের অভাব। কেউ আবার অতি চালাক, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইবে। এই কাজের গুরুদায়িত্ব মাথায় নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়...'

'তাহলে?'

রিচার্ডসন চুপ করে থাকল।

রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল কর্নেল। 'আপনি অসম্পূর্ণ একটা রিপোর্ট তৈরি করে এনেছেন?' হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল তার। 'আপনাকে আমি বলেছিলাম...'

সময় বুঝে মুখ খুলল রিচার্ডসন, 'সব দিক থেকে উপযুক্ত লোক একজনই আছে, স্যার। কিন্তু...'

'কে সে?' মারমুখো হয়ে জানতে চাইল কর্নেল।

'সি.আই.এ-র কেউ নয়,' বলল রিচার্ডসন। 'এমন কি আমেরিকানও নয়। আপনি তাকে চেনেন।'

আবার গর্জে উঠতে গিয়ে থমকে গেল কর্নেল। স্মরণ করার চেষ্টা করল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিচার্ডসনের মুখের প্রতিটি ভাঁজ লক্ষ করছে। 'নাম কি?'

'মাসুদ রানা।'

তাই তো–হ্যাঁ, অবশ্যই। মাসুদ রানা। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করল কর্নেল, প্রায় পুলকের মত একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। চিন্তিতভাবে নদীর দিকে তাকাল সে,

চট করে একবার রিচার্ডসনের নির্লিপ্ত চেহারাটা দেখে নিল। ব্যাটাচ্ছেলে গণক নাকি? মাসুদ রানার কথা তার পেটে ছিল, কিন্তু বেরুল ওর মুখ দিয়ে। কর্নেলের মনে পড়ল, কাজটা কি তা না বললেও, তার সাহায্য দরকার হবে এ-কথা কিছুদিন আগে রানাকে জানিয়েছে সে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কর্নেল। গোটা দুনিয়ার এসপিওনাজ জগতের ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। যখনই দেখা যায় কোন কাজের জন্যে মাত্র একজন উপযুক্ত লোক আছে, সেই লোকটা কেন সব সময় মাসুদ রানা হতে বাধ্য? এর কারণ অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে। কেউ বলে রানা সুপারম্যান, কেউ বলে রানা অজেয়, আবার অনেকে না জেনেই বলে রানা কখনও ব্যর্থ হয় না। এ-সব কোনটাই বিশ্বাস করে না কর্নেল। শুধু সাফল্যের খবর নয়, রানার ব্যর্থতার খবরও জানা আছে তার। তবু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে এসপিওনাজ জগতে মাসুদ রানা সত্যিই একজন নির্ভরযোগ্য এজেন্ট। কর্নেলের বিশ্বাস, শুধু একটিমাত্র অতিরিক্ত গুণ থাকায় আর সব এজেন্টদের চেয়ে অনেক আলাদা রয়েছে রানা। একশো এজেন্টকে যদি ডেকে বলা হয়, নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল পেরিয়ে সূর্য থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনতে হবে, হেসেই খুন হবে নিরানব্বুই জন। শুধু একজন, হাসির আওয়াজ থামার অপেক্ষায় বসে থাকবে, তারপর জিজ্ঞেস করবে, এ-ব্যাপারে সম্ভাব্য কি কি সাহায্য করা হবে তাকে। অর্থাৎ এই একজন কোন কাজকেই অসম্ভব বলে মনে করে না। কাজটা যত কঠিনই হোক, সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে চায়। এবং, আশ্চর্য, সম্ভাবনা যেখানে শূন্য, সেখানেও হাল ছেড়ে দেয় না–জানে চেষ্টা করাটাই পাগলামি, তবু চেষ্টা করে দেখতে চায়। এ সেই, মাসুদ রানা–শয়ে বা হাজারে নয়, লক্ষ-কোটিতে একজন।

রানা সম্পর্কে প্রায় সবই জানা আছে কর্নেলের। তবু রিচার্ডসনের ধারণা কি জানতে পারলে ভাল হয়। 'হ্যাঁ, রানাকে আমি চিনি। কিন্তু এই কাজের জন্যে আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। এত থাকতে শুধু রানাকেই আপনি উপযুক্ত ভাবলেন, কারণটা কি?'

কেশে গলা পরিষ্কার করল রিচার্ডসন। 'ওর কোন ভয় নেই,' এক কথায় জবাব দিল সে।

'মানে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, স্যার, আপনার এই কাজ কেউ নিতে চাইবে না—ভয়ে। কিন্তু মাসুদ রানার মধ্যে ওই জিনিসটা প্রায় নেই বলেই আমি জানি।'

'আপনি বলছেন কাজটা রানা করে দেবে?'

মাথা নাড়ল রিচার্ডসন। 'করতে পারবে, এটুকু জানি। করে দেবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গ। আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে অনুরোধ করে দেখতে পারেন। তবে ওকে রাজি করাবার আগে ওর বসকে যদি রাজি করাতে পারেন, সবচেয়ে ভাল হয়।'

'ব্যস? ভয় নেই এটাই ওর একমাত্র যোগ্যতা?'

মাথা নাড়ল রিচার্ডসন। 'সেরা এজেন্টদের যে-সব গুণ থাকা দরকার তার সবগুলোই আছে রানার মধ্যে।' এরপর তিন মিনিট রানার গুণের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিল সে। সবশেষে বলল, 'ওর একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম আছে, কাজেই আমরা ওর মক্কেল হতে পারি। অবশ্য অসম্ভব ফি চাইবে ও।'

'টাকা কোন সমস্যা নয়,' বিড়বিড় করে বলল কর্নেল।

'তাহলে রানাই আমাদের উদ্ধার-কর্তা,' বলল রিচার্ডসন।

'ও আমেরিকান নয়, তাতে কি সুবিধে হবে?'

'অবশ্যই। যদি নেয়, কাজটাকে স্রেফ একটা কেস হিসেবে নেবে ও,' বলল রিচার্ডসন। 'ইমোশন্যালি ইনভলভড হবে না।'

'ভয় নেই, যখন যা খুশি সাজতে পারে, গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জুড়ি নেই, অনেকগুলো ভাষা জানে, বুদ্ধিমান—আপনার ভাষায় এই হলো রানা। ও কি···?'

'দুঃখিত, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল রিচার্ডসন, 'ওর আরও একটা গুণ আছে।'

'ইয়েস?'

'চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভালবাসে রানা, বলতে পারেন এটা তার একটা নেশার মত।'

'সন্দেহ নেই, আপনি লোকটার ওপর প্রচুর রিসার্চ করেছেন।'

'জ্বী, স্যার।'

'তাহলে বলুন, রানাকে নিয়ে অসুবিধে কি?'

গম্ভীর হলো রিচার্ডসন। 'নীতির প্রশ্নে আপোষ করতে জানে না লোকটা। বড় বেশি স্বাধীনচেতা। যদি টের পায় তাকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়া হয়েছে, প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না।'

'আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন,' বলল কর্নেল। রানা এমন একটা চরিত্র, যার সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। অথচ এই কাজের জন্যে সে-ই একমাত্র উপযুক্ত লোক। 'কাজটা যাকে দিয়েই করাই, তাকে সব কথা বলা সম্ভব নয়। অন্ধকারে থেকে কাজ করতে রানা কি রাজি হবে?'

'না।'

'সব কথা বলতে হবে ওকে?'

'সব কথা, স্যার।'

ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল কর্নেল উইলিয়াম অবসন। সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে। সে-ও জানে, রানা পারবে। কিন্তু ও যদি নিষিদ্ধ এলাকায় নাক গলাতে চেষ্টা করে? ভাবল, চিন্তা কি, তারও তো ওষুধ আছে। 'জানেন সে এখন কোথায়?'

'জ্বী, স্যার। ব্রাসেলসে।' রিচার্ডসনের হৃদস্পন্দন একটু দ্রুত হলো। কালো লেদার ব্যাগটা খুলল সে। 'এই নিন, স্যার,' বলল সে। 'রানার সম্পূর্ণ ডোশিয়ে।'

অবসন কিছু বলল না। রিচার্ডসনের হাতে ধরা ডকুমেন্টের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ব্যাপারটা রিচার্ডসন লক্ষ করল না।

'আপনার জন্য আরও একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, স্যার,' বলল সে, আবার ব্যাগের ভেতর হাত ভরে দিল। 'যে প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করছি, তার বিশদ রূপরেখা তৈরি করেছি আমি। সম্ভাব্য কয়েকটা জায়গার নাম দেয়া আছে, যে-সব জায়গায় সূত্র রেখে আসতে পারব আমরা। ক্লাইমেক্সের ধরন আর দোষ চাপাবার কায়দা কি রকম হবে তাও আমি ব্যাখ্যা করেছি।' খানিক ইতস্তত করল রিচার্ডসন, তারপর আবার বলল, 'আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলেননি। শূন্য স্থানগুলো নিজেকেই আমার পূরণ করে নিতে হয়েছে–বলতে পারেন, অভিজ্ঞতার আলোকে আন্দাজ করে নিয়েছি। তবে আপনি যদি পড়েন এটা, আমার ধারণা, স্যার, প্রচুর মালমশলা দেখতে পাবেন।'

এবার আর হতাশা গোপন রাখার চেষ্টা করল না কর্নেল। স্তম্ভিত চেহারায় নগ্ন ক্রোধ ফুটে উঠল। 'আহাম্মকের মত সব আপনি কাগজে লিখে ফেলেছেন!'

গালি খেয়েও হাসল রিচার্ডসন। 'কোন ভয় নেই, স্যার। রাতের বেলা কাজ করেছি আমি, কোথাও কেউ ছিল না। সমস্ত কাগজ ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছি–সমস্ত। থাকার মধ্যে আছে শুধু এই কাগজ কটা।'

রিচার্ডসনের হাতের কাগজগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কর্নেল। দ্রুত চিন্তা করছে সে। ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা কাগজে কি লেখা ছিল কেউ তা জানতে পারবে না। কিন্তু টাইপরাইটারের

ক্যারিজে অক্ষরের ছাপ রয়ে গেছে। অবশ্য বুড়োর অফিস আর শোবার ঘরে ভাল করে তল্লাশি চালাবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। না, অফিসে বা বাড়িতে দু'একটা প্রমাণ যদি থেকেও থাকে, সেগুলো মুছে ফেলা কোন সমস্যা নয়। কাগজগুলোর দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করল সে, 'আর কোন কফি?'

'মাত্র দুটো। একটা আপনার জন্যে, আরেকটা আমার জন্যে। দুটোই রয়েছে এখানে।'

স্বস্তির হাসি ফুটল কর্নেলের চেহারায়। 'চমৎকার, রিচার্ডসন। আমি খুশি। দিন দেখি কি করেছেন আপনি।'

রিপোর্টটা নিয়ে পড়তে শুরু করল কর্নেল। নদীর তীর ঘেঁষে এগোল ওরা, তারপর একটা কাঠের বেঞ্চে বসল। কর্নেলের পাশেই বসল রিচার্ডসন। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, দুর্গের দিকে তাকাল সে। না, দেখা যায় না। দুর্গটা নদীর উঁচু পাড়ে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। নদীর বাঁকের কাছে রাস্তার ওপর কাফেটা দেখা যায়, কিন্তু অনেক দূরে। নদীর ওপারে ঘরগুলো ঢাকা পড়েছে গাছপালার আড়ালে। গরমের দিন, আকাশে মেঘ নেই, সদ্য ওঠা সূর্য এখনও তেতে ওঠেনি। পকেটে হাত ভরল রিচার্ডসন, তারপর ইতস্তত করতে লাগল। কর্তাব্যক্তির সামনে কি সিগারেট খাওয়া উচিত হবে?

সিগারেট নয়, গোলাপ কুঁড়ি জোড়া বের করল সে। দাঁত দিয়ে একটা পাপড়ি কাটল।

আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করল কর্নেল অবসন, কিন্তু মনোযোগ পড়ার দিকে। শেষ পাতাটা পড়া হতে মুখ তুলল সে, কিন্তু রিচার্ডসনের দিকে নয়।

নদী ছুটে চলেছে। স্রোত তেমন বেশি নয়, কিন্তু ঢেউ আছে। তীরের কাছাকাছি পানি থেকে উঁকি দিচ্ছে অসংখ্য পাথর। ঢেউগুলো তেড়ে এসে সেগুলোর ওপর সশব্দে ভাঙছে। সাদা

ফেনায় ফুলে আছে পানির গা। নদীর দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু রিচার্ডসন আর নিজের প্ল্যানের কথা ভাবছে সে।

রিচার্ডসনকে বেছে নিয়ে ভুল করেনি সে। লোকটা বিশ্বস্ত এবং কঠোর পরিশ্রমী। সবচেয়ে বড় কথা, সন্দেহ প্রবণ নয়। সব অর্থেই, নির্ভেজাল কেরানী–যা করতে বলা হয় তা করতে পারে, কিন্তু কল্পনাশক্তি খাটাতে উৎসাহী নয়। থাকলে তো! এই ব্যাপারটার সাথে তার সম্পর্ক আছে, এরকম ভাবার কোন কারণ নেই কারও। কিন্তু কর্নেল তাকে খুব ছোট করে দেখেছিল, সেজন্যেই অনেক বেশি তথ্য যোগান দিয়েছিল সে। ব্যাপারটা হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে, কারণ সবটুকু না হলেও গোটা ব্যাপারটার অনেকটাই আন্দাজ করে নিয়েছে রিচার্ডসন–ঘটনা ঘটতে শুরু করলে বাকিটুকু, মূল রহস্য, জেনে ফেলবে সে। অথচ এই প্ল্যানের কথা বড়জোর দু'জন জানতে পারে, তিনজনের জানা চলে না।

তবে, হ্যাঁ–প্ল্যানটা চমৎকার।

কর্নেল রিচার্ডসনের দিকে তাকাল। 'এর মধ্যে সবই আছে।'

'বললাম না!'

'আপনি ঠিক জানেন, আর কোন কপি নেই? ভুল করে কিছু ফেলে রাখেননি ডেস্কে? কিংবা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে কিছু রয়ে যায়নি?'

'স্যার, আমাকে দেখে কি মনে হয় আপনার–গর্দভ? বত্রিশ বছর কাজ করছি, কোন্ কাজের কি গুরুত্ব আমি বুঝি না?'

'তা ঠিক,' বলল কর্নেল। পকেট থেকে একটা ঝর্ণা কলম বের করল সে। অলসভঙ্গিতে ক্যাপ খুলল। রিচার্ডসনের দিকে তাক করল সেটা। সূর্যের কিনারা থেকে গোত্তা দিয়ে নেমে এল একটা সোনালি ডানার চিল, নদীর কাছাকাছি নেমে এসে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মনে হলো গাছগুলোর মগডালে বসবে।

কিন্তু না, গাছের মাথা ছাড়িয়ে উড়ে গেল সেটা, হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। এই সোনালি ডানার চিলটাকেই শেষ দেখা দেখল রিচার্ডসন। তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, নদীর ছলছল কলকল আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সেটা। ঝাঁকি খেয়ে হাত দুটো উঠে এল মুখে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দ্রুত হাতে লাশের পকেটগুলো সার্চ করল কর্নেল। নদীর পাশে ঝোপ গজিয়েছে, তার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল লাশটা। আজ কোন এক সময় কেউ যখন লাশটা দেখতে পাবে, বিষের সমস্ত চিহ্ন গায়েব হয়ে যাবে ততক্ষণে। সবাই জানবে, ছুটি কাটাতে এসে সরকারি কেরানী ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

রিচার্ডসনের রিপোর্টটা কালো লেদার ব্যাগে ভরে নিল কর্নেল উইলিয়াম অবসন। তারপর ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে নদীর কিনারা ঘেঁষে খানিকদূর হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। পিছনে পড়ে থাকল সেলোফেনের খোলা মোড়কটা, আর একজোড়া গোলাপ কুঁড়ি।

দুই

গ্রান্দ বেতান, এথেন্সের সেরা হোটেল। সাধারণত সম্রাট আর ধনকুবেররাই পায়ের ধুলো দেন এখানে। যুদ্ধের শেষ দিকে এই হোটেলেরই করিডরে আততায়ীর হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে যান উইনস্টন চার্চিল।

গ্রান্দ বেতানের একটা বার, রঁদেভো। ঝলমলে পর্দা, পালিশ করা কাঠ, আর চামড়া দিয়ে তৈরি চেয়ার, মাথার ওপর ঝুলছে ঝাড়বাতি। এক কোণে লম্বা মেহগনি কাঠের বার, ধনুক আকৃতির। এই বারের সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী, কূটনীতিক, আর গুপ্তচরদের সাথে নিচু গলায় কথা বলে বারটেণ্ডার–ট্যুর বুকে লেখা কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। এপ্রিলের সন্ধ্যা ছ'টায় ধীরে ধীরে ভরে উঠছে ঘরটা। পুরুষদের প্রায় সবার পরনেই বিজনেস স্যুট, বেশিরভাগই ট্যুরিস্ট, জানে গ্রীসে বেড়াবার জন্যে গরমকালটাই একমাত্র সময়। লাবণ্যময়ী ললনারাও আছে, পরনে উজ্জ্বল পোশাক, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা টেবিলে থোকা থোকা ফুলের মত সাজানো। যন্ত্র-সংগীত বাজছে না, শুধু কথা বলার মৃদু গুঞ্জনের মাঝখানে থেকে থেকে শোনা যায় নারীকণ্ঠের মধুর হাসি, আর গ্লাসের ভেতর টুকরো বরফের টুংটাং নড়াচড়া। সুকুমার বারটেণ্ডার সাদা পোশাক পরে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতে রূপালি ট্রে নিয়ে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে সে।

লবি থেকে রঁদেভোয় ঢুকল মাসুদ রানা। ঝাড়বাতি থেকে গোলাপী আভা বেরুচ্ছে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও। যারা দূরে তাদের অনেককেই পরিষ্কার দেখা গেল না, তবে পরিবেশটা দেহ-মনে প্রশান্তির একটা সুবাতাস বইয়ে দিল। এ যেন অনেকটা যার বাড়ি নেই তার বাড়িতে ফিরে আসা। ওয়েটারের সাহায্যে কোণের একটা টেবিল নিল ও, এখান থেকে ঘরটার সবখানে দৃষ্টি চলে। চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওয়েটারের দিকে ফিরে অর্ডার দিল, 'নির্জলা হুইস্কি।'

কোন সন্দেহ নেই ভদ্রলোক আপাদমস্তক আমেরিকান, মনে মনে ভাবল ওয়েটার। বয়স আটাশ কি ঊনত্রিশ, ছ'ফিটের কাছাকাছি লম্বা, খেলোয়াড়সুলভ একহারা গড়ন, রোদে পোড়া

তামাটে রঙ, লম্বা ফ্যাশনের চুল। নিশ্চয়ই কোন প্লেবয় হবে!

মাসুদ রানা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। আজ আমেরিকান সেজেছে, কাজেই পাসপোর্ট পরিচয়-পত্র ইত্যাদির সাথে আচরণ, হাবভাব সবকিছুই একজন আমেরিকানের মত হয়ে উঠেছে। কাল আবার সাজতে পারে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, বা রাশিয়ান, তারই সাথে ভাষাসহ আবার বদলে যাবে সবকিছু। নতুন একটা নামের সাথে ও সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ হয়ে ওঠে–কখনও এক ঘণ্টা, এক দিন, বা এক মাসের জন্যে। নামটা বদলে যাবার সাথে সাথে মানুষটাও বদলে যায়, বেরিয়ে আসে আরেক পরিচয়ে আরেক মানুষ। দুই ছদ্মবেশের মাঝখানে মানুষটা আবার মাসুদ রানা হয়ে ওঠে–নিখাদ বাংলাদেশী বাঙালী। রূপ আর পরিচয় বদলের এই অসাধারণ কৌশল আয়ত্তে আছে বলেই কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে যে-কোন আন্তর্জাতিক সীমান্ত অনায়াসে পেরোতে পারে রানা।

ট্রে হাতে ফিরে এল ওয়েটার। মুখ তুলে তাকাল রানা। লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রাখল ও। শুধু কণ্ঠস্বর শুনতে চায় ও। নানা ধরনের তথ্য সহ চারদিক থেকে ভেসে আসছে। এক এক করে কণ্ঠস্বরগুলো বাতিল করে দিল ও। নির্দিষ্ট একটা গলার জন্যে সজাগ হয়ে থাকল কান।

বেশিরভাগই ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা। কেউ কেউ ফ্রেঞ্চও বলছে। দু'একজন বলছে জার্মান। কেউ গ্রীক বলছে না।

জার্মান বলছে দু'একজন।

প্রথম কণ্ঠস্বরটা পুরুষের, ভরাট। কথা শেষ হবার আগেই নারী কণ্ঠের সুরেলা হাসি, তারপর একই ভাষায় উত্তর। মেয়েটার বাচনভঙ্গি আমেরিকানদের মত, বই পড়ে জার্মান শিখেছে। সন্দেহ নেই নিজেকে জার্মান বলে পরিচয় দিতে গেলে বিপদে পড়বে মেয়েটা।

রানা তাকাল, কিন্তু সরাসরি নয়। এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে চোখ বুলাল ও। তারপর নির্দিষ্ট টেবিলে স্থির হলো দৃষ্টি। কদর্য আর সৌন্দর্যের এই মিলন সহজে চোখে পড়ে না। জার্মান লোকটাকে পৌরাণিক কাহিনীর দানব বললে অন্যায় হবে না। ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো, কাটাকুটির সহস্র দাগে ভরা প্রকাণ্ড মুখ, শুধু ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরছে না বলে গা ঘিন ঘিন করল না। এই চেহারায় মোহ-মুগ্ধ হাসি যেমন বেমানান তেমনি অশ্লীল। লাইটার জ্বেলে সামনের দিকে ঝুঁকল দানব, মেয়েটার ঠোঁটে ধরা সিগারেট ধরিয়ে দিল।

মেয়েটাকে একপাশ থেকে সম্পূর্ণ দেখতে পেল রানা। শুধু সুরূপা নয়, দেহ-কাঠামোও ঠিক যেন বাংলা সংখ্যা ৪–সম্ভবত ৩৬-২৪-৩৬। মধুর কটাক্ষ হেনে হাসল সে, শিখার মাঝখানে দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি এক হলো। দৃষ্টি নয়, যেন অগ্নিবাণ–মনে হলো দানবের শার্টের বোতাম গলে যাবে। আপনমনে হাসল রানা। এ-ধরনের মেয়েকে চেনা আছে ওর। শরীরে যৌবন আসার আগেই পুরুষদের দৃষ্টি কাড়তে শিখে ফেলে, কৈশোরেই অঘটন ঘটন পটিয়সী হয়ে ওঠে, সাহস বাড়ার সাথে সাথে যৌবনে হয়ে ওঠে রাক্ষসী। সমস্ত ঝক্কি পোহাতে হয় বাবাকে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ বাবা জন্মদাতা বাবা নয়।

বারে সে-ই একমাত্র সম্পূর্ণ কালো ড্রেস পরে আছে। অত্যন্ত দামী একটা ম্যাক্সি। কালোকেশীর চোখ জোড়া হাস্যোজ্জ্বল। কয়েকটা জিনিস কল্পনা করে নিল রানা–নেইলপলিশ আর অন্তর্বাসের রঙ গায়ের সাথে মেলানো, হলুদাভ মাখন।

শরীরের সাথে মানানসই হেঁড়ে গলায় কথা বলছে লোকটা, সম্ভবত মদ্যপান করায় খেয়াল নেই প্রায় সবাই তার কথা শুনতে পাচ্ছে। কথা মানে, তুমি সুন্দর, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে জীবন ধন্য হলো, এইসব।

নীলনয়না তাকে বলল, আমেরিকান মেয়েরা নারী-স্বাধীনতা ভোগ করছে।

নারী-স্বাধীনতা? মেয়েটা ব্যাখ্যা করল, আমরা এখন আর রান্নাঘরে বন্দী নই।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, তারমানেই অন্য ঘরে সময় কাটাবার সুযোগ বেড়ে গেছে!

মেয়েটার মুখে দুষ্টু হাসি, বলল, সুযোগটা আমরা পুরোমাত্রায় নিচ্ছিও।

সত্যি, ভাবল রানা, এই মেয়ে রান্নাঘরে ব্যস্ত, কল্পনাও করা যায় না। মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে আগের ধারণা পাল্টাল ও। আমেরিকান বাচন ভঙ্গি সুন্দর, কিন্তু যথেষ্ট নিখুঁত নয়। আসলে হয়তো জার্মান মেয়ে, ভান করছে আমেরিকান বলে। এমন ভাবে কথা বলছে যেন কোন স্কুলে শিখেছে মাতৃভাষা। মনে মনে আবার একবার হাসল রানা। ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ অন্য কাউকে বোকা বানাতে পারো, ভাবল ও, আমাকে নয়।

চুনি বসানো কানের দুল পরে আছে। হঠাৎ নিষ্পলক হয়ে উঠল রানার দৃষ্টি। পেলব বাহু তুলে কান থেকে একটা দুল খুলে নিল মেয়েটা। দুলটা কয়েক সেকেণ্ড তালুতে নিয়ে দেখল। তারপর আবার পরল কানে।

সঙ্কেতে কোন ভুল নেই। হ্যাঁ, ওর সাথেই দেখা করতে এসেছে রানা। কিন্তু দানবটাকে তাড়াবে কিভাবে?

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। মন চলে গেল ব্রাসেলসে।

রুটিন ট্যুরে বেরিয়ে বেলজিয়ামে যাত্রাবিরতি, রানা এজেন্সির ব্রাসেলস শাখা ভিজিট করার পর প্ল্যান ছিল ফ্রান্সে চলে যাবে, কিন্তু তা আর হলো না। প্লেনের টিকেট কাটাও হয়ে গিয়েছিল, এই সময় বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে স্বয়ং মেজর

জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের একটা মেসেজ পেল রানা।

মেসেজটা এই রকম:

'সি.আই.এ. খুব নাজুক অবস্থায় পড়েছে। ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল উইলিয়াম অবসন রানা এজেন্সির সাহায্য চান। আমাকে আভাস দেয়া হয়েছে, সমস্যাটা নিয়ে ওদের প্রেসিডেন্টও খুব উদ্বিগ্ন। ব্রাসেলসেই অপেক্ষা করো, ওরা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। ওরা তোমার সাহায্য চায়, এটা গোপন থাকা দরকার। সম্ভব হলে সাহায্য করো। আমার ধারণা, রহস্যের ভেতর রহস্য থাকতে পারে–সাবধান। রা. খা.।'

দু'দিন পরই অশীতিপর এক বৃদ্ধ যোগাযোগ করল রানার সাথে। রাস্তায় দেখা হলো, রাস্তা থেকেই বিদায় নিল লোকটা। পাশাপাশি বিশ মিনিট হাঁটল ওরা, বাক্য এবং কিছু কাগজ-পত্র বিনিময় হলো। মাত্র কয়েকটা তথ্য জানতে পারল রানা। সি.আই.এ. এটাকে ডাবল রেড অ্যালার্ট বলে অভিহিত করছে। এসপিওনাজ জগতে আছে রানা, কাজেই অর্থটা জানা আছে। ডাবল রেড অ্যালার্ট মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি–অপারেশন সংক্রান্ত যেকোন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া ঠেকাবার জন্যে প্রয়োজনে নিরীহ মানুষকেও খুন করা যেতে পারে। রানাকে অনুরোধ করা হলো, এই মুহূর্ত থেকে ও যেন দুনিয়ার সবাইকে অবিশ্বাস করে। সি.আই.এ. বা রানা এজেন্সির কারও সাথে দেখা করা নিষেধ। নতুন পরিচয়পত্র পেল রানা, পেল আমেরিকান পাসপোর্ট আর এথেন্সের ওয়ানওয়ে টিকেট। বলে দেয়া হলো, ওর পরবর্তী কন্ট্যাক্ট জার্মানভাষী এক কালোকেশী মেয়ে, হোটেল জি.বি.-তে অমুকদিন অমুক সময় ওর সাথে যোগাযোগ করবে সে।

ব্যস, আর কোন তথ্য এখনও পায়নি রানা। কাজটা কি জানে না ও। বসের মেসেজেও সে-সম্পর্কে কোন আভাস ছিল না।

তবে মেসেজের শেষ লাইনটা মনে গেঁথে আছে: রহস্যের ভেতর রহস্য থাকতে পারে–সাবধান।

শেষ চুমুকটা দিয়ে গ্লাস ধরা হাতটা একটু উঁচু করল রানা, ওয়েটারকে ইঙ্গিত করল আবার ভরে দিতে। লক্ষ করল, কালোকেশী ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হলো অনিশ্চয়তায় ভুগছে মেয়েটা। রানার সাথে চোখাচোখি হতে ফিরিয়ে নিল মুখ। খানিক পর আবার একবার তাকাল। জার্মান লোকটা বিল মেটাবার জন্যে পকেটে হাত ভরছে, এই সময় সিদ্ধান্তে এল মেয়েটা। রানা তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল।

'মাফ করবেন, প্লীজ, সম্ভবত পরিচিত এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি।'

জার্মান লোকটা কিছু বলার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, রানার টেবিলের দিকে এগোল। লম্বা পা, ম্যাক্সির নিচে যতটা দেখা যায় হলদেটে মাখন। হ্যাঁ, মেয়ে হাঁটতে জানে বটে। গুরু নিতে' উথাল পাথাল ঢেউ তুলে এগিয়ে এল সে। 'মাফ করবেন,' টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল রানাকে, 'আপনি কি···,' তারপর নিজের অসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল, 'না, দুঃখিত, আমার ভুল হয়েছে।' অস্বস্তি আর ক্ষমাপ্রার্থনার সুর। 'আপনাকে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল···।'

স্মিত হেসে রানা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য যে সে-লোক আমি নই। কিন্তু তাই বলে এসে ফিরে যাবেন?'

নিমেষে মধুর হাসি ফুটে উঠল কালোকেশীর চেহারায়। হাত দুটো এক সেকেণ্ডের জন্যে টেবিলের কিনারা ছুঁলো। 'আমার বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'কোন ব্যাপারই নয়।'

এভাবেই মেয়েটা ঢুকল এবং বেরিয়ে গেল রানার জীবন

থেকে। রানা ছাড়াও আরও পাঁচ-সাতজন লোক তাকে বেরিয়ে যেতে দেখল বার থেকে। আর সবার মত মৃদু হাসল রানা, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে। মেয়েটার দেহ-সৌষ্ঠব ওর নজর কাড়লেও, ওকে মুগ্ধ করেছে তার গোপন আচরণটুকু। কারও চোখে ধরা না পড়ে কৌশলে টেবিলের ওপর ফেলে গেছে ভাঁজ করা খুদে একটা কাগজ। দরজার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে এক হাত দিয়ে গ্লাস তুলল ও, আরেক হাত ভরল পকেটে। পকেট থেকে হাতটা বেরুল সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল ও। গ্লাসটা শেষ করতে হবে।

বিশ মিনিট পর। হোটেল থেকে বেরিয়ে রানা দেখল সন্ধে হয়ে গেছে। চৌরাস্তায় কাফে আর বার সবগুলো লোকে লোকারণ্য। রাস্তায় যানবাহনের তেমন ভিড় নেই, তবে ফুটপাথে পরস্পরের হাত ধরা প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্যে হাঁটা মুশকিল। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল রানা, মায়াবতী রমণীর মত কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল ফুরফুরে বাতাস। আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসকে পাশ কাটাল ও। একটা বুকস্টলের সামনে থামল, চোখ বুলাল খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোয়। তারপর রাস্তা পেরিয়ে এরমু স্ট্রীটে চলে এল। ধীর পায়ে, অলসভঙ্গিতে হাঁটছে। হাত দুটো পকেটে। এথেন্সে এই সময় সচরাচর যেমন দেখা যায়, আরেকজন গোবেচারা ট্যুরিস্ট। খানিকদূর এগিয়ে নিশ্চিত হলো রানা, কেউ ওর পিছু নেয়নি। বাঁ দিকে মোড় নিল ও। তারপর হঠাৎ ডান দিকের অন্ধকার মত রাস্তায় ঢুকে পড়ল। পেত্রাকি স্ট্রীট—লোকজন নেই বললেই চলে।

স্ট্রীট লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা। এই সুযোগে ভাঁজ করা কাগজটা বের করল। ভাঁজ খুলে মেসেজটা পড়ল ও। এক লাইনের একটা মেসেজ। '৮ ন'র কিরিস্তু স্ট্রীট,

সকাল আটটায় সেন্ট পলের আইকন খোঁজ করো।'

আবার হাঁটা ধরল রানা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল কাগজটা, ফেলে দিল নর্দমায়।

মনোরম সকালে গ্রান্দ বেতানের বিলাসবহুল স্যুইটে ঘুম ভাঙল রানার। উনিশ তলার কার্নিসে সার সার টব, লতাগাছগুলো মোজাইক দেয়াল প্রায় ঢেকে ফেলেছে। তারই ভেতর লুকানো আছে স্পীকার, পাখির কুজন ধ্বনি সারা শরীরে মধুর আবেশ এনে দিল। ঘুম ভাঙাবার এই কায়দা যান্ত্রিক হলেও, রোমাঞ্চকর লাগল রানার, মনে মনে হোটেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

রুম সার্ভিসকে ফোনে ডেকে বাথরুম আর শাওয়ার সারল রানা। তারপর দাড়ি কামাল। প্রজাপতি আঁকা বড় একটা টাওয়েলে কোমর ঢেকে লিভিং রুমে ঢুকল ও, এবং ঢুকেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রায় উলঙ্গই বলা যায়, দেবী মূর্তি। ঘরের মাঝখানে নয়, দেয়াল ঘেঁষে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন একটা গ্রীক মাস্টারপীস। মেয়েটার চোখের পাতা নড়ছে দেখে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়ল রানা।

'রুম সার্ভিস,' চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে হাসল মেয়েটা। রানার আড়ষ্ট ভাবটা দারুণ উপভোগ করছে। 'আপনার ব্রেকফাস্ট সিটিং রুমে দেয়া হয়েছে।'

সদ্য কামানো গালে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'ধন্যবাদ।'

মেয়েটা নড়ল না। 'আর কিছু দরকার হবে আপনার? গাড়ি? কোন চিঠি ডাকে ফেলতে হবে? কিংবা যদি কিছু কেনার থাকে। গাইডের দরকার হলেও বলতে পারেন···।' রানার লোমশ, চওড়া বুকের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল সে।

'না।' সিটিং রুমের দরজার দিকে একবার তাকাল রানা। 'এথেন্সে আমি নতুন নই। ধন্যবাদ।'

'ডাকলেই আমাকে পাবেন,' দেবী মূর্তি দরজার দিকে এগোল। 'আমিই আপনার রুম সার্ভিস।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে কোমর থেকে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা। সিটিং রুমে ঢুকে দেখল, টেবিলের পাশে চাকা লাগানো ট্রে-তে সাজানো রয়েছে ব্রেকফাস্ট। খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চেয়ারে বসে ট্রে-র ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

রসনাতৃপ্তির পর কফি নিয়ে সোফায় বসল ও, তেপয়ে মেলে ধরল কাল রাতে কেনা। এথেন্সের ম্যাপ। শহরের প্রতিটি এভিনিউ চওড়া আর সরল, আর সবগুলো গলি-উপগলি আঁকাবাঁকা। কিরিস্তু স্ট্রীট কোন্ দিকে ভুলে গেছে ও। খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। প্লাকা হচ্ছে এথেন্সের পুরানো-ঢাকা, ওল্ড টাউন। অ্যাক্রোপোলিস পাহাড়ের গোড়ায় ঘিঞ্জি একটা এলাকা। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, হাঁটবে। সকালের রোদে শহরের ওপর ঝুঁকে থাকা অ্যাক্রোপোলিসকে ভালই লাগবে দেখতে।

আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মত শিস দিতে দিতে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। সিনট্যাগমা চৌরাস্তার দিকে এগোল ও, কাল রাতে এখান দিয়েই খানিকদূর গিয়েছিল। গাছপালার নিচে কাফেগুলো এখন খালি। প্রেমিক-প্রেমিকারাও উধাও। বছরের এই সময়টায় গ্রীকদের প্রতি সদয় থাকেন অ্যাপোলো, মৃদুমন্দ বাতাস বইতে দিয়ে রোদের ধার খানিকটা ভোঁতা করে রাখেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তেতে উঠবে রোদ। মুখ তুলে পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল রানা, কয়েক শতাব্দী ধরে লোকজন বসবাস করছে ওখানে।

ধীরে ধীরে রাস্তা-ঘাটে শহুরে ব্যস্ততা বাড়ছে। নতুন শহর

পেরিয়ে এল রানা। প্লাকা-য় ঢুকতেই চারদিকের দৃশ্য বদলে গেল। মান্ধাতা আমলের সাদা চুনকাম করা বাড়ি, জুতোর বাক্স আকৃতির ইমারত, আঁকাবাঁকা রাস্তার ওপর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক। এখানে রোদ নেই, বাতাসের প্রবেশ নিষেধ। রাস্তার দু'পাশে সার সার দোকান, কিন্তু প্রায় সবগুলোই বন্ধ। পরিত্যক্ত, নির্জন রাস্তা। শুধু বাচ্চা দুটো ছেলে মার্বেল নিয়ে খেলছে এক ধারে। দোতলার এক ছাদে চোখ পড়ল রানার। দুটো রুমাল দিয়ে কোমর আর বুক ঢাকা এক মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পাপোশ ঝাড়ছে। এত বাড়ি-ঘর, অথচ একেবারে নির্জন এলাকা। যেন শহর ছেড়ে সবাই পালিয়েছে।

কিন্তু সন্ধ্যার পরপরই জ্যান্ত হয়ে ওঠে প্লাকা। পুরানো শহরের তখন অন্য চেহারা। দোকানদাররা তখন ফুটপাথেও তাদের পসরা সাজায়। প্রতিটি জানালার ওপাশ থেকে ভেসে আসে গান-বাজনার আওয়াজ। ফুর্তিবাজ লোকেরা দলে দলে ঢুকে পড়ে গলির ভেতর, সেন্টে প্রায় ভিজে থাকে তাদের জামা। কারও এক হাতে থাকে মদের বোতল, আরেক হাত থাকে কোন সুন্দরী যুবতীর কোমর পেঁচিয়ে। প্রতিটি বারে জুয়ার আড্ডা বসে। পানাহার, এবং যৌন লীলার অবাধ অনুশীলন চলে সারারাত, সেই ভোর পর্যন্ত। তারপর যে যার ঠিকানায় ফিরে যায়, নির্জীব পড়ে ধোঁকে পরিত্যক্ত প্লাকা।

প্লাতিয়া মেট্রোপোলিয়স-এর কাছে অর্থোডক্স ক্যাথেড্রাল পেরিয়ে এল রানা, বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল মিসিক্লিয়স স্ট্রীটে। সামনে সরু রাস্তা সিঁড়ির আকৃতি নিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। এখানে প্রাণী বলতে একজোড়া বিড়ালকে শুধু দেখতে পেল রানা। ধাপগুলোর মাথা থেকে শুরু হয়েছে সরু একটা গলি, অ্যাগোরা ধ্বংসাবশেষের কিনারা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পাহাড়ের

দিকে। আরও সামনে দেখা গেল প্রায় খাড়া পাহাড়ের ঢাল। সেদিকে না গিয়ে অন্য দিকে বাঁক নিয়ে কিরিস্তু স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল রানা।

হোটেল আর দোকানের মাঝখানে আট ন'র বাড়ি, সাদা চুনকাম করা। হোটেলের দরজা খোলা, কিন্তু লোকজন দেখা গেল না। দোকানটা বন্ধ। বাড়ির দরজায় একটা সাইনবোর্ড রয়েছে—এখানে অ্যান্টিকস বিক্রি হয়। দরজায় নক করতে গিয়েও করল না রানা, ঠেলা দিতেই কবাট খুলে গেল। কাউকে দেখার আগেই অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত,' জবাব দিল রানা।

ঘরের ভেতর থেকে দরজার কাছে এসে থামল এক শক্ত-সমর্থ লোক। বয়স হবে পঞ্চাশের মত, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, রোদেপোড়া গ্রীক জেলেদের মত চেহারা। লোকটাকে ছাড়িয়ে রানার দৃষ্টি সামনে চলে গেল। আবছা আলোয় অ্যান্টিক জিনিস-পত্র দেখা গেল কয়েকটা র‍্যাকে। দেব-দেবীর খুদে মূর্তি থেকে শুরু করে হাতে রঙ করা ফুলদানী, সবই আছে। র‍্যাকের পিছনের দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো রাজা কনস্ট্যানটিন এবং তাঁর ডেনিশ বধূর ছবি।

লম্বা কাউণ্টারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। ভেতরে ঢুকে রানা বলল, 'আপনি বোধহয় আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। সেণ্ট পলের আইকন খুঁজছি আমি।'

সবজান্তার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার মুখ। এ-ধরনের হালকা হাসি আশা করেনি রানা। লোকটা যে ওর কণ্ট্যাক্ট নয়, এটুকু পরিষ্কার। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার নিরীহ অভাবগ্রস্তদের একজন সে, আসল ব্যাপার কিছু না জেনেই সি.আই.এ-র খুদে ঘুঁটি হিসেবে কাজ করে। এদের বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত, তা না হলে কাজ পেত না। হঠাৎ করে

কালোকেশীর চেহারাটা মনে পড়ে গেল রানার। উঁহু, মেয়েটা নিরীহদের একজন নয়। তারমানে বিশ্বস্ততা ছাড়াও আরও অনেক গুণ আছে তার। হাসতে হাসতে বুকে ছুরি চালাতে পারে। বিষ মিশিয়ে সহাস্যে শয্যাসঙ্গীর হাতে তুলে দিতে পারে মদের গ্লাস।

'আমি ডাকান,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল লোকটা। 'আপনি যা খুঁজছেন ওপর তলায় পাবেন।'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে কাঠের এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখতে পেল রানা। সিঁড়ির মাথায় দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কারও ভুলে নয়।

'উঠে যান,' আবার বলল লোকটা। 'তাঁকে আমি দেখিনি, তবে জানি ওখানে তিনি আছেন।'

তিনি আছেন! তারমানে কি একজন? কিন্তু ডাকান যদি দেখে না থাকে, জানবে কিভাবে ক'জন আছে?

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেলল রানা। রিভলভারটা কোমরের বেল্টে রয়েছে, নিচের দিকে মুখ করে। আগ্নেয়াস্ত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর মত, স্পর্শেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সিঁড়ির মাথায় উঠে থামল রানা, আস্তে করে চাপ দিল কবাটে। দরজার ভেতর ঘরটা প্রায় অন্ধকার, জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে সার সার বেঢপ আকৃতি দেখা গেল, ছোট বড় কাঠের বাক্স ওগুলো। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, আর একটা চেয়ার। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা, ক্ষীণ আলোর আভা ঢুকছে ভেতরে। সম্ভবত ওদিকেও একটা সিঁড়ি আছে, সরাসরি রাস্তায় নামা যায়।

লোকটাকে আগেই দেখেছে রানা, টেবিলের সামনে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শাটার আর পর্দা লাগানো জানালার সামনে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি। বেশ লম্বা, একহারা গড়নের। নাক-চোখ কিছুই দেখা গেল না।

ভেতরে ঢুকে পেছনে হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। অন্ধকার থেকে কথা বলে উঠল লোকটা, 'গুডমর্নিং, রানা।'

কণ্ঠস্বরটা রানার স্মৃতির ভাণ্ডারে একটা আলোড়ন তুলল, কিন্তু চেষ্টা করেও লোকটাকে চিনতে পারল না। 'আলোকে এত ভয় কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সাবধানের মার নেই,' বলল লোকটা। এক চুল নড়ছে না সে। 'কাছে এসো। তোমার মুখ দেখতে দাও।'

চুপ করে থাকল রানা। একমুহূর্ত নড়ল না। দু'জনের মাঝখানের দূরত্বটুকু আরেকবার মেপে নিল। তারপর দরজার কাছ থেকে ধীর পায়ে, সাবধানে সামনে বাড়ল। টেবিলের কাছ থেকে সারাক্ষণ দূরে থাকল ও, টেবিল ঘুরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে ভারী পর্দা সামান্য একটু সরাতেই দিনের আলো ঢুকল ঘরে। লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখা গেল এবার। বিস্মিত হলো রানা, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। 'ডিকসন, ইউ বাস্টার্ড!' জানালার পর্দা আবার টেনে দিল রানা।

রড ডিকসন এথেন্সের মার্কিন দূতাবাসে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ওই ধরনের ছোট একটা চাকরি করে, অন্তত শেষবার রানার সাথে দেখা হওয়ার সময় তাই করত। পয়সার বিনিময়ে তথ্যের জন্যে ডিকসনের মত জুনিয়র গ্রেড অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় রানা এজেন্সিকে। ডিকসনের আয়ের দুটো উৎস সম্পর্কে জানে রানা। একটা চেক আসে ইউ.এস. আর্মির ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে। ব্রাঞ্চের মাথা-খারাপ কর্তাব্যক্তিরা এ-ধরনের লোককে দিয়ে উল্লট সব কাজ করিয়ে নেয়। অন্তত একটা কাজের কথা রানার জানা আছে, ডিকসনই জানিয়েছিল। হুইস্কির খালি বোতলে কম্যুনিজম বিরোধী প্রচার-পত্র ভরে দানিয়ুব নদীতে ছেড়ে দিত ডিকসন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশা

ছিল, স্রোতে ভাসতে ভাসতে রাশিয়ার উপকূলে চলে যাবে ওগুলো, দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করবে, এবং মেসেজ পড়ে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। ঘটনাটা শোনার পর রানা মন্তব্য করেছিল, বেকুব কি আর গাছে ধরে! ডিকসনের আয়ের আরও একটা উৎস হলো, এমসিক্সটিন–ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। আয়ের আরও উৎস তার থাকতে পারে, ঠিক জানা নেই রানার। লোকটা দু'হাতে টাকা ওড়ায়। একটু সন্দেহের চোখেই দেখে ও। যদি শোনে পয়সা খেয়ে শত্রু পক্ষের হয়ে কাজ করছে, অবাক হবে না।

'পুরানো বন্ধুকে এভাবে কেউ সম্বোধন করে না,' রাগ নয়, অভিমানের সুরে বলল ডিকসন।

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে তোমাকে আমি মেরে ফেলিনি।' পকেট থেকে এক প্যাকেট গ্রীক সিগারেট বের করল রানা।

লাইটার জ্বেলে রানার সিগারেট ধরিয়ে দিল ডিকসন। রানার মনে পড়ল, ছোটখাট তথ্যের জন্যে এক সময় প্রচুর টাকা খেয়েছে ডিকসন ওর কাছ থেকে। মাথা নিচু করে ছোট একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালল ডিকসন। ল্যাম্পটা সস্তাদরের অ্যান্টিক। সলতে একটু লম্বা করল সে, কাঁপতে লাগল শিখা। 'একে ঠিক সাবধানতা বলে না, তুমি যেন কিসের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছ,' লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা।

'বসো,' ইঙ্গিতে চেয়ারটা দেখাল ডিকসন। 'না, ভয়ের কি আছে। তবে স্বীকার করছি, কাজটা আমার তেমন পছন্দ হয়নি। কাজ তেমন কিছুই নয়, অথচ কোটিবার সাবধান থাকতে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে। ল্যাম্পের আলো বাইরে থেকে দেখা যাবে না। সিলিঙের বালব্ জ্বাললে দেখা যাবে।' একটু থেমে আরেক প্রসঙ্গে চলে গেল, 'জানা না থাকলে ধরতেই পারতাম না তুমি রানা।'

মিথ্যে কথা। জানালার বাইরে সাদা চুনকাম করা দেয়ালে চোখ ধাঁধানো রোদ পড়েছে, বালবের আলো কেউ দেখতেই পাবে না। তবু তর্কের মধ্যে গেল না রানা। লক্ষ করল, বেঢপ একটা ভুঁড়ি বাগাতে শুরু করেছে ডিকসন। মাথায় চুলও আগের চেয়ে কম মনে হলো। ডিকসনের চেহারায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই, সিকিউরিটি এজেন্টদের চেহারা ঠিক এরকমই হওয়া উচিত। সারারাত লোকটার সাথে বসে মদ খেলেও পরদিন সকালে চেহারাটা স্মরণ করা কঠিন। ছোট করে ছাঁটা চুল। পরনে গাঢ় রঙের কনজারভেটিভ স্যুট। তবে এথেন্সের বহুলোকই আবছাভাবে হলেও জানে লোকটা আসলে কি। ডিকসন অতিরিক্ত সাবধান হওয়ায় একদিক থেকে ভালই হয়েছে, ভাবল রানা। ওর সাথে লোকে তাকে প্রকাশ্যে না দেখলেই ভাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'বলো, কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'আমার কিছু চাইবার নেই, দেবার আছে।' দেরাজ থেকে একটা লেদার পাউচ বের করল ডিকসন, দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখল সেটা। ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'একই পার্টির কাজ করছি আমরা।'

'কোন্ পার্টি?'

ঘুরিয়ে উত্তর দিল ডিকসন, 'পিটার ডানিয়েল আমাকে পাঠিয়েছে।'

শ্রাগ করল রানা।

'ডানিয়েল তোমাকে অধৈর্য না হতে অনুরোধ করেছে।'

ডানিয়েলকে রানা চেনে না, অন্তত এই নামে চেনে না। 'বলে যাও, আমি শুনছি।'

'তোমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে এটা,' বলে থামল ডিকসন, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল।

'কাজেই মুখ খুললে নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে।'

'এ-ধরনের প্রলাপ শোনার জন্যে আসিনি আমি,' ধমকে উঠল রানা। 'কাজের কথা থাকলে চটপট...'

'ডানিয়েল যা বলতে বলেছে তাই বলছি আমি,' বাধা দিল ডিকসন। 'গোটা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, কাজেই তোমার নতুন পরিচয় কোন শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু-বান্ধব, সহকারী সহকর্মী কাউকে জানানো চলবে না। সেজন্যেই ওরা নিজেদের লোক না পাঠিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে।'

'রানা এজেন্সির বেশিরভাগ কেস-ই টপ সিক্রেট,' বলল রানা। 'আর ছদ্মবেশের কথা যদি বলো, চেষ্টা করলে এজেন্সির এজেন্টরা ঠিকই আমার নতুন পরিচয় জেনে ফেলবে... ।'

আবার বাধা দিল ডিকসন, 'তোমার বুঝি তাই ধারণা?' বিষণ্ন একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল একবার। 'যদি বলি কেউ আর চেষ্টাই করবে না? এখন থেকে দশ মিনিট পর সংশ্লিষ্ট সবাই জানবে, বারো ঘণ্টা আগে মারা গেছে মাসুদ রানা।'

চুপ করে থাকল রানা। সিগারেটে টান দিল। ব্যাখ্যার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'রেকর্ডে দেখা যাবে, কাল সকালে ব্রাসেলস ত্যাগ করেছ তুমি, অসলো-য় ল্যাণ্ড করেছ, কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে চড়েছ। হোটেলে যাওয়ার পথে তোমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে। স্থানীয় হাসপাতালে দু'ঘণ্টা পর মারা যাও তুমি।'

'প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, সন্দেহ নেই,' বলল রানা। ভাবল, কে সেই ভাগ্যবান, ওর বদলে লাশ হতে হলো যাকে?

'গাড়িটা ছিল একটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানির—তুমি নিজে ভাড়া করেছিলে।'

'অবশ্যই।'

'আসলে বলতে চাইছি, গোটা ব্যাপারটা অফিশিয়াল–কোথাও কোন খুঁত রাখা হয়নি। মাসুদ রানা মারা গেছে। পোস্ট মর্টেমের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঢাকাতেও পৌঁছে গেছে খবরটা, সম্ভবত এরই মধ্যে ক্লোজ করে দেয়া হয়েছে তোমার ফাইল। তোমার সম্পর্কে শত্রু এবং মিত্রদের কাছে আরও অনেক ফাইল আছে, সেগুলোও ক্লোজ হতে শুরু করেছে। কেউ যদি সন্দেহের বশে তোমার খোঁজ-খবর পাবার চেষ্টা করে, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কোথাও কোন সূত্র পাবে না বেচারা।'

'বুদ্ধিটা কার?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা। 'জিজ্ঞেস না করেই মেরে ফেলল আমাকে?'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার বসের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনুমতি নেয়া হয়েছে,' বলল ডিকসন। 'ডানিয়েল তোমাকে বলতে বলেছে, কাজের ধরনটা এমনই যে সতর্ক হবার জন্যে এ-ধরনের আয়োজন একান্ত দরকার ছিল, তুমি যেন মাইণ্ড না করো।'

'হুঁ।'

রানার অসহায়বোধটুকু উপভোগ করছে ডিকসন। অভ্যস্ত নয়, কর্তৃত্বের ভাব চেহারায় মানাচ্ছে না। প্রশ্ন আশা করলেও, রানা তার আশা পূরণ করল না। জানে, ও চুপ করে থাকলেই বেশি কথা বলবে ডিকসন।

'আজ বিকেলে এথেন্স ছেড়ে যাচ্ছ তুমি,' বলল ডিকসন। লেদার পাউচ খুলে ভেতর থেকে একটা এনভেলাপ বের করল সে, টেবিলের ওপর রাখল। এনভেলাপের ভেতর একটা সুইডিশ পাসপোর্ট পেল রানা। অটো এমারসন, ফার ব্যবসায়ী। কিছু চিঠিপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সুন্দরী এক মহিলার সাথে ফুটফুটে দুটো বাচ্চার ওয়ালেট সাইজ ফটো, ইত্যাদি রয়েছে।

'বাচ্চা দুটো তোমার, ওদের মা তোমার স্ত্রী,' বলল ডিকসন। 'সুখী একটা পরিবার।'

সবশেষে এনভেলাপ থেকে একটা প্লেনের টিকেট বেরুল, এথেন্স থেকে লণ্ডনের। আজ বিকেলের ফ্লাইট।

'তোমার যা যা দরকার হবে, সব যোগাড় করেছি আমি,' বলল ডিকসন। 'জি.বি-তে ফিরে গিয়ে নতুন কাপড়চোপড় দেখতে পাবে। সবই স্টকহোম থেকে কেনা হয়েছে–লাগেজ, শেভিং গিয়ার, সমস্ত কিছু। এমনকি একটা উপন্যাসও পাবে, এই মুহূর্তে সুইডেনকে গরম করে রেখেছে।'

'হুঁ।'

'তুমি চলে যাবার পর এদিকের সব পরিষ্কার করে ফেলব আমি। এথেন্সে তুমি যা কিছু কিনেছ, সব ফেলে যাবে। এমন কিছু তোমার সাথে থাকা চলবে না যা দেখে বোঝা যায় তুমি মাসুদ রানা। আশা করি এদিকটা তুমি লক্ষ রাখবে।'

'তারপর, লণ্ডনে পৌঁছুলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পিকাডেলি-র অ্যামব্যাসাডর হোটেলে উঠবে। তারপর কি ঘটবে আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। এই পর্যন্তই আমার দৌড়।'

তিন

পিছনের দেয়াল ঘড়ি দেখার জন্যে চেয়ারে মোচড় খেলো হফ ভ্যানডেরবার্গ। রাগে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল বুড়োর। পাশে

দাঁড়ানো যুবকের দিকে ফিরল সে, কটমট করে তাকাল। 'কি ঘটছে খবর নাও!' কড়া ধমকের সুরে হুকুম করল সে। 'এরা আমাদের ভেবেছে কি!'

'ওস্তাদ…,' শুরু করল এডলফ ডয়েট।

চোখে আগুন ঝরা দৃষ্টি নিয়ে হাতের লম্বা ছড়িটা মাথার ওপর তুলল ভ্যানডেরবার্গ, মারবে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ডয়েটের, ডিপারচার লাউঞ্জ ধরে ত্রস্ত পায়ে ডেস্কের দিকে এগোল সে। লোকজনের সামনে ওস্তাদের এ-ধরনের অপমানকর আচরণ গা সয়ে গেছে তার। ওস্তাদ পৃথিবীর সেরা বেহালাবাদকদের একজন, তা না হলে কবেই এই চাকরি ছেড়ে দিত।

ডেস্কের পিছনে একটা মেয়ে আর একজন পুরুষ বসে আছে, পরনে খয়েরি ইউনিফর্ম। তালিকা মিলিয়ে এরাই আরোহীদের ভেতরে ঢুকিয়েছে। কাজ শেষ, সময় কাটছে একঘেয়ে।

অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছে আরোহীদের, সবাই তারা ভিয়েনা ত্যাগ করে যাবে। প্রত্যেকে অসন্তুষ্ট, কিন্তু কারও কিছু করার নেই।

ডয়েটকে আসতে দেখে ডেস্কের পিছনে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল ওরা।

দু'চারটে কথা ভ্যানডেরবার্গের কানে ঢুকল, 'ভয়ানক দুঃখিত…দুর্ভাগ্য, করার কিছু নেই…ওস্তাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?…আমাদের ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের জন্যে আলাদা লাউঞ্জ আছে… ।'

মনে মনে তিক্ত হাসল ভ্যানডেরবার্গ। লাউঞ্জে যদি সত্যি সত্যি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের জায়গা হত, উৎসাহ বোধ করত সে। কিন্তু এয়ারলাইন কোম্পানিগুলোর বিচারে যে আরোহী যত বেশি মাইল পাড়ি দেবে তার মর্যাদা তত বেশি। কুকুর-বিড়ালও ভি.আই.পি. লাউঞ্জে ঢোকার সুযোগ পাবে যদি তাদের নামে প্রথম

শ্রেণীর লম্বা জার্নির টিকেট কাটা হয়। এখানে ব্যক্তিত্ব, বংশগৌরব, বা খ্যাতির কোন মূল্য নেই। যে-কেউ যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। ভি.আই.পি. লাউঞ্জ তো নয়, গোয়ালঘর। গেলে হয়তো দেখা যাবে কদর্য চেহারার ইহুদিরা হাত-পা ছড়িয়ে বসে ব্যবসা নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। দুনিয়ার সব বড় বড় ব্যবসাই তো এখন ওদের হাতে। অসহ্য!

অতীতের কথা মনে পড়ল ভ্যানডেরবার্গের। ভ্রমণে তখন সত্যি আনন্দ ছিল। ট্রেনগুলো ছিল ধীরগতি, কিন্তু পৌঁছুতে সময়ের হেরফের হত না। ট্রেনে দু'ধরনের কার থাকত–সাধারণ লোকেরা অভিজাতদের কারে ঢুকতে পারত না।

আকাশ ভ্রমণের যুগে সব কিছু বদলে গেছে। তার মত আরোহীরা বিশেষ মর্যাদা হারিয়েছে। প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটলেও আজকাল তেমন সুযোগ-সুবিধে জোটে না–বিনা পয়সায় ককটেল খেতে দেয়, আর সীট একটু চওড়া, ব্যস। বিমান কোম্পানিগুলো ব্যক্তি বিশেষকে খাতির করে না, সমষ্টিকে নিয়েই তারা ব্যস্ত। ছোট বড় সবার সাথে একই আচরণ করে। 'কোথায় যাবেন, স্যার? নিউ ইয়র্ক? এই নিন।' ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। কমপিউটর থেকে তোমার টিকেট বেরিয়ে এল। 'দুঃখিত, স্যার, আপনার ব্যাগগুলো খুলে দেখতে হবে। একটু যদি এদিকে সরে এসে দাঁড়ান।' ক্লিক, ক্লিক। মেশিন জানিয়ে দিল, তোমার পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, জুতোর তলায় তুমি বোমা নিয়ে যাচ্ছ না।

কি স্পর্ধা! জিজ্ঞেস করে সাথে পিস্তল বা বোমা আছে কিনা!

হ্যাঁ, ভ্রমণের জন্যে ট্রেনই ভ্যানডেরবার্গের প্রিয়, কিন্তু অস্ট্রীয়া আর আমেরিকার মাঝখানে ট্রেন চলে না। মাত্র দশ দিনের জন্যে মার্কিন মুলুকে যাচ্ছে সে, সাতটা শহরে অনুষ্ঠান করবে, সেখানেও ট্রেনে উঠলে সময়ে কুলাবে না। তাছাড়া, ভ্যানডেরবার্গ শুনেছে,

আমেরিকান ট্রেনও নাকি এয়ারলাইনগুলোর মত, গুণী লোকদের বিশেষ কোন খাতির নেই।

কাজেই প্লেনে না চড়ে উপায় নেই তার।

তবে, অন্তত একটা ব্যাপারে, নিজের প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছে সে। অন্য কোন আরোহী হলে এই সুবিধেটুকু দেয়া হত না, প্রথমে তাকেও রাজি হয়নি দিতে। কিন্তু জেদ করায় কাজ হয়েছে, ওকে আর ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। ব্যাগগুলোর সাথে বেহালাটাও কনভেয়র বেল্টে রাখতে বলা হয়েছিল, ভ্যানডেরবার্গ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'তা সম্ভব নয়। ওটা তোমরা হাতে করে বয়ে নিয়ে যাবে।' ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ তর্ক হলো। দু'জন মহিলা এয়ারপোর্ট কর্মী নাছোড়বান্দা, বেহালাটা তারা বেল্টে তুলে দিতে চায়। কারও বোঝা বহন করার চাকরি নয় তাদের।

যুক্তিতে হেরে গিয়ে স্বমূর্তি ধারণ করল ভ্যানডেরবার্গ, মারবে বলে মাথার ওপর ছড়ি তুলল সে। অপমানে, ভয়ে চেঁচামেচি শুরু করল মহিলারা। পুরুষ কর্মীরা ছুটে এল তাড়াতাড়ি। অনেক কষ্টে স্বনামধন্য ওস্তাদকে শান্ত করল তারা। তাদের একজন বেহালাটা হাতে নিল, ভ্যানডেরবার্গ হুমকি দিয়ে বলল, 'সাবধান! আমার বেহালার যদি কিছু হয়, অনশন করব আমি!' কর্মী লোকটা বেহালাটাকে এমন ভাবে ধরল, যেন একটা বোমা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাশে ফিরে এল এডলফ ডয়েট। 'আর বেশি দেরি হবে না, ওস্তাদ।'

'বিশ মিনিট আগেও এই কথা বলেছে ওরা!'

'আমার ধারণা এবার বোধহয় সত্যি...'

'ধারণার জন্যে নয়, তোমাকে আমি বেতন দিই,' ঝাঁঝের সাথে বলল ভ্যানডেরবার্গ, 'কোথাও কোন সমস্যা হলে সেটা দূর

করার জন্যে। আমাকে দেরি করানো হচ্ছে। অথচ এর কোন ব্যাখ্যা নেই!'

'ব্যাপারটা, ওরা বলছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত...।'

'নিরাপত্তা? ঘোড়ার আণ্ডা! নিজেদের অযোগ্যতা চাপা দেয়ার জন্যে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে ওরা।' আড়চোখে ডয়েটের দিকে তাকাল ভ্যানডেরবার্গ। 'না, তোমার বোধহয় কোন দোষ নেই।'

ডয়েট কিছু বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিল ভ্যানডেরবার্গ। 'থাক। অপেক্ষা যখন করতেই হবে, সময়টা বরং কাজে লাগাই এসো। প্রোগ্রাম লেখা কাগজটা দাও আমাকে।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল ডয়েট। ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল ভ্যানডেরবার্গ।

ওস্তাদ কাগজটা পড়ায় মন দিতে ধীরে ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডয়েট। খানিকক্ষণ অন্তত শান্তিতে থাকা যাবে।

চোখ কুঁচকে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল ভ্যানডেরবার্গ। প্রথম অনুষ্ঠান নিউ ইয়র্ক সিটির ফিশার হলে। তারপর শিকাগো, ডেনভার, আর লস এঞ্জেলেস-এ যেতে হবে। পর পর তিনটে অনুষ্ঠান শেষ করে একদিনের বিরতি, তারপর আবার হিউস্টন আর আটলান্টায় বাজাবে সে। সবশেষে বাজাবে ওয়াশিংটন ডিসি-তে। হোয়াইট হাউসের এই অনুষ্ঠানটা হবে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের জন্যেই তার আমেরিকায় যাওয়া।

ট্যারা চোখে ডয়েটের দিকে তাকাল সে। 'ওয়াশিংটনে আমরা কি ফুটপাথে থাকব? তোমাকে হোটেল রিজার্ভ করতে বলিনি আমি?'

'না, স্যার, হোটেল বোধহয় লাগবে না,' তাড়াতাড়ি বলল ডয়েট। কথাটা আগেও ওস্তাদকে জানিয়েছে সে। ওস্তাদ ভুলে গেছেন, একথা সে বিশ্বাস করে না। বারবার শুনতে ভাল লাগে,

বোধহয় সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছেন। 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট,' জোর গলায় বলল সে, জানে আশপাশের সবাইকে শোনালে ওস্তাদ বেশি খুশি হবেন, 'চেয়েছিলেন আপনি যেন ব্লেয়ার হাউসে ওঠেন। ব্লেয়ার হাউস হলো সরকারি অতিথি ভবন··· ।'

'ব্লেয়ার হাউস কি আমি জানি!' চোখ পাকাল ভ্যানডেরবার্গ। 'কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতা আমার একদম পছন্দ নয়!'

গলা খাদে নামাল ডয়েট, 'শিডিউল নিয়ে গোলমাল, স্যার। সরকারি সফরে একজন প্রধানমন্ত্রী আসছেন ওয়াশিংটনে, তাই···'

আগের দিন আর নেই, ভাবল ভ্যানডেরবার্গ। গুণী লোকদের চেয়ে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের দাম আজকাল অনেক বেশি। রাজনীতিতে আজকাল দু'ধরনের লোক রয়েছে–একদল সাধারণ মানুষকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে নির্বাচিত হয়, আরেকদল গায়ের জোরে ক্ষমতা কেড়ে নেয়–দু'দলের কারও মধ্যেই নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা নেই, কেউ তারা জনগণের ভাল চায় না। ওদের না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে মহৎ কোন উদ্দেশ্য। অথচ এরাই দেশে-বিদেশে মর্যাদাবান হিসেবে খাতির যত্ন আদায় করে নিচ্ছে। দুনিয়ার সেরা একজন শিল্পীর বদলে একজন ঘুষখোর প্রধানমন্ত্রীকে সরকারি অতিথিভবন ছেড়ে দেয়া হবে, বর্তমান যুগে এ আর আশ্চর্য কি।

মনের সাধ মিটিয়ে পার্সোন্যাল সেক্রেটারিকে গালমন্দ করা হলো না, ইউনিফর্ম পরা একজন এয়ারপোর্ট কর্মী এগিয়ে আসছে। লোকটা ডয়েটকে বলল, 'আসুন, ওস্তাদকে আমরা সবার আগে প্লেনে তুলে দিই।'

খাতিরের কি বহর, তিক্ত হেসে ভাবল ভ্যানডেরবার্গ। একজন জাত শিল্পীর জন্যে এটুকু করেই নিজেদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চায় ওরা। চেহারায় রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

ভিয়েনায় তখন সকাল দশটা, মেঘ ছাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উঠে সিধে হলো ভ্যানডেরবার্গের প্লেন। লণ্ডনে, প্রায় ওই একই সময়ে, পিকাডেলির অ্যামব্যাসাডর হোটেল থেকে বেরিয়ে হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলো রানা।

আগের দিন লণ্ডনে পৌঁচেছে সে। হোটেলে ঢোকার পর থেকে অপেক্ষার পালা শুরু হয়। আশা, কেউ বা কিছু একটা আসবে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর নক করে একটা মেয়ে ঢুকল কামরায়। গায়ের রঙ শ্যামলা, একহারা গড়ন, সম্ভবত ভারতীয় বা পাকিস্তানী। মেয়েটার চোখ দুটো বিষণ্ন, মুখে লাজুক হাসি, কাঁধে নতুন তোয়ালে। কামরা থেকে সে বেরিয়ে যাবার পর দরজায় তালা লাগাল রানা। জানে, বাথরুমে একাধিক তোয়ালে আছে।

নতুন তোয়ালেটা বাথরুমেই পেল রানা। ভাঁজ খুলতেই ভেতর থেকে মোটা একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বেরুল। নতুন ডকুমেন্টগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। জাঁ ভ্যালেরি-র নামে একটা ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট রয়েছে, সাথের আর সব কাগজ-পত্র থেকে জানা গেল জাঁ ভ্যালেরি একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। এনভেলাপ থেকে প্লেনের টিকেট, আর লকারের চাবিও বেরোল। পাসপোর্টের ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, বছর দশেক পর ওর চেহারা ঠিক এই রকমই হবে। সবশেষে একটুকরো কাগজে লেখা কয়েকটা সংলাপ পড়ল রানা।

সেই রাতেই অটো এমারসনের সমস্ত জিনিস-পত্র খয়েরি একটা কাগজে মুড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্যাক্সি নিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছুল ও। চাবির গায়ে ন'র দেখে লকারটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। ভেতরে একটা পুরানো ক্যানভাসের সুটকেস পাওয়া গেল। লাগেজ ট্যাগে জাঁ

ভ্যালেরি-র নাম লেখা রয়েছে, নামের পাশে রয়েছে প্যারিসের একটা ঠিকানা। সুটকেসটা নিল রানা, লকারে রাখল খয়েরি প্যাকেট। বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

হেঁটে হোটেলে ফেরার পথে কয়েক জায়গায় থামল রানা। টেমস নদী পেরোবার সময় ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করল। ব্রিজ থেকে পার্লামেন্ট ভবন দেখা যায়, শহরের সমস্ত উজ্জ্বল আলো গায়ে মেখে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। বিগবেন ঘণ্টা দিতে শুরু করল। কালো পানিতে লকারের চাবি ফেলে দিয়ে ব্রিজ থেকে নেমে এল রানা।

আরেকবার শ্যারিং ক্রসে থামল রানা। কেমিস্টের দোকান থেকে বেরিয়ে এল হোটেলে। নিজের কামরায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করল ও, ওর অনুপস্থিতিতে ভেতরে কেউ ঢুকেছিল কিনা ভাল করে পরীক্ষা করল। এরপর বাথরুমে ঢুকল ও, সুইস পাসপোর্ট আর অটো এমারসনের অন্যান্য কাগজ-পত্র সিঙ্কে রেখে সবগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন নিভে যেতে দুটো ট্যাপই ছেড়ে দিল, ধীরে ধীরে সমস্ত ছাই নেমে গেল ড্রেনে।

এরপর কেমিস্টের দোকান থেকে কেনা হেয়ার প্রিপারেশনস-এর মোড়ক খুলল রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাসপোর্টের ছবির দিকে তাকাল।

পরদিন, অর্থাৎ আজ সকালে, সকলের অগোচরে ফরাসী সাংবাদিক জাঁ ভ্যালেরি বেরিয়ে এল অ্যামব্যাসাডর হোটেল থেকে। হিথ্রোতে পৌঁছে টি-ডাব্লিউ-এ-র ভিয়েনা থেকে আসা সকালের ফ্লাইটে চড়ে বসল সে, রওনা হয়ে গেল নিউ ইয়র্ক সিটির উদ্দেশে।

চার

কেনেডি এয়ারপোর্টের টি-ডাব্লিউ-এ টার্মিনাল, ভিড় ঠেলে নিউজস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোল রানা। কনুই আর হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারতে হলো ওকে, কারণ তা না হলে শুধু চারদিক থেকে বেমক্কা ধাক্কাই খেতে হবে, এক পা-ও এগোনো যাবে না। নিউ ইয়র্ক রানার প্রিয় শহরগুলোর একটা হলেও, শহরটা দিনে দিনে নরকতুল্য হয়ে উঠছে। ইউরোপের লোকেরা নিউ ইয়র্কের কথা উঠলেই আজকাল বলে, অসভ্যদের বাস ওখানে। কথাটা মিথ্যে নয়। ইউরোপের যে কোন শহরে দেখা যাবে, কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে হলে মানুষ এক লাইনে শান্তভাবে দাঁড়ায়। কিন্তু নিউ ইয়র্কে জোর যার মুল্লুক তার। কর্কশ গলায় সবাই সারাক্ষণ অশ্লীল মন্তব্য করে চলেছে। একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার পর্যন্ত উপায় নেই, এক দুই ডলার পর্যন্ত ছিনতাই হয়ে যাবে। এক কপি নিউ ইয়র্ক টাইমস কিনে কাঁচের সুইং ডোর ঠেলে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে বেরিয়ে এল ও। বগল থেকে নিয়ে হ্যাটটা মাথায় দিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

স্ট্যাণ্ডে কোন ট্যাক্সি নেই। তীরবেগে ছুটে এল একটা সুটকেস, ঝট্ করে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মাথাটাকে বাঁচাল রানা। খুবই কম বয়স মেয়েটার, হাত খালি করে এবার প্রায় সমবয়েসী স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দমাদম কিল মারছে।

স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। দৃশ্যটা পুনর্মিলনের। উল্লট আদরে অস্থির স্বামী শান্ত করার চেষ্টা করছে স্ত্রীকে, আর একদিনের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। পথিকদের কাণ্ডজ্ঞানের ভারি অভাব, সবাই যেন পণ করেছে সুটকেসটাকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করবে। অনেক কষ্টে সেটাকে ফুটপাথ থেকে উদ্ধার করে আনল রানা, ফিরিয়ে দিতে গিয়ে শান্ত স্বামী-স্ত্রীর ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে গেল। ছেলেটা করমর্দন করল ওর সাথে, ব্যথায় আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা। মেয়েটা পায়ের ডগার ওপর দাঁড়িয়ে চুমো খেলো–যেন হুল বিঁধল কপালে।

এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর কোন শহরে দেখেনি রানা। নিউ ইয়র্কের লোকেরা স্থির থাকতে জানে না–প্রেম, ঝগড়া, মিছিল, নাচ-গান, জগিং, মারপিট, ধর্মঘট–কিছু না কিছু একটা করছেই। এবং যাই করুক, কিছুই ওরা শান্তভাবে করতে জানে না।

মধ্যবয়স্ক এক দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা, একটা ট্যাক্সি আসছে। ট্যাক্সি থামতে না থামতে দরজার হাতল ধরে ফেলল ও।

সামনের খালি সীটের ওপর ঝুঁকে জানালা দিয়ে মুখ বের করল ড্রাইভার। 'কোথায় যাবে, দোস্ত?'

ঢাকার কোন স্যুট পরা লোককে ড্রাইভার যদি দোস্ত বলে, তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে, ভাবল রানা। 'ম্যান হাটন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। আজকাল ট্যাক্সিতে চড়ার আগে ড্রাইভারের অনুমতি নিতে হয়, শুনেছে রানা। অথচ আইন আছে কোন লোক শহরের মধ্যে যে-কোন জায়গায় যেতে চাইলে ড্রাইভার তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য।

'রিজন্সিতে,' ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করলে বলল রানা। প্রাইভেট কোম্পানির ট্যাক্সি, ড্রাইভার আর আরোহীর মাঝখানে

বুলেট-প্রুফ পার্টিশন নেই। থাকলে মস্ত একটা সুবিধে, ড্রাইভারের বকবকানি শুনতে হয় না।

ভাঁজ খুলেই নিউ ইয়র্ক টাইমসে মন দিল রানা। আগেই দেখে নিয়েছে, ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ছুটছে ট্যাক্সি। প্রথম পাতার হেডলাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে ভেতরের পাতা খুলল। হঠাৎ, অনেকটা যেন লাফ দিয়ে চোখে উঠে এল ছোট্ট খবরটা। নামটাই দায়ী, তা না হলে ভাঁজের ভেতর অর্ধেক লুকানো হেডিং দেখতেই পেত না। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল রানা।

'এথেন্স (এ-পি)–রড ডিকসন, পঁয়ত্রিশ, এখানকার মার্কিন দূতাবাসে অ্যাসিস্ট্যান্ট টু ফার্স্ট সেক্রেটারি, গতকাল বিকেলে গ্রীসে অ্যাটিক উপকূল থেকে খানিক দূরে সারডোনিক গালফে ডুবে মারা গেছেন। খবরে জানা যায়, একটা ইয়ট থেকে সাগরে পড়ে যান তিনি।

ডিকসনের কয়েকজন বন্ধু, যারা ইয়টের মালিক, জানিয়েছেন, ডিকসন ভাল সাঁতার জানতেন না। কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়, এখান থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে লাগোনিসির কাছে।'

ওর সাথে দেখা হলো, আর তার পরদিনই মারা গেল লোকটা! ডাবল রেড অ্যালার্টের সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? ব্রাসেলসের অশীতিপর বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল রানার। সে-ও কি মারা গেছে? ভারতীয় মেয়েটা? কালোকেশী?

'চিন্তার বিষয়!' কাগজটা ভাঁজ করে সীটের এক ধারে ছুঁড়ে দিল ও।

'তারমানে?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'কিছু না।' নিজেরই খেয়াল নেই, রানা তাকিয়ে আছে ড্যাশবোর্ডে লটকানো প্লাস্টিক মোড়া ড্রাইভারের লাইসেন্সের

দিকে। উত্তরটা শুনে আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। রানার মাথার ভেতর নানা রকম চিন্তা। হঠাৎ করেই একটা ঝাঁকি খেলো ও। এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, কিন্তু দেখছিল না, এখন দেখতে পাচ্ছে। নাম: ভ্যান বেক। ফটো: গোলমুখো ষাট বছরের এক বুড়ো। ঝট্ করে ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। বুড়োর চেয়ে অন্তত পঁচিশ বছর ছোট হবে লোকটা–চওড়া কাঁধ, শক্ত ঘাড়, কালোর বদলে ধূসর চুল, বাদামীর জায়গায় ম্লান নীল চোখ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আরে, লোকটা ওকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়!

ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। দুটো হাতই স্টিয়ারিং হুইলে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ, রানার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। চোখাচোখি হতে লোকটা বলল, 'হাতে সময় কি রকম?'

'নেই।' মুখস্থ করা সংলাপ আওড়াল রানা।

'সেজন্যেই আপনার কোন জায়গায় যাচ্ছি না।'

'জানি,' বলল রানা। গলার সুর শুনেই বোঝা যায়, লোকটা জার্মান। 'বাপজানকে কোথায় রেখে এলে? ভ্যান বেককে?'

'শাবাশ!' লোকটা হাসল। 'লাইসেন্সটা পাল্টাতে ভুলে গেছি। দুঃখিত।'

কিন্তু রানা পাল্টা হাসল না। বলল, 'দুঃখিত হবার কিছু নেই।' কিন্তু লোকটা যে এ-ধরনের ভুল করে মনে সেটা গেঁথে রাখল।

'ভাল কথা, আমি ডানিয়েল।' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে পিছন দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'ডাবল রেড অ্যালার্টের শেষ মাথা বলতে পারেন আমাকে। প্রস্তাব পেয়েছেন, কিন্তু কাজটা কি এখনও আপনাকে বলা হয়নি। আমার কাছ থেকে শুনবেন।'

মৃদু ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল রানা। অপেক্ষা করছে,

ডানিয়েল একাই কথা বলুক। কয়েক মুহূর্ত গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকল লোকটা। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সরু হয়ে গেছে রাস্তা। যানজট থেকে বেরিয়ে এসে গ্যাস পেডালে জোরে চাপ দিল ডানিয়েল। আশি মাইল স্পীডে ছুটছে একটা ফোক্সওয়াগেন আর একটা লিমুসিন, গাড়ি দুটোর মাঝখানে থাকল ওরা। লিমুসিনটাকে পাশ কাটাবার সময় ব্যাক সীটে বসা আরোহীকে দেখতে পেল রানা। সাদা চুল, নির্লিপ্ত চেহারা। চিনতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল ও। বিখ্যাত বেহালা বাদক, হফ ভ্যানডেরবার্গ।

দু'বছর আগের কথা মনে পড়ে গেছে রানার। পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে যাদের খুন করলে অন্যায় হবে না, হফ ভ্যানডেরবার্গ সেরকম একজন লোক। অ্যানি দিয়েত্রিচ-এর সাথে ব্রাজিলে দেখা হয় রানার, তার স্বীকারোক্তি আদায় করে ও।

কাগজগুলো কোথায় আছে স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল–নিউ ইয়র্কেই! সিটি ব্যাংকের একটা ভল্টে···।

চিন্তায় বাধা পড়ল।

'আমরা আপনাকে মালী হিসেবে দেখতে চাই,' সকৌতুকে বলল ডানিয়েল, নাটুকে হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। 'একটা গোলাপ কুঁড়ি তুলে আনতে হবে। ভাল কথা, অ্যাসাইনমেন্টের নামও তাই–গোলাপ কুঁড়ি।'

শুধু পিছনটা নয়, ভিউ মিররে ডানিয়েলের সামনেটাও দেখতে পাচ্ছে রানা। হাসিখুশি, শান্ত প্রকৃতির লোক। শুধু ম্লান নীল চোখ দুটো ফাঁস করে দেয়, এ লোক সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। হাসিখুশি, কিন্তু হাসিটুকু কখনোই চোখ স্পর্শ করে না। লোকটার ভেতরটা যেন পরিষ্কার দেখতে পেল রানা–প্রতিটি স্নায়ুর শেষ মাথা স্টেনলেস স্টীলের তৈরি মেরুদণ্ডের সাথে সংযুক্ত।

ট্রাইবরো ব্রিজ পেরোচ্ছে ওরা, সামনে আর দু'পাশে মনোহর

প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখেও দেখল না রানা। মন দিয়ে ডানিয়েলের কথা শুনছে।

'টিউলিপ কনওয়ের সাঙ্কেতিক নাম গোলাপ কুঁড়ি। টিউলিপ কনওয়েকে আপনি জানেন।'

রীতিমত একটা ধাক্কা খেলো রানা। টিউলিপ কনওয়ে–ফর গডস সেক! 'বলে যান!' রুক্ষকণ্ঠে তাগাদা দিল ও। সারা পৃথিবীতে না হলেও, আমেরিকার ঘরে ঘরে পরিচিত নামটা। নিষ্পাপ একটা চেহারা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। বড় বড় খয়েরি চোখ, ফোলা মুখে পবিত্র হাসি। দেখে কার না আদর করতে ইচ্ছে করে!

মার্কিন প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তান।

রানা জানে, তবু মুখ ফুটে উচ্চারণ করল ডানিয়েল, 'রিচার্ড কনওয়ের মেয়ে।'

দ্রুত হাতে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'কাজটা কি? প্রোটেকশন?' মাথা নাড়ল ও। 'সেজন্যে আলাদা লোক আছে, আমাকে দিয়ে হবে না।'

'আরে না!' আবার হাসল ডানিয়েল, এবারও চোখ স্পর্শ করল না তার হাসি। 'তবে যে-ধরনের কাজ আপনি করেন, এটা সে-ধরনের নয়।' রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে রানার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল সে। 'আপনাকে তো বলাই হয়েছে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজটা দিচ্ছি আমরা আপনাকে।'

ধৈর্য হারিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, মাথার ওপর একটা হাত তুলে চুপ করিয়ে দিল ডানিয়েল। ম্যানহাটন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি, টোল বুথে পয়সা ছুঁড়ে দিল সে। তারপর জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে ইস্ট রিভার সাইড-এর দিকে গাড়ি ছাড়ল।

এখন আর হাসছে না ডানিয়েল। 'টিউলিপ কে, এটুকু জানাই

যথেষ্ট নয়। মেয়েটা সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে আপনাকে।'

নিঃশব্দে সিগারেটে টান দিল রানা। অধৈর্য হয়ে লাভ নেই। লোকটার স্বভাবই এই, একটু একটু করে সুতো ছাড়া। অনুভব করল, ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু। কাজটা কি জানার আগেই রোমাঞ্চ অনুভব করছে ও। ক্ষীণ একটু হাসল, দেখা যাক কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে হয়। 'কেন?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ও। 'টিউলিপ সম্পর্কে সব কিছু জানার আমার কি দরকার?'

'আমরা চাই, আপনি ওকে কিডন্যাপ করবেন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ডানিয়েল। 'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার দরকার পড়েছে।'

পাঁচ

রিভারসাইড ড্রাইভ-এর একটা অ্যাপার্টমেন্টে রানাকে তুলে দিয়ে গেল ডানিয়েল। প্রচুর জায়গা আর রুচিসম্মত ফার্নিচার রয়েছে, চেয়ারগুলোয় বসে বেশ আরাম পাওয়া যায়। সি.আই.এ-র এটা একটা নিরাপদ আস্তানা, আন্দাজ করল রানা, ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে আদর্শ জায়গা। রানার ইচ্ছে ছিল রিজেন্সিতে উঠবে, তবে হোটেলে ওঠার চেয়ে এ-ই বরং ভাল হয়েছে। এখানে প্রাইভেসি-র কোন অভাব নেই।

কিচেনটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, রান্নাবান্নার আয়োজনে কোন খুঁত নেই। খুদে একটা বার-ও রয়েছে, দিন সাতেক মাতাল থাকার জন্যে যথেষ্ট বোতল দেখল রানা। জিনিস-পত্র বেডরুমে রেখেছে ও,

এখনও কাপড় ছাড়েনি। ছোট্ট একটা গ্লাসে নিয়ে এক ঢোক হুইস্কি ঢালল গলায়, এই সময় আওয়াজটা কানে এল। কার্পেটের নিচে মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল কাঠের পাটাতন।

পেশীতে টান পড়ল, কোমরের কাছে রিভলভারে পৌঁছে গেল একটা হাত। কিন্তু ঘুরল না রানা। স্থির দাঁড়িয়ে বার-এর ওপর লটকানো অয়েলপেইন্টিং দেখছে। তারপরই ঢিল পড়ল পেশীতে, বোতল থেকে আরেকটু হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। 'আগের সেই নিঃশব্দ বিড়ালের পা আর নেই আপনার,' পিছন দিকে না তাকিয়েই বলল ও।

ওর পিছনে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'কি করে বুঝলেন আমি?'

'সেই দৃষ্টিও নেই,' বলল রানা। ইঙ্গিতে তৈলচিত্রটা দেখাল। কাঁচের গায়ে দু'জনের প্রতিবি' পড়েছে। এবার ঘুরল রানা। রঙ-চটা জিন্স পরে আছে লোকটা, নীল ক্যাপ, মুখে একদিনের না-কামানো দাড়ি। হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করল রানা। 'চলবে, কর্নেল?'

'প্লীজ, মেজর!'

লিভিং রূমে বসল ওরা, জানালার বাইরে বৃষ্টি ভেজা বিষণ্ন দিন। সোফায় বসার আগে সবগুলো জানালার পর্দা টেনে দিল কর্নেল উইলিয়াম অবসন। ল্যাম্প থেকে কোমল আলো বেরুল।

মুখে হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করছে কর্নেল। রানা নির্লিপ্ত। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অফার করল কর্নেল, মাথা নাড়ল রানা। হাতের গ্লাসটা মাঝখানের নিচু তেপয়ে রাখল ও। 'কেন?'

মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল অবসনের। 'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'আপনি আমাকে দিয়ে প্রেসিডেন্ট কনওয়ের মেয়েকে কিডন্যাপ করাতে চান,' বলল রানা, 'কেন?'

'জানতাম প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারেন।' তেপয় থেকে নিজের গ্লাসটা তুলল অবসন, কিন্তু হুইস্কির স্বাদ নিল না। 'সব কথা আপনাকে বলা সম্ভব নয়। সে ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়নি।'

'ক্ষমতা নেই, নাকি আমার ওপর বিশ্বাস নেই?'

'না, প্লীজ, ছি-ছি!' যেন খুবই লজ্জা পেয়েছে অবসন। 'বিশ্বাস না থাকলে এত থাকতে আপনাকে কেন কাজটা দেব, বলুন?'

'তাহলে? আমাকে বলতে অসুবিধে কি?'

'ব্যাপারটা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত,' বলল অবসন। 'ফাঁস হয়ে গেলে আমেরিকার সর্বনাশ ঘটে যাবে। আপনাকে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমরা একটা বিষাক্ত কাঁটা তোলার প্ল্যান করেছি।'

'আমার সময়ের দাম আছে,' বিরক্ত হলো রানা। 'যোগাযোগ করার পর থেকে আপনারা শুধু হেঁয়ালি করে চলেছেন। আর কেউ না জানুক, আপনি অন্তত জানেন, আমি এতটা বোকা নই যে কিছু না জেনে অন্ধকারে ঝাঁপ দেব। সব কথা যদি বলা সম্ভব না হয়, আর কারও সাথে যোগাযোগ করেননি কেন?'

সত্যি কথাটাই বলল অবসন, 'আর কাউকে এই কাজের উপযুক্ত বলে মনে হয়নি, তাই। শুধু গবেষকরাই নয়, কমপিউটরও আপনার নাম সাজেস্ট করেছে। পারলে আপনিই পারবেন।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলল সে। 'সব জানলে আপনার ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আমাকে বিশ্বাস করুন, কাজটা করার জন্যে সব কথা জানার দরকারও নেই।'

এককথায় জানিয়ে দিল রানা, এ-সব কথায় চিড়ে ভিজবে না, 'আমি আপনার সাথে একমত নই।'

অবসনের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। 'কাজটা কি আপনি জেনে ফেলেছেন, কাজেই...'

'ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না,' অবসনকে বাধা দিল রানা।

হাতের গ্লাসটা ঠকাস করে তেপয়ে নামিয়ে রেখে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল অবসন। 'আলোচনাটা এভাবে আপনি ভেঙে দিতে পারেন না, মি. রানা।'

কথা না বলে রানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি জানেন, মি. রানা,' রাগের সাথে বলল কর্নেল। 'আমি সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর। আমার কথা অনেকেই শুনবেন, তার মধ্যে প্রেসিডেন্টও একজন। আমি রানা এজেন্সির সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে দিতে পারি।'

রানার মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। 'কি অভিযোগে?'

'রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য জানার অপচেষ্টা!'

'শুধু আপনার একার নয়, কর্নেল,' বলল রানা, 'প্রেসিডেন্টের আরও বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁদের কথাও তিনি শোনেন। অভিযোগটা যে মিথ্যে সেটা তাঁর কানে তুলতে পারব আমি।'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল অবসন। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল সে, শুরুটা ভুলভাবে করা হয়েছে। জেদ ধরে রানার সাথে পারা সম্ভব নয়। প্রথমেই তার নরম সুরে কথা বলা উচিত ছিল। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ওকে পথে আনা সম্ভব নয়। তবে, রানা পাল্টা যে হুমকিটা দিল, তাতে ভয়ের কিছু নেই। রানা বা ওর বস্ মেজর জেনারেল রাহাত খান যাতে প্রেসিডেন্টের নাগাল না পায় তার ব্যবস্থা করা আছে। যাদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের কাছে ধর্না দেবে ওরা, তাদের কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করলে একের পর এক বাধা আসবে। পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, এই কাজের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, আপনাকে রাজি করানোর জন্যে সেটাই যথেষ্ট।'

'কেউ যদি বলে, তোমাকে চ্যালেঞ্জ করা হলো, দেখি তো নিজের পায়ে কুড় ল মারতে পারো কিনা—চ্যালেঞ্জটা আপনি গ্রহণ করবেন?'

'কিন্তু আপনাকে কেউ নিজের পায়ে...'

বাধা দিল রানা, 'বুঝব কিভাবে?'

আবার পায়চারি শুরু করল অবসন। তারপর আবার রানার সামনে থামল। 'ফি-র অঙ্ক বাড়িয়ে দিন, যত খুশি টাকা নিন—কিন্তু ফর গডস সেক সব কথা জানতে চাইবেন না, প্লীজ!'

উত্তরে হাতঘড়ি দেখল রানা।

সামনের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ল অবসন। এরই মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে চেহারা।

ঝাড়া এক মিনিট কেটে গেল। চোখ বুজে ধ্যানে বসেছে অবসন।

রানা বলল, 'আমি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি না।'

'আমরা একটা সিকিউরিটি লিক আবিষ্কার করেছি,' হঠাৎ শুরু করল অবসন। 'কেউ একজন ক্লাসিফায়েড ডাটা পাচার করছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। সি.আই.এ-র লোক সে, হাই অফিশিয়ালদের একজন।' রানার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'খুবই হাই অফিশিয়ালদের একজন। পাচার হওয়া তথ্যের ধরন দেখে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিন্তু কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না। এ-ধরনের ঘটনা কিছুদিন পর পর ঘটে। আর ঘটে বলেই সি.আই.এ. বিশেষ ধরনের কিছু এজেন্ট পোষে যাদের কাজই হলো ঘরের শত্রু বিভীষণদের খুঁজে বের করা। শুধু সি.আই.এ-তে নয়, প্রায় সব ইন্টেলিজেন্সেই এ-ধরনের এজেন্ট থাকে।

উঠে গিয়ে নিজের গ্লাসটা আবার ভরে নিল অবসন। এরপর

আর বসল না, ঘরের মাঝখানে হাঁটাহাটি করতে লাগল। 'প্রথম দিকে,' আবার মুখ খুলল সে, 'চারজনকে সন্দেহ করি আমরা। প্রত্যেককে আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়। সবাই তারা উতরে যায়। মাথায় যেন বাজ পড়ে আমাদের। তাহলে কে? পঞ্চম একজন লোককে সন্দেহের তালিকায় আনতে হয়–সে এমন একজন, তার পদ মর্যাদার জন্যে তাকে আমরা প্রথমেই বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য! তার মত লোক ডাবল এজেন্ট···কেন, কেন!' আঙুল দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরল সে। 'তার ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যে-কোন মুহূর্তে, ইচ্ছে করলেই, ওভাল অফিসে ঢুকতে পারে। প্রেসিডেন্টের পরেই তার স্থান···'

পাথর হয়ে বসে আছে রানা। শুধু চোখ দুটো অনুসরণ করছে অবসনকে। চেহারায় খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অবিশ্বাস। 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

ধীর ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল অবসন।

রানার চেহারা থেকে কৌতুকের ভাব অদৃশ্য হয়ে গেল। 'জেফ রিকার্ড?'

'জেফ রিকার্ড,' ফিসফিস করে বলল অবসন, প্রচণ্ড রাগে গ্লাস ধরা হাতটা কাঁপছে। 'জেফ রিকার্ড, সি.আই.এ-র ডিরেক্টর।'

সোফায় হেলান দিয়ে বড় করে একটা শ্বাস টানল রানা। চমকটা হজম করতে সময় লাগছে। অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ডাবল রেড অ্যালার্টের কারণটা বোঝা গেল। বোঝা গেল কেন অবসন পাগলপারা হয়ে আছে। ওরা সবাই যার অধীনে কাজ করে, সি.আই.এ-র চীফ। এটুকুই যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু জেফ রিকার্ড শুধু সি.আই.এ-র চীফ নয়, আরও অনেক কিছু। গত নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের প্রধান মুখপাত্র ছিল সে। চীফ পলিসি

অ্যাডভাইজার।

আরও বেশি। প্রেসিডেন্টের সচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোকটা। প্রেসিডেন্ট তার মত আর কাউকে বিশ্বাস করেন না।

'বিপদ,' বলল রানা।

'বিপদ? বলুন, ডিনামাইট!' গ্লাসটা ঘন ঘন নাড়ল অবসন, ভেতরে লালচে হুইস্কি ঘুরতে লাগল। তার চেহারা রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে লাল হয়ে আছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, শব্দটাকে চাপা দিল গ্লাসের গায়ে টুকরো বরফের ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ। এক চুমুকে হুইস্কিটুকু গিলে ফেলল সে। আবার যখন রানার দিকে তাকাল, প্রায় শান্ত হয়ে গেছে চেহারা। ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরেছে। 'বলাই বাহুল্য প্রেসিডেন্ট নিরেট প্রমাণ চাইবেন। আমি বললেই তিনি বিশ্বাস করবেন না। সে-জন্যেই তাঁর মেয়ের কথা উঠছে।'

যোগাযোগটা কোথায়, রানা আন্দাজ করতে পারল। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এরকম একটা টোপ দিয়ে ফাঁদ পাতা হবে।

'হ্যাঁ,' বলল অবসন, যেন রানা কি ভাবছে বুঝতে পেরেছে, 'কিডন্যাপিংটা হবে জেফ রিকার্ডের পরীক্ষা। প্রেসিডেন্টের মেয়ে টিউলিপ শত্রুদের হাতে। যেভাবে হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে রিকার্ডের।' অবসনের চোখে ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'একের পর এক সূত্র পাবে সে। আমরাই দেব, নিজেদের তৈরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, সবগুলো সূত্র ভুয়া, কোথাও পৌঁছুনো যায় না। কোন কোন সূত্র হবে গোলমেলে, একটার সাথে আরেকটা মিলবে না। আবার কোনটা হবে ধ্বংসাত্মক। মরিয়া হয়ে উঠবে রিকার্ড, কিন্তু এগোবার কোন পথ পাবে না। তাকে আমরা অসহায় অবস্থায় ফেলব। কোণঠাসা হয়ে পড়বে সে। এ-সবই একটি মাত্র কারণে করা হবে···।'

'সে যাতে অপর পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে।' ধীরে ধীরে

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কৌশলটা মন্দ নয়। সেন্ট পার্সেন্ট সম্ভাবনা, ফাঁদে পা দেবে রিকার্ড। কিন্তু বিপজ্জনক। সত্যি কথা বলতে কি, এরচেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না।'

'এটাই একমাত্র কৌশল,' জোর দিয়ে বলল অবসন। 'ব্যাপারটা এমন কিছু হওয়া চাই যার সাথে প্রেসিডেন্ট সরাসরি এবং ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। নিজের মেয়ে নিখোঁজ, কাজেই তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না, কাজেই তাকে উদ্ধার করা যার দায়িত্ব তার ওপর তিনি নির্ভর করবেনই। হোয়াইট হাউসের স্টাফরা প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট দেবে, কোনটাতেই পরিষ্কার কিছু থাকবে না। জানা কথা, ওগুলো তিনি মানবেন না। জেফ রিকার্ডের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য ও রিপোর্ট চাইবেন তিনি।'

'এবং কোন অজুহাতও তিনি শুনবেন না।'

'না।'

'ভুল করারও কোন অবকাশ নেই।'

'নেই। পরিপূর্ণ সাফল্য ছাড়া কিছুই তিনি মানবেন না। জেফ রিকার্ডের এ-সব কথা জানা থাকবে। সূত্রগুলো যখন ভুয়া প্রমাণিত হবে, প্রেসিডেন্টের কাছে ফিরে গিয়ে এ-কথা বলতে পারবে না যে কপাল খারাপ তাই কাজটায় ব্যর্থ হলাম, এর পরের বার আরও ভাল করার চেষ্টা করব। নো, নেভার,–এই একটা কাজে ব্যর্থ হওয়া চলবে না তার। জীবনে যা কিছু মূল্যবান মনে করে সে, সব হারাবার আশঙ্কা দেখা দেবে। তার চাকরি। প্রেসিডেন্টের সাথে তার বন্ধুত্ব। তার ক্ষমতা।'

'পামেলা কনওয়ের সাথে তার সম্পর্কের কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল।'

'হ্যাঁ, ফার্স্ট লেডির সাথে তার যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে, ব্যর্থ হলে সেটাও তাকে হারাতে হবে। মোট কথা, সূত্রগুলোয় কোন

কাজ না হলে,–কাজ যাতে না হয় সেদিকটা আমরা দেখব–আর মাত্র একটা পথ খোলা থাকবে তার সামনে। লৌহ যবনিকার অন্তরালে বন্ধুদের শরণাপন্ন হওয়া। ওদের সাহায্য তার চাইতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। চমৎকার প্ল্যান। প্রেসিডেন্ট সরাসরি জড়িত, কাজেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে ব্যাপারটাকে।

কিন্তু জেফ রিকার্ডের সমস্যা আর রানার সমস্যা এক নয়।

রানাকে বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করো। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। অসম্ভব এই জন্যে যে কাজটায় কোন খুঁত থাকা চলবে না। খুঁত থাকলেই জেফ রিকার্ড টের পেয়ে যাবে, টিউলিপকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা তার জন্যে একটা ফাঁদ। তা যদি বুঝে ফেলে, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্টের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে সে, টিউলিপকে কিডন্যাপ করতে সাহায্য করেছে সি.আই.এ-রই কিছু অফিসার। কিডন্যাপার এবং সহায়তাকারীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেবেন প্রেসিডেন্ট। কিংবা রিকার্ড হয়তো পালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যাবে। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে পালাতে হয় নিশ্চই তা সে জানে।

তারমানে, বাইরের তেমন কোন সাহায্য ছাড়াই কাজটা রানাকে একা করতে হবে। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, অল্পুত একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল। এত বড় ঝুঁকি আগে কখনও নেয়নি ও। উঠে গিয়ে গ্লাসে আরও খানিকটা হুইস্কি নিল। মোটিভ বাদ দিয়ে অপারেশন নিয়ে ভাবছে। 'কেন' গুরুত্ব হারাল, গুরুত্ব পেল 'কিভাবে'। কে কার পক্ষ নিয়ে কাজ করছে সেটা জানা দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে জরুরী মনে হলো না।

ঠেকায় পড়ে সাহায্য চাইছে সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, মোটা টাকা আয় হবে রানা এজেন্সির। আর অনুমতি তো বস্

আগেই দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কাজটা রানার করার ইচ্ছে অন্য কারণে। চ্যালেঞ্জটা নিতে চায় ও। টিউলিপকে কিডন্যাপ করা অসম্ভব, তাই করবে। রহস্যের ভেতর রহস্য থাকতে পারে, সেটাও একটা কারণ। কিন্তু তা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে।

'যদি করি,' অবসনকে বলল ও, 'প্ল্যানটা আমার নিজের হবে।'

'স্বভাবতই,' সাথে সাথে জবাব দিল অবসন। 'আমি পারলে আপনাকে দরকার হত না।' রানার সামনে সোফায় বসল সে।

'মেয়েটার কোন ক্ষতি হওয়া চলবে না।'

'বলাই বাহুল্য। ক্ষতি তো দূরের কথা, তাকে সত্যিকার কোন ঝুঁকির মধ্যেই রাখা চলবে না। শুধু টিউলিপ কেন–পরিবারের অন্যান্য সদস্য, চাকরবাকর, স্টাফ, সিক্রেট সার্ভিস, কারও কোন ক্ষতি করা যাবে না। কেউ যেন আহত না হয়।'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, প্রেসিডেন্টকে যেন খুন না করে ফেলি, এই তো?'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল অবসন। 'নিজের ভাল চাইলে না করাই উচিত হবে।'

কিন্তু শিরিন ওর হাত দেখে কি যেন বলেছিল? স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। মনে পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা–দুই সুপার পাওয়ারের যে কোন একটার সরকার প্রধান আপনার হাতে খুন হবেন।

রুশ সরকার-প্রধান, নাকি মার্কিন সরকার-প্রধান?

'কিডন্যাপ করলেন, তারপর? তারপর কি হবে?'

'বলুন।'

'হোয়াইট হাউস থেকে বের করার পর টিউলিপকে আপনি দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাবেন,' বলল কর্নেল।

চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। চোখের সামনে হোয়াইট হাউসের

ছবি ভেসে উঠল। বাইরে থেকে দেখা যায় না, ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া আছে–ইলেকট্রিফায়েড। ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমের কিছু কিছু রহস্য জানে ও, বেশিরভাগই জানে না। সিক্রেট এজেন্ট আর স্পেশাল পুলিস গিজ গিজ করছে চারদিকে। এ-সব বাধা টপকে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে চুরি করে আনতে হবে। এখানেই শেষ নয়। এরপর আবার সুরক্ষিত মার্কিন বর্ডার পেরোতে হবে। ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'খুব সহজ করে দেবেন না,' হালকা সুরে বলল ও। 'আমার একঘেয়ে লাগতে পারে।'

ঠোঁট টিপে হাসল অবসন। 'দেখতে পাচ্ছি চ্যালেঞ্জটা আপনি উপভোগ করছেন!'

রানা গম্ভীর হলো। 'কাজটা কঠিন।'

'জানি। এত কঠিন যে আপনার সাহায্য চাইতে হলো। একটা কথা…,' বলে চুপ করে গেল অবসন।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। একটা চুরুট ধরাল অবসন, তারপর আবার বলল, 'গোটা ব্যাপারটাকে আন্তর্জাতিক বলে মনে হতে হবে। তবেই জেফ রিকার্ড বিশ্বাস করবে যে রাশিয়ানরা সাহায্য করতে পারবে তাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'টিউলিপকে…,'

ভুলটা শুধরে দিল রানা, 'গোলাপ কুঁড়ি।'

'ও, ইয়েস, সরি! ওকে আপনি যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন, মানে গ্রীসের যে কোন জায়গায়।'

'গ্রীসে কেন?'

'কারণ আপনার যদি সাহায্য দরকার হয়, ওখানে আমার বিশ্বস্ত লোক আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, গোলাপ কুঁড়ি গ্রীসে পৌঁছুল।

তারপর?'

'ওখানে আপনি আমার সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন,' বলল অবসন। ঠোঁটের কোণ থেকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল সে, সরাসরি তাকিয়ে আছে রানার চোখে। 'তারপর আমাদের দেখা হবে। আপনার কাছ থেকে গোলাপ কুঁড়ি ডেলিভারি নেব আমি। তার আগে পর্যন্ত, কিছুই আপনি করবেন না। স্রেফ সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখবেন ওকে। কমপক্ষে দু'হপ্তা লুকিয়ে রাখতে হবে–বেশিও হতে পারে, নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

দু'হপ্তা! ডানিয়েল ঠিকই বলেছিল, গোলাপ কুঁড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা দরকার ওর।

গ্রীসের কোথাও ওকে নিয়ে যেতে হবে, রানা জানে। জানে না শুধু প্রেসিডেন্টের মেয়েকে নিয়ে কিভাবে ওখানে পৌঁছুনো যায়। 'ভুয়া সূত্র সম্পর্কে বলুন এবার।'

'ওসব ডানিয়েল সামলাবে। ও এখানে এলেই আপনার কি কি লাগবে আলোচনা করব আমরা। ভাল কথা, ও-ই আপনার সাথে আমার যোগাযোগ। আজ আমি এখান থেকে চলে যাবার পর, গোলাপ কুঁড়িকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সময় না হওয়া পর্যন্ত চাই না আপনার সাথে আমার আবার দেখা হোক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। গ্লাসটা ভরার জন্যে আবার উঠল।

'ও, হ্যাঁ, ভাল কথা–ভুলে যাবেন না, আপনি মারা গেছেন।'

'কেউ ভোলে?' অবসনের দিকে পিছন ফিরে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালল রানা। বোতলের ছিপি বন্ধ করল। ফিরল অবসনের দিকে। 'শুধু দুঃখ এই যে আগে খবর পাইনি, তা না হলে মাটি দিতে অবশ্যই যেতাম।'

'গোটা ব্যাপারটা প্রায় চুপিসারে সারা হয়েছে,' বলল অবসন। 'বলতে গেলে প্রায় কেউই উপস্থিত ছিল না।'

'তাহলে বলব, আপনাদের কাজে একটা খুঁত থেকে গেছে।'

'কি রকম?'

'আমাকে কবর দেয়া হলো, অথচ সেখানে আমার বস্ উপস্থিত ছিলেন না,' বলল রানা, 'অনেকেই ব্যাপারটাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখবে।'

অবসনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'উনি ছিলেন।'

'হোয়াট!'

'তাঁর ছদ্মবেশ নিয়ে অন্য এক লোক।'

কঠিন সুরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর অনুমতি নিয়েছেন?'

হাসল অবসন, বলল, 'অবশ্যই।' কলিং বেল বেজে উঠল। 'ডানিয়েল পৌঁছে গেছে।' সোফা ছেড়ে দরজার দিকে এগোল সে। তাকে বাধা দিল রানা, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এগোল। নিঃশব্দে দরজার পাশে দাঁড়াল রানা, পিপহোলের ঢাকনি সরিয়ে চোখ রাখল ফুটোয়। ডানিয়েলই, এখনও আগের সেই জ্যাকেটটা পরে আছে, হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। তালা খুলে কবাট উন্মুক্ত করল রানা। কব্জায় তেল দেয়া হয়েছে, কোন শব্দ হলো না।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ডানিয়েল। 'অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ হয়েছে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

লোকটা রানার চেয়েও লম্বা, শক্তিশালী গঠন। মুখের বাঁ দিকে, চোখের নিচ থেকে জুলফি পর্যন্ত পুরানো একটা কাটা দাগ। চিন্তাটা আরেকবার খেলে গেল রানার মাথায়–আর লোক পেল না অবসন, এরকম একটা দাগী লোক দু'জনের মাঝখানে যোগাযোগ হিসেবে থাকবে? 'ভালই,' জবাব দিল ও।

খুশি হলো ডানিয়েল। 'চেষ্টা করছি আপনার সব প্রয়োজন যেন মেটে এখানে।' রানার হাতের গ্লাসটা লক্ষ করল সে। 'দুঃখের বিষয়, পাশের অ্যাপার্টমেন্টের লালচুলো সুন্দরী মেয়েটা

হপ্তা কয়েকের জন্যে চলে গেছে…'

'নিশ্চই স্বইচ্ছায় নয়।'

'না। বেচারি পায়ে আঘাত পেয়েছে। স্কিইং করছিল, আরেকজনের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে যায়।' ডানিয়েলের চোখে উল্লাসের নগ্ন নীল আলো নাচতে লাগল। সাবধান, নিজেকে সতর্ক করল রানা, লোকটা ভয়ঙ্কর। ধূসর চুল আর ফর্সা গায়ের রঙের সাথে মুখের কাটা দাগটা মেলেনি, ওটা লালচে। চোখ ফিরিয়ে নিল রানা।

একটা চেয়ারের পাশে অ্যাটাচি কেস নামিয়ে রাখল ডানিয়েল, চেয়ারটায় বসল। অবসনের দিকে তাকাল সে। কিন্তু অবসন তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'যা যা চান সব আপনি পাবেন,' বলল অবসন। 'আক্ষরিক অর্থেই বলছি–যে-কোন জিনিস। লোকবল, ভুয়া কাগজ-পত্র, টেকনিক্যাল সার্ভিস, সমস্ত।'

'টাকা?'

'আগের কাজটায় সি.আই.এ. আপনাকে এক বিলিয়ন টাকা দিয়েছিল,' বলল অবসন। 'কারণ, মেরিলিন চার্টের দাম ছিল কয়েকশো বিলিয়ন ডলার। এই কাজটা আরও কঠিন। আমরা সফল হলে লাভ কি হবে সেটা হিসেব করা সম্ভব নয়। আমেরিকা রাহুমুক্ত হবে, কাজেই লাভ হিসেব করা কিভাবে সম্ভব! সমস্ত খরচ আমাদের, আপনার ফি ধরা হয়েছে দুই বিলিয়ন ডলার। যদি আপত্তি করেন…'

মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। 'কত বললেন?'

'ঠিক আছে, আড়াই বিলিয়ন,' তাড়াতাড়ি বলল অবসন। 'এতেও যদি সন্তুষ্ট না হন আমাকে তাহলে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করতে হবে…।'

বলে কি! আড়াই বিলিয়ন ডলার? ওদের কি মাথা খারাপ

হয়েছে! মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। অঢেল টাকা দিয়ে কি কিনতে চাইছে ওরা? ওর সার্ভিস, নাকি ওর আনুগত্য? রহস্যের ভেতর রহস্য?

নিজের অজান্তেই লোভ জাগল মনে। বি.সি.আই-এর অনেকদিনের একটা অভাব পূরণ হতে পারে দুই বিলিয়ন ডলার হাতে এলে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড একটা সাবমেরিন কিনতে পারে ওরা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে।'

'হাত খরচের জন্য আপাতত এক লাখ ডলার হলে চলবে?' জিজ্ঞেস করল অবসন, রানা আড়াই বিলিয়নে রাজি হওয়ায় ভারি খুশি সে।

'চলবে,' বলল রানা। 'পরে আরও লাগলে বলব। এক লাখ ডলার ছোটবড় নোটে মিলিয়ে দেবেন। নতুন টাকা নয়। কোন মার্ক থাকা চলবে না। পুরো টাকাটা যেন মানি বেল্টে ধরে।'

ডানিয়েলের দিকে তাকাল অবসন। ডানিয়েল মাথা ঝাঁকাল। সম্ভব।

'টাকা ছাড়াও অনেক জিনিস দরকার হবে আমার,' বলল রানা।

ঝুঁকে অ্যাটাচি কেসটা কোলের ওপর তুলল ডানিয়েল। তালা খুলে ডালা তুলল। একটা ফাইল বের করল ভেতর থেকে। 'টিউলিপ কনওয়ের ফাইল…।'

খুক করে কাশল অবসন।

'দুঃখিত, গোলাপ কুঁড়ি,' বলল ডানিয়েল। 'সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পর্যন্ত যা যা করে, সমস্ত কিছুর বিস্তারিত বিবরণ পাবেন এতে। তার যে-সব বন্ধু বা আত্মীয়রা হোয়াইট হাউসে বেড়াতে আসে বা আসবে, সবার নাম-ঠিকানা আছে। তার ডাক্তার আর ডেন্টিস্টও বাদ যায়নি। মাত্র চার বছর বয়স, ব্যক্তিগত অভ্যাস কি আর থাকতে পারে,

তবু কিছু কিছু ব্যাপার নোট করা আছে।' রানার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'সিকিউরিটি সম্পর্কে আলাদা ফাইল। পারমানেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছে ছ'জন এজেন্ট। দরকার হলে আরও অনেকে মুহূর্তের নোটিশে হাজির হবে। ওরা ছ'জন পালা করে ডিউটি দেয়।'

ফাইলগুলো নিয়ে চোখ বুলাল রানা। 'আপনাদের ভাল সোর্স আছে দেখছি।'

'তা আছে।'

'এসব তথ্য নিখুঁত কিনা...'

'সম্পূর্ণ।'

একবার চোখ বুলিয়ে ফাইলগুলো আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখল রানা। পরে মন দিয়ে পড়বে সব। 'আর কি দরকার বলছি। মেয়েটা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো তার চারপাশে যারা রয়েছে। ওদের সবার ফাইল দরকার হবে আমার।'

'বেশ।' মাথা ঝাঁকাল অবসন।

'প্রতিদিন সিক্রেট সার্ভিস নানা রকম তথ্য পায়, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওগুলো আমাকেও জানতে হবে। আর পরিবারের প্রত্যেকের শিডিউল আগেভাগে পেতে হবে।'

ডানিয়েলের দিকে না তাকিয়েই অবসন বলল, 'পাবেন।'

'হোয়াইট হাউসে প্রচুর চিঠিপত্র আসে, যায়ও,' বলল রানা। 'সবগুলো কপি দরকার আমার।'

মাথা ঝাঁকাল অবসন। 'আর কিছু?'

'পুরানো চিঠিগুলো দরকার,' বলল রানা। 'যত পুরানো সম্ভব।'

অবাক হলো অবসন। 'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তা জানি না। জানলে তো বলেই

দিতাম, অমুক দিনের চিঠিগুলো শুধু নিয়ে আসবেন। সব পেলে ঘাঁটতে ঘাঁটতে হয়তো এমন কিছু চোখে পড়বে, হোয়াইট হাউসে ঢোকার একটা উপায় পেয়ে যাব।'

'লম্বা অর্ডার,' চিন্তিতভাবে বলল অবসন। 'একটু ছোট করে আনা যায় না? হোয়াইট হাউসে প্রতি হপ্তায় পঁচাত্তর হাজার চিঠি আসে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রানা বলল, 'এক কাজ করুন। ভক্ত আর খ্যাপাদের চিঠি বাদ দিন। ফটো, অটোগ্রাফ, ইত্যাদি চেয়ে লেখা চিঠিগুলোও দরকার নেই। বিল, মেমো, এ-সবও বাদ।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অবসন, তারপর ডানিয়েলের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

'খবরের কাগজ,' বলল রানা। 'ওয়াশিংটনের সবগুলো দৈনিক। সেদিনেরটা সেদিনই।'

'ওটা কোন সমস্যা নয়,' বলল অবসন।

'গোলাপ কুঁড়ি কত বড় জানতে হবে আমাকে।'

অবসন শ্রাগ করল। 'বয়সের তুলনায় ছোটই বলা চলে তাকে।'

'সঠিক মাপ, ওজন ইত্যাদি জানতে হবে,' বলল রানা। 'কতটা লম্বা? ক'বছর ক'মাস ক'দিন বয়স?'

'আর কিছু?' সোফায় নড়েচড়ে বসল অবসন।

'হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস। ব্যাপারটা আমার জন্যে একান্ত দরকার।' সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। ঝুঁকি নিয়ে ভাবছে ও। জীবনের ঝুঁকি নয়, সেটা তো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আছে। ওর এই পেশায় মৃত্যু একটা স্বাভাবিক সম্ভাবনা। মৃত্যুর চেয়ে বেশি ভয় করে রানা ব্যক্তিগত পরাধীনতাকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়েকে নিয়ে পালাবার সময় ধরা পড়ে গেলে কত

যুগ জেলে পচতে হবে কে জানে!

সত্যি বটে, খোদ সি.আই.এ. তাকে আইন ভাঙার অধিকার দিচ্ছে। সেদিক থেকে ভাবলে কোন হুমকি নেই। কিন্তু এবারের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কোন সন্দেহ নেই, সি.আই.এ. তার সীমা লংঘন করতে যাচ্ছে। এর চেয়ে বিপজ্জনক কাজে আর কখনও রানাও হাত দেয়নি। অথচ অনুরোধটা সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের কাছ থেকে আসছে না। ঠিক উল্টো, গোটা ব্যাপারটাই পরিচালিত হবে তার বিরুদ্ধে।

সরাসরি অবসনের চোখে তাকাল রানা। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট অথোরাইজ করছে কে?'

মাথা নাড়ল অবসন। 'সেটা আপনাকে আমি বলতে পারি না।'

শ্রাগ করল রানা। 'তারমানে রানা এজেন্সির সার্ভিস আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন। শুধু আপনার একার কথায় কেন ঝুঁকি নিতে যাব আমি?'

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। বাইরে আরও চেপে এল বৃষ্টি, ফোঁটাগুলো তেরছাভাবে পড়ছে। জানালার কাঁচে। ঘরে আর কোন আওয়াজ নেই।

অবশেষে, অবসনই প্রথম কথা বলল, 'হ্যাঁ, আপনার কথায় যুক্তি আছে। কি ধরনের প্রোটেকশন পাচ্ছেন সেটা জানার অধিকার আপনার আছে।'

'বলুন।'

'সম্ভাব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটেকশন–প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে।'

থ হয়ে গেল রানা। আর যাই আশা করুক ও, এটা আশা করেনি। 'প্রেসিডেন্ট? তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ হতে দিতে রাজি হয়েছেন? তাও, সি.আই.এ-র দ্বারা?'

'প্রেসিডেন্ট জানেন, লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে না পারলে মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'মাই গড!' বিস্ময়ের ঘোর রানার যেন কাটতেই চায় না। ধীরে ধীরে আবার সোফায় হেলান দিল ও। টিউলিপ কনওয়ে মহামূল্যবান একটা শিক্ষা পেতে যাচ্ছে, ভাবল ও–দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস কোরো না।

'বলুন,' জিজ্ঞেস করল অবসন, 'এবার আপনি সন্তুষ্ট? ব্যাপারটা যদি কোনভাবে কেঁচে যায়, খোদ প্রেসিডেন্ট আপনাকে প্রোটেকশন দেবেন। কি বলেন, যথেষ্ট নয় কি?'

'আমি লিখিত আশ্বাস চাই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'পাবেন, তবে খানিক সময় দিতে হবে,' আশ্বস্ত করল অবসন। তারপর গাল ফুলিয়ে হাসল সে। 'আপনি খুব সতর্ক, মি. রানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যতটা ভাবছেন, ততটা নই। হলে এতক্ষণে পালিয়ে যেতাম।'

কেন যেন খুঁতখুঁতে ভাবটা থেকেই গেল রানার মনে।

ছয়

ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভয় পেলেন পামেলা কনওয়ে। আচমকা জ্বর এলে যেমন কাঁপুনি ধরে, সেরকম বার কয়েক শিউরে শিউরে উঠলেন।

রঙের কৌটায় তুলি ডুবিয়ে আবার মন দিলেন ছবি আঁকায়। মেয়ে টিউলিপের ছবি আঁকছেন তিনি, কিন্তু কোনভাবেই পরিচিত

হাসিটুকু ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। আরেকবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসলে কোনদিনই আমি পোর্ট্রেট পেইন্টার হতে পারব না। ল্যাণ্ডস্কেপ আর স্টীল লাইফ খুবই ভাল আঁকেন। নিউ ইয়র্ক গ্যালারিতে তাঁর আঁকা ছবি বিক্রিও হয়। তবে এই শেষ, পোর্ট্রেট তিনি আর আঁকবেন না। টিউলিপের ছবি অবশ্য গ্যালারিতে পাঠানো হবে না, এটা তিনি আঁকছেন স্বামীর জন্যে, হোয়াইট হাউসের স্টাডিরুমের দেয়ালে টাঙানো হবে।

ক্যানভাসে তুলি বুলাতে বুলাতে মনের ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করলেন পামেলা। ভাবলেন, সব মানুষেরই কোন না কোন দুর্বলতা থাকে। আমার দুর্বলতা আমার মেয়ে। ওর যদি কিছু হয়…

হঠাৎ করে তাঁর খেয়াল হলো, আরে, এখুনি দেখছি সন্ধে হয়ে এল! হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন, পাঁচটা বেজে গেছে। স্মক খুলে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বেডরুমের দিকে এগোলেন।

একঘণ্টা পর আবার বেরুলেন, গরম পানিতে শাওয়ার সেরে স্টেট ডিনারের জন্যে ড্রেস পরে নিয়েছেন। কুণ্ডুলী পাকানো ছোট ছোট চুলের গোছা ফ্রেমের মত ঘিরে রেখেছে মুখটাকে। খয়েরি চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, হাঁটার ভঙ্গিতে সতেজ ভাব, নিটোল চোয়ালে দু'চারটে তিল। ফার্স্ট লেডির নাকটা খুব খাড়া, মখমলের মত গায়ের চামড়া। হাসলে, হাসিটা শুধু ঠোঁটেই থেমে থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে, চোখে; এমনকি দেহ-ভঙ্গিতেও একটা পরিবর্তন ঘটে যায়–পুলকস্পর্শে অধীর নর্তকীর মত। সন্দেহ নেই, সুখী একজন মহিলা।

হোয়াইট হাউসে দিনগুলো তাঁর সুন্দর কাটছে। স্বামীকে নিয়ে তিনি গর্বিত। বুকের ধন পরমাসুন্দরী কন্যা টিউলিপকে পেয়ে তাঁর আশা পূরণ হয়েছে। ছবি আঁকা তাঁর নেশা, হোয়াইট হাউসে

আসার পর নেশাটা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়নি। লোকে যে যাই বলুক, তিনি ভাল আছেন, এভাবে বেঁচে থাকতে পারলে তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই।

গুরুত্ব না দিলেও, লোকে কে কি বলে সবই তাঁর কানে আসে। ফার্স্ট লেডি নাকি মিশুক নন, তাঁকে ঠিক সামাজিক বলা চলে না। হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি নাকি উদাসীন।

মিথ্যে নয়, অভিযোগগুলো স্বীকার করেন পামেলা। চুটিয়ে গল্প করা বা আড্ডা জমানো তাঁর স্বভাব নয়। গল্প বা আড্ডা, সাধারণত দুটোরই লক্ষ্য পরনিন্দা। তাঁর দ্বারা ওটা হয় না। নিজের কাজকে তিনি ভালবাসেন, অবসর সময়ে ছবি আঁকা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান।

আর ঘণ্টাখানেক পর সরকারি অতিথিরা আসতে শুরু করবেন, হোয়াইট হাউসের স্টেট রুমগুলোয় ভিড় জমে উঠবে। তার আগে টেবিল সাজাতে হবে, নতুন করে ফুল আর মোমবাতি সাজাতে হবে। কিন্তু এ-সব দেখার জন্যে বেতনভুক কর্মচারী আছে, ফার্স্ট লেডির চেয়ে তারাই এসব কাজে বেশি অভিজ্ঞ। তাঁর মাথা না ঘামালেও চলে।

ডিনার টেবিলে কে কোথায় বসবে, অনেক সময় তা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। জটিলতা দূর করার জন্যে সোশিয়াল সেক্রেটারি আছে, তাঁর নাক না গলালেও চলে। ক্যালিগ্রাফার আছে, প্রয়োজন মত নতুন প্লেস-কার্ড আর প্রোগ্রাম তৈরি করবে সে। আরও আছে শেফরা, ফাইভ কোর্সের চমৎকার ডিনার তৈরি করবে তারা। কিচেনে গিয়ে কি লাভ, রান্না-বান্না সম্পর্কে কি ছাই বোঝেন তিনি?

মেন্যুতে আজ কি আছে তিনি জানেন না। জানার দরকারও নেই। অতিথি যারা আসবে তারা সবাই রিচার্ড কনওয়ের

বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত লোকজন, তারা কে কি খেতে পছন্দ করে, বা কে কোথায় বসবে, এসব প্রেসিডেন্টের জানা উচিত। হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের মাথাব্যথা, ফার্স্ট লেডির নয়। হ্যাঁ, ডিনারে থাকবেন তিনি, সঙ্গ দেবেন স্বামীকে–সময়টা তিনি উপভোগও করবেন। কিন্তু গুরুত্বহীন ঝামেলা পোহাবার মত সময় তাঁর হাতে নেই।

বিশেষ করে এই মুহূর্তে নেই।

এলিভেটরকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হলরূমে নামলেন তিনি, দ্রুত পায়ে মেয়ের ঘরের দিকে এগোলেন। এই একটা কাজে কখনও ভুল হয় না তাঁর। মেয়েকে তিনি প্রচুর সময় দেন।

ফার্স্ট লেডিকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল গভর্নেস মিসেস কেনটারকি। আন্তরিক হাসিতে উল্লাসিত হয়ে উঠল প্রৌঢ়ার চেহারা। টিউলিপকে ছবির বই দেখাচ্ছে সে। মাকে দেখে ছুটে এল টিউলিপ। নিচু হলেন পামেলা, জড়িয়ে ধরে মেয়ে তাঁকে চুমো খেলো। সিধে হয়ে মেয়ের দু'কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন মুখের দিকে। তাঁরই মত চেহারা পেয়েছে টিউলিপ, প্রায় গোল মুখ। তবে চোখ দুটো তাঁর চেয়েও সুন্দর, মায়াময়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার সেই ভয়টা ফিরে এল মনে। ঈশ্বর, ওর যদি কিছু ঘটে, স্রেফ মারা যাব আমি···।

'স্বামীর কাজ-কর্মে আপনার আগ্রহ আছে, মিসেস রিকার্ড?' জিজ্ঞেস করল সিনেটর।

ভদ্রতাসূচক ক্ষীণ হাসি দেখা গেল মার্গারেটের ঠোঁটে। স্টেট ডাইনিং রূমে বসে ডিনার খাচ্ছে ওরা। টেবিলের ওদিকে তাকাল সে। তার স্বামী, সি.আই.এ. চীফ, যুগোস্লাভ অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বসেছেন, আরেক পাশে বসেছে বিখ্যাত

একজন কলামিস্ট। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিল সে। 'তবে অফিসটা কোথায়, কত ন'রে ডায়াল করলে তাঁকে পাওয়া যাবে, ইত্যাদি সাধারণ কয়েকটা ব্যাপার ছাড়া তাঁর কাজ সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।' আজ আবার তার মনে হলো, জেফকে কিন্তু মোটেও সি.আই.এ-র চীফ বলে মনে হয় না। আচ্ছা, সি.আই.এ. চীফ কেমন দেখতে হলে মানায়? গম্ভীর আর রাশভারী? খুদে, ঝড়ো কাক, রহস্যময়? উঁহুঁ, জেফ এসবের ধারেকাছেও নয়।

জেফ রিকার্ডকে দশাসই বলা চলে, চেহারার মধ্যে সদা আড়ষ্ট একটা ভাব আছে, দেখতে অনেকটা মফস্বলের আনাড়ি উকিলের মত। চোখ দুটো উজ্জ্বল, তার দিয়ে তৈরি করা বাইফোকাল চশমার ফ্রেম নাকের ডগায় নেমে থাকে। সাদামাঠা মুখ, দ্রুত হাসতে পারে, মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত বিনয়ী।

আপনমনে হাসল মার্গারেট। দেখে মনে হলেও, জেফকে ঠিক নিরীহ বলা চলে না। প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের সময় তাকে এমন সব নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছে সে, মনে পড়লে এখনও তার গলা শুকিয়ে আসে। হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল চেহারা থেকে। ভাবল, জেফকে কি সত্যি আমি চিনি? এত বছর একসাথে আছি, তবু ওকে আমার প্রায়ই অপরিচিত মনে হয় কেন?

জবাব শুনে সশব্দে হেসে উঠল সিনেটর। 'চমৎকার উত্তর। পারফেক্ট পলিটিকাল ওয়াইফ–বিশ্বস্ত থাকার একমাত্র উপায় খুব বেশি না জানা।'

ডিয়ার গড!–মনে মনে আঁতকে উঠে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল মার্গারেট। নারী-স্বাধীনতার সমর্থনে সারা দেশে যারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারাও কেন এখনও ভাবে যে রাজনীতিক স্বামীকে বাদ দিলে স্ত্রীর আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না? এবং কেন, কনওয়েদের ব্যক্তিগত বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও,

হোয়াইট হাউস ডিনার পার্টিতে সব সময় আজেবাজে লোকের পাশে বসতে হবে তাকে?

সিনেটরের দৃষ্টি এড়িয়ে মার্গারেট বলল, 'আপনি সমর্থন করায় আমি সুখী হলাম।'

মার্গারেটের আরেক পাশে বসেছে আরও কম বয়েসী একজন গেস্ট, প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। লোকটা হাসতে পর্যন্ত জানে না! পামেলা যদি এসব ব্যাপারে একটু নজর রাখত!

'তবে একান্ত গোপনীয় কিছু কিছু কথা আপনাকে তিনি বলেন, তাই না?' সিনেটর নাছোড়বান্দা।

এবার তার দিকে সরাসরি তাকাল মার্গারেট। 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? জেফের কাজ সম্পর্কে আপনার এত আগ্রহ কেন বলুন তো?'

সিনেটর উত্তর দিল না। তার আরেকপাশে বসা এক লোক কি যেন জিজ্ঞেস করল, সেদিকে ফিরল সে। মার্গারেটের আরেক পাশে প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট গোগ্রাসে খাচ্ছে, যেন সারা বছর অভুক্ত ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে মনে বলল মার্গারেট। এই সুযোগে সুপটুকু শান্তিতে খেতে পারবে সে।

মাত্র আটটা বাজে। ভোজন পর্ব সবে শুরু হয়েছে। আরও চারটে কোর্স বাকি। ওয়াইন আসবে দু'বার। আনুষ্ঠানিক আরও অনেক কিছু বাকি আছে। প্রেসিডেন্ট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। সামরিক পোশাক পরে আসবে বেহালাবাদকদের একটা দল। হেড টেবিলের দিকে তাকাল মার্গারেট, বরাবরের মত অ্যাডাম্স্ ফায়ারপ্লেসের সামনে ফেলা হয়েছে সেটা। টেবিলের ওপর, দেয়ালে ঝুলছে লিংকনের পোর্ট্রেট। যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্টের সাথে গল্প করছেন ফার্স্ট লেডি। কে জানে, ভাবল মার্গারেট, পামেলা হয়তো সার্বো-ক্রোয়্যাটিয়ান ভাষাতেই কথা বলছে। আশ্চর্য সব ব্যাপারে অল্পুত দক্ষতা রয়েছে ওর। ভাল ছবি আঁকে, অনেকগুলো

ভাষা জানে, বাইবেলের ওপর একটা বই লিখেছে, প্রায় শেষ করে এনেছে ব্যায়ামের ওপর লেখা বইটা–আরও কত কি যে পারে পামেলা! সুন্দরীও বটে। গত দুই যুগে ওর মত আর কেউ আসেনি হোয়াইট হাউসে। আর রিচার্ড, যেমন লম্বা তেমনি স্বাস্থ্যবান, প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্ব।

স্নেহ আর দরদ উথলে উঠল মার্গারেটের মুখে। সৌন্দর্য, মর্যাদা, আর সুরুচির প্রতীক কনওয়ে পরিবার; অথচ সে অন্তত জানে, বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, অতটা সরল আর শান্তিময় জীবন নয় ওদের।

মার্গারেট দেখল, ঘরের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড কনওয়ে। একটা টেবিলে, একজনের ওপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। চেহারায় আশ্চর্য একটা ভাব ফুটে উঠল, খসে পড়ল মুখোশ, বেরিয়ে এল ভেতরের আসল মানুষটা। সম্ভবত এক সেকেণ্ড বা তারও কম সময়ের জন্যে। তারপরই হাত বাড়িয়ে ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিলেন তিনি, ফিরলেন, আগের মতই হাসছেন আবার।

ভুরু কুঁচকে চিন্তায় পড়ে গেল মার্গারেট। রিচার্ড কনওয়ের চেহারায় মুহূর্তের জন্যে কি দেখল সে? রাগ? সন্দেহ? ঘৃণা? নাকি আহত বিস্ময়?

তবে কার দিকে তাকিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট, মার্গারেট বোধহয় ধরতে পেরেছে। তার যদি ভুল না হয়, রিচার্ড কনওয়ে সরাসরি তাকিয়েছিলেন জেফ রিকার্ডের দিকে।

গম্ভীর আর ব্যস্তভাবে কাজ করছেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ কীথ বিউমণ্ট। অফিস ছুটির পর তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। প্রায় চমকে উঠে হাতঘড়ি

দেখলেন কীথ বিউমণ্ট। সর্বনাশ, আটটা বাজে! এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ফোনের রিসিভার তুললেন কানে। কে ফোন করেছে জানেন।

'কীথ,' স্ত্রীর অসন্তুষ্ট গলা শুনতে পেলেন তিনি, 'এই তোমার সময়জ্ঞান?'

'দুঃখিত, ডিয়ার,' যথাসম্ভব শান্তভাবে বললেন এস.এস. চীফ। 'আমাকে মাফ করো, আজ আর সিনেমা দেখা হলো না।' স্ত্রী কিছু বলার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর ডেস্কের কাগজ-পত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন উদ্যমে। প্রেসিডেণ্ট মেক্সিকো সফরে যাচ্ছেন। একাধিক সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো অনুমোদন করতে হবে তার।

মেক্সিকোর রাজনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ, কাজেই সিকিউরিটি প্ল্যানে কোন খুঁত থাকা চলবে না। গত বছর মেক্সিকোয় দু'জন মার্কিন ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করে সন্ত্রাসবাদীরা, প্রায় ওই একই সময়ে দূতাবাসের একজন অফিসার অন্ধের জন্যে গুলি খাননি। কীথ বিউমণ্টের প্রধান দায়িত্ব প্রেসিডেণ্টকে রক্ষা করা। সফরটা বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেণ্ট তাঁর কথা কানে তোলেনি। ওদের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক সেটাই চাইছে। অসম্ভব, এক দল গুণ্ডার কাছে নতি স্বীকার করা যায় না। তাছাড়া, প্রেসিডেণ্টের এই সফর নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

মুশকিল হলো, প্রেসিডেণ্ট ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। স্টেট ডিপার্টমেণ্টকে সমর্থন করেছেন তিনি। মেক্সিকোয় যাবেনই। কীথ বিউমণ্টকে এখন দেখতে হবে, তিনি যেন বহাল তবিয়তে ফিরে আসেন।

কাজ করতে করতে হঠাৎ অন্য একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল তাঁর। তাড়াহুড়ো করে একটা নোট লিখলেন তিনি। টিউলিপ

কনওয়েকে পাহারা দিচ্ছে ছ'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেণ্ট, তাদের সংখ্যা আরও দু'জন বাড়িয়ে আটজন করলেন। প্রেসিডেণ্ট হোয়াইট হাউস ত্যাগ করার পর টিউলিপের ওপর নজর রাখার জন্যে এই দু'জন অতিরিক্ত লোক দরকার হবে। এরপর আবার তিনি প্রেসিডেণ্টের সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

রাত আটটায় আরও এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে কাজে বসল রানা। বিকেলের দিকে এগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছে ডানিয়েল। কয়েকশো চিঠি, হয় হোয়াইট হাউস থেকে বাইরে গেছে, না হয় বাইরে থেকে হোয়াইট হাউসে এসেছে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে এক এক করে বাতিল করতে লাগল রানা, ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল স্তূপটা। তারপর হঠাৎ করে একটা চিঠিতে দৃষ্টি আটকে গেল। চিঠিটা আবার পড়ল ও, পড়ল সঙ্গে গাঁথা অন্যান্য চিঠিগুলো। এরপর কাঁচি দিয়ে কেটে রাখা খবরের কাগজের একটা খবর বের করল এনভেলাপ থেকে। খবরটা ওয়াশিংটন পোস্ট-এ বেরিয়েছিল। খবর আর চিঠির তারিখ মেলাল ও।

মেলে।

আরও অনেক কিছু দরকার হবে। ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার জন্যে ডোশিয়ে। চেহারার জন্যে ফটোগ্রাফ। হাবভাব আর আচরণ জানার জন্যে মুভি ফিল্ম। কণ্ঠস্বরের জন্যে টেপ-রেকর্ডিং। তবে এসব জিনিস সহজেই যোগাড় করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ হলো সেটআপ। সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক সময়।

আপন মনে হাসল রানা। প্রেসিডেণ্টের মেয়েকে কিভাবে কিডন্যাপ করতে হবে জেনে ফেলেছে ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের আরেক মাথায় হেঁটে এল, দাঁড়াল স্টেরিও সেটের সামনে। কয়েকটা অ্যালবাম থেকে বেছে নিল একটা। ওস্তাদ বেহালাবাদক

হফ ভ্যানডেরবার্গের ভায়োলিন কনসার্ট।

চেয়ারে বসে নিঃশব্দে সিগারেট ফুঁকছে রানা, কনসার্ট বেজে উঠল। চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলো ও। শুধু কিভাবে কিডন্যাপ করবে তাই নয়, টিউলিপকে কিভাবে আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাবে তাও জানা হয়ে গেছে ওর।

সাত

গাড়িটা সরকারি নম্বর লাগানো কালো একটা সিডান। সরকারি ন'রের সুবিধে হলো, অজায়গায় পার্ক করলেও ট্রাফিক পুলিস গাড়িটা সরিয়ে নিয়ে যাবে না, বা জরিমানা টিকেট লাগাবে না।

পোর্ট এলাকায় প্রচণ্ড ভিড়, এখানেও রানাকে কনুই আর হাঁটু চালাতে হলো। ফিফটি-সেকেণ্ড স্ট্রীটের পশ্চিম মাথায়, বিরানব্বই ন'র জেটিতে যেতে হবে ওকে। দূর থেকেই কুইন এলিজাবেথ টু কে দেখা গেল, রাতের আকাশকে আলোকিত করে নোঙর ফেলে আছে। প্রতিটি জেটির জন্যে আলাদা করে একটা বিল্ডিং, বিশাল হলরুমের ভেতরে ঢুকে নিউজস্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াল রানা। অদূরেই কাস্টমস চেক-পোস্ট। এখুনি জাহাজ থেকে নেমে এদিকে আসবে আরোহীরা, তার জন্যে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে অফিসাররা।

হালকা নীল স্যুট পরেছে রানা, নিচে গাঢ় নীল শার্ট। খাস আমেরিকান সাজার জন্যে ছদ্মবেশ আর মেকআপ নিতে হয়েছে ওকে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছু বদলে

ফেলেছে। ছোট করে ছাঁটা চুল, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নির্লিপ্ত, শান্ত ভাব চেহারায়, দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে অসীম ধৈর্য। দেখে যে কেউ ভাববে, সরকারি কর্মচারী।

আরোহীরা জাহাজ থেকে নামতে শুরু করল। ঠাণ্ডা চোখে প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলাল রানা। কয়েকশো ফটো আর ফিল্ম দেখে চেহারাটা মনে গেঁথে নিয়েছে ও, লোকটাকে একবার দেখলেই চিনতে পারবে। ফটো আর ফিল্ম তোলা হয়েছে লণ্ডনে, সাবজেক্টের অজান্তে ধোয়া অবস্থায় দু'দিন আগে রানার হাতে পৌঁছায় ওগুলো। অবসন মিথ্যে বলেনি, এমন কিছু নেই যা ওদের নাগালের বাইরে। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে যে-কোন জিনিস আনিয়ে দিতে পারে সি.আই.এ। আপন মনে হাসল রানা, পারে না শুধু প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করতে।

বারবার পড়ে লোকটার ডোশিয়ে মুখস্থ হয়ে গেছে রানার। স্যাম গ্রেসন। ম্যানচেস্টার, ইংল্যাণ্ডে জন্ম। বয়স আটাশ। ছ'ফিট লম্বা। কালো চুল। খয়েরি চোখ। পেশায় ফটোগ্রাফার।

রানার সাথে শারীরিক গড়ন পুরোপুরি মেলে না, তবে তাতে কিছু এসেও যায় না। মেলে না চেহারাও, কিন্তু মেলানো হবে। রানার এখন যা গায়ের রঙ, লালচে সাদা, সেটাও স্যাম গ্রেসনের সাথে মিলবে না। গ্রেসন ধবধবে সাদা। তারমানে গায়ের রঙ আবার একবার বদলাতে হবে রানাকে।

হাতে সুটকেস আর কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল স্যাম গ্রেসন। খবরের কাগজে মুখ লুকিয়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল রানা। পাঁচ মিনিট পর কাস্টমস থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রেসনও বেরিয়ে এল। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা, গ্রেসন ট্যাক্সি ডাকার আগেই তার পথরোধ করে দাঁড়াল। 'মি. গ্রেসন? মি. স্যাম গ্রেসন?'

মুখ তুলল গ্রেসন, অবাক হয়েছে। 'জ্বী, হ্যাঁ। কেন বলুন

তো?'

'জন রেইনার,' বলল রানা। 'ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস।' ভাঁজ খুলে একটা কার্ড দেখাল ও।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে রানার দিকে তাকাল গ্রেসন। 'কোথাও কিছু ভুল হয়েছে, স্যার?'

'না,' লোকটাকে আশ্বস্ত করে ক্ষীণ হাসল রানা। 'ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙের জন্যে ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়ার আগে আরও কিছু তথ্য চাই আমরা। সাথে গাড়ি আছে। যাবার পথে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন, আমি আপনাকে হোটেলে নামিয়ে দেব।'

'বেশ তো,' রানার সাথে হাঁটতে শুরু করে বলল গ্রেসন। মার্জিত যুবক, অক্সফোর্ডে শেখা উচ্চারণ ভঙ্গি। ডানিয়েলকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে রানা, গ্রেসনের গায়ে হাত তোলা চলবে না। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে আটকে রাখা হবে ওকে। 'আমার রুম রিজার্ভ করা হয়েছে হলিডে ইন-এ,' রানা গাড়ি ছেড়ে দিতে বলল গ্রেসন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি।'

নিঃশব্দে হাসল গ্রেসন। 'তা তো জানবেনই, আপনাদের কাজই তো এই।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রেসন। 'পোর্টে এসে পাকড়াও করলেন, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

'ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়া দারুণ ঝামেলার ব্যাপার,' বলল রানা। 'কাজ তো আর একটা নয়, সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় আমাদের। আজ রাতে যে-করেই হোক আপনার সাথে দেখা করা দরকার ছিল, তাই হোটেলে না গিয়ে সরাসরি পোর্টে চলে এলাম। দু'জনেরই সময় বাঁচল।'

'ধন্যবাদ,' বলল গ্রেসন। 'হলিডে ইন কি খুব দূরে?'

'এমনিতে দূরে নয়, কিন্তু সিক্সথ্ এভিনিউ-এ আগুন লাগায় ওদিকের সব রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। অনেকটা ঘুরে

যেতে হবে আমাদের।'

রানা জানে, নিউ ইয়র্কে এটাই গ্রেসনের প্রথম বেড়াতে আসা। তবে লণ্ডনে বসে ম্যানহাটনের ম্যাপ যোগাড় করা কঠিন কিছু নয়, পোর্ট থেকে হোটেলের দূরত্ব হয়তো জানা আছে ওর। সেজন্যেই একটা গন্ধ বানিয়ে বলতে হলো।

ফরটি-সেকেণ্ড স্ট্রীটে লাল আলো দেখে গাড়ি থামাল রানা, পকেট থেকে রূপালী সিগারেট কেস বের করে রানার সামনে খুলে ধরল গ্রেসন।

'না, ধন্যবাদ, ডিউটিতে রয়েছি,' বলল রানা। 'আমরা উনিশশো বিরাশি থেকে উনিশশো চুরাশি পর্যন্ত, এই দু'বছর সম্পর্কে জানতে চাই। দু'বছর আপনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন না।'

'না, অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম।'

লালের জায়গায় সামনে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। শহরের দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে ছুটল গাড়ি। 'কি করছিলেন?'

'বলতে পারেন বেড়াচ্ছিলাম। অবশ্য দু'একটা স্টুডিওতে কাজ করেছি। আর, হ্যাঁ, ছবি তুলেছি প্রচুর।'

'বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

গ্রেসন শুরু করল, কিন্তু রানা মন দিয়ে শুনছে না। সবই জানা আছে ওর। লোকটাকে কথা বলাবার পিছনে দুটো কারণ রয়েছে। সময়টা পার করা, আর গ্রেসনকে ব্যস্ত রাখা। গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগে লোকটার মনে যেন কোন সন্দেহ না জাগে।

পনেরো মিনিট পর লোয়ার ম্যানহাটনে পৌঁছুল গাড়ি। এদিকের রাস্তাগুলো প্রায় অন্ধকার, রাস্তার ন'রে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। বারো-র পর একশো এক, তেরো-র কোন খবর নেই। কত বার যে কত দিকে বাঁক নিল গাড়ি, দিশা পাওয়া অসম্ভব। ভাগ্যিস রানা আগেভাগে এসে সবটুকু রাস্তা দেখে রেখেছিল। তিনবার আসা-যাওয়া করেছে ও, ভুল হবার কোন

উপায় নেই। আরেকবার বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ক্যানাল স্ট্রীটে ঢুকল গাড়ি।

এতক্ষণে থামল গ্রেসন।

রানা বলল, 'গুড, এতেই চলবে। তবে, জানেনই তো, আপনার কথা যাচাই করতে হবে আমাদের। চিন্তার কিছু নেই, সব যদি সত্যি বলে থাকেন, ক্লিয়ার‍্যান্স পেতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

'তবু কি রকম সময় লাগবে?'

শ্রাগ করল রানা। 'এক কি দু'দিন। চূড়ান্ত ক্লিয়ার‍্যান্স আসবে ওয়াশিংটন থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রেসন।

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকান, অল্লুত সব দৃশ্য দেখতে পাবেন,' বলল রানা। 'এলাকাটাকে নিউ ইয়র্কের কলঙ্ক বলতে পারেন।'

'তাই!' আগ্রহী হয়ে উঠল গ্রেসন।

পরবর্তী ইণ্টারসেকশনে পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিল রানা। চওড়া এভিনিউ, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে অসংখ্য খুদে বার আর সস্তাদরের নোংরা হোটেল। প্রতিটি হোটেল আর বারের সামনে খাদ্য, পানীয়, ইত্যাদির নাম এবং মূল্য-তালিকাসহ একটা করে ধুলো ঢাকা বোর্ড রয়েছে, বোর্ডের পাশেই অন্ধকার গর্ত–ওই গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ফুটপাথ আছে, তবে আবর্জনার স্তূপে ঢাকা। সেই আবর্জনার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে অনেক লোক–সবাই ওরা নেশাগ্রস্ত মাতাল। ভিজে গায়ে নর্দমা থেকেও উঠতে দেখা গেল কয়েকজনকে। শুধু নিগ্রোরা নয়, ওদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গও রয়েছে।

আবার ডান দিকে বাঁক নিল রানা, চায়না টাউনকে পাশ কাটিয়ে এল। এরপর বাঁ দিকে মোড় ঘুরে ঢুকল লিটল

ইটালিতে। লাল আলো দেখে আরেকবার থামতে হলো।

পর্যটনের আনন্দ পেতে শুরু করেছে গ্রেসন। সারাক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। 'স্বপ্নেও ভাবিনি নিউ ইয়র্কে এরকম জায়গা থাকতে পারে। সময় করে ওখানে একদিন যাব আমি···জায়গাটার নাম কি?'

'বোয়েরী। হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক দেখতে হলে প্রচুর সময় দরকার,' মন্তব্য করল রানা।

আলো বদলাল।

ওদের সামনে অন্ধকার রাস্তা। বাঁ দিকে একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস। ডান দিকে সার সার দোকান, কিন্তু সবগুলো আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে। নাক বরাবর সামনে বহুতল আবাসিক ভবন, প্রতিটি জানালা হয় বন্ধ না হয় ভারী পর্দা ঝুলছে। রাস্তায় কোন আলো নেই, কারণ মদের পয়সায় টান পড়লে পাড়ার যুবকরা লাইটপোস্ট থেকে টিউব খুলে নিয়ে যায়।

গোটা এলাকার মাথায়, চল্লিশ পাড়া দূরে, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিঙের আলো আকাশ ছুঁয়ে আছে। পিছনে এবং সামনে রাস্তায় রাস্তায় যানবাহন আর মানুষজনের ভিড়, এখান থেকে অনেকটা দূরে।

এদিকটা শুধু অন্ধকার নয়, সম্পূর্ণ নির্জন।

আরও খানিক দূর এগোল গাড়ি। হঠাৎ সামনে চোখ ধাঁধানো হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠল। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল রানা।

'কি ব্যাপার?'

না, এখনও ভয় পায়নি গ্রেসন। হেডলাইটের পিছনে কি আছে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রানা জানে একটা ভ্যান আছে।

আলোটা রাস্তার মাঝখানে। গ্রেসন অপেক্ষা করছে, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আলোটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবে। 'কি একটা জায়গা!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'হোটেলটা নিশ্চয়ই এদিকে

কোথাও নয়?'

'না,' বলল রানা। 'না, হোটেল এখান থেকে বহু দূরে, মি. গ্রেসন।'

দ্রুত রানার দিকে ফিরল গ্রেসন। চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ নেই। বিস্মিত হয়েছে সে, একটু হকচকিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও অস্থির নয়। 'সামনে কি? পথ ভুল করেছেন?'

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল রানা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কি দেখল কে জানে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল গ্রেসন। 'মি. রেইনার···।' রানার হাত নড়ে উঠল, দেখে আঁতকে উঠল সে, পিছিয়ে সীটের কোণে চলে যাবার চেষ্টা করল, হাত দুটো আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে উঠে এল মুখের সামনে। 'না! কেন! প্লীজ! গ···' দরজার গায়ে হাতল হাতড়াতে শুরু করল সে, আতঙ্কিত চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

রাস্তা খালি। ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেলো গ্রেসন। এক ঘুসিতেই জ্ঞান হারাল সে।

রানা গাড়ি থেকে, আর ডানিয়েল ভ্যান থেকে নামল। ডানিয়েলের মুখে দু'দিনের না কামানো দাড়ি। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখের নিচের কাটা দাগটা আগের চেয়ে লালচে দেখাচ্ছে। ফুটপাথ থেকে কেনা ধূসর রঙের স্যুট। মাথাভর্তি ধূসর চুল বাতাসে উড়ছে। শার্টটা এক বছর ধোয়া হয়নি। মনে মনে বিরক্ত হলো রানা, এমন নোংরা ছদ্মবেশ নেয়ার কি মানে!

কেউ কারও সাথে কথা বলল না। দু'জন ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামাল গ্রেসনকে। অজ্ঞান দেহটাকে তোলা হলো ভ্যানের পিছনে। দরজা বন্ধ করল ডানিয়েল, তারপর আলো জ্বালল। দ্রুত কাপড় বদলাতে শুরু করল রানা।

কাপড় বদলে কালো একটা মেটাল বক্স খুলল রানা। ভেতর থেকে বেরুল আয়না, চিরুনি আর ব্রাশ, তোয়ালে, চুল রঙ করার

তরল কলপ, চামড়া রঙ করার মলম, চোয়াল ফোলাবার জন্যে একজোড়া সিলিকন প্যাড, পাসপোর্টের ফটো পেজ, ইত্যাদি।

নতুন ফটো লাগানো পাতাটা গ্রেসনের পাসপোর্টে ব্যবহার করা হবে। কেমিকেলের সাহায্যে নতুন পাতাটাকে পুরানো চেহারা দেয়া হয়েছে, পাসপোর্টের বাকি অংশের সাথে যাতে মিল খায়। গ্রেসনের পাসপোর্ট থেকে ফটো লাগানো পাতা সরিয়ে ফেলা হবে। নতুন ফটোয় যার চেহারা দেখা গেল তাকে ঠিক হুবহু স্যাম গ্রেসনের মত মনে হবে না, আবার রানা বলেও মনে হবে না।

ত্রিশ মিনিট পর ফটোর চেহারা পেল রানা। নিজের চোখে নিজেই খয়েরি ক্যাপ লাগিয়েছে। আবার কালো করে নিয়েছে চুল। মোটা সোল-এর জুতো পরে ইঞ্চি দুয়েক লম্বাও হয়েছে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। গ্রেসনের নয়, লণ্ডন থেকে আনানো শার্ট আর স্যুট পরে আছে। ওগুলো কেনা হয়েছে গ্রেসনের পরিচিত দোকান থেকে।

আয়নায় নিজেকে দেখে হাসল রানা। গ্রেসনের পরিচিত কারও সাথে দেখা না হয়ে গেলে, উতরে যাবে ও।

রানার গাড়ি হুস করে চলে গেল, সেদিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ডানিয়েল। তারপর ভ্যানের দরজা বন্ধ করে গ্রেসনের দিকে ফিরল সে। মেঝেতে পড়ে আছে গ্রেসন, এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

লোকটার কোন ক্ষতি করা চলবে না, বারবার সাবধান করে দিয়েছে রানা। নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে, যতদিন না বিপদ-মুক্ত সময় আসে। কিন্তু কত দিন, রানার কোন ধারণা আছে?

পরিচয় ফাঁস হবার ভয় রানার আছে বলে মনে হয় না। কার

নাম ফাঁস করতে পারে গ্রেসন, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট জন রেইনার? তাতে রানার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু রানার মত আত্মবিশ্বাস ডানিয়েলের নেই। ডানিয়েল রানার মত ছদ্মবেশ নিতেও পটু নয়।

রানার ডোশিয়ে-তে লেখা আছে, নিরীহ মানুষের সাথে নিষ্ঠুর হতে পারে না ও। যারা এসপিওনাজ জগতে আছে তারা এটাকে গুণ বলে স্বীকার করবে না। এমন অনেক পরিস্থিতি দেখা দেয়, পাইকারী হারে নিরীহ মানুষ খুন করা দরকার হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রত্যেক এজেন্টের জন্যে পরীক্ষার মত, পাস করতে পারলে বিপদ কেটে যাবে, ফেল মারলে শুধু নিজে নয়, সংশ্লিষ্ট সবাই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ডানিয়েল নিজের ক্ষতি করতে চায় না। চায় না সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের ক্ষতি হোক। না, নিরীহ লোকদের প্রতি তার কোন দরদ নেই। গ্রেসন একটা হুমকি, লোকটাকে খতম করার জন্যে এটুকু জানাই তার জন্যে যথেষ্ট।

দ্রুত কাজে হাত দিল সে। অজ্ঞান দেহটা টেনে এনে দেয়ালের গায়ে বসার ভঙ্গিতে খাড়া করল। লেদার ব্যাগ থেকে এক বোতল হুইস্কি বেরুল। গ্রেসনের মুখ বাঁ হাত দিয়ে খুলে রাখল। বোতলের মুখ ঢুকিয়ে দিল দুই সারি দাঁতের মাঝখানে। গ্রেসনের মুখ থেকে বাঁ হাত সরিয়ে নিল সে, বাঁকা করা আঙুলের গিঁট দিয়ে চাপ দিল গলায়। গলার পেশীতে ঘন ঘন চাপ পড়ায় ঢোক গেলার ভঙ্গি করল গ্রেসন। অন্ধ অন্ধ করে হুইস্কি নামছে পেটে।

এরপর গ্রেসনের স্যুট, শার্ট, টাই, জুতো, আর মোজা খুলে নিল ডানিয়েল। নিজে যেমন পরে আছে, স্যালভেশন আর্মির বাতিল করা জুতো-জামা, গ্রেসনকেও তাই পরাল। কাজটা শেষ করে হাতঘড়ি দেখল সে। যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে, এতক্ষণে

নিশ্চই রক্তের সাথে মিশে গেছে হুইস্কি।

ব্যাগটা থেকে একটা মেটাল বক্স বের করল ডানিয়েল, বক্স থেকে বেরুল প্লাস্টিক সিরিঞ্জ। ভেতরে বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। সুইয়ের মুখ অস্বাভাবিক সরু, চামড়ায় কোন দাগ থাকবে না। খুব সাবধানে গ্রেসনের বাহুতে সুইটা বেঁধাল সে, লক্ষ্য রাখল চাপ যাতে বেশি না পড়ে। প্লাঞ্জারে আঙুল রেখে মৃদু ঠেলা দিল, মুক্তি দিল বুদ্বুদটাকে। রক্তপ্রবাহের সাথে হার্টে চলে যাবে ওটা।

বাতাসের খুদে একটা বুলেট।

হলিডে ইনের পথে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে রানা, নিজের অজান্তে বোয়েরী-তে আবার ফিরে এল গ্রেসন। তাকে নিয়ে ভ্যান থেকে জড়াজড়ি করে, প্রায় গড়াতে গড়াতে নিচে নামল ডানিয়েল। চারপাশের বদ্ধ মাতালরা ওদের দেখেও দেখল না। নর্দমায় নেমে আবার উঠল ডানিয়েল, গ্রেসনকেও টেনে তুলল। তারপর অন্ধকার এক কোণে শুয়ে থাকল সে, পরস্পরের হাত-পা প্যাঁচ খেয়ে থাকল। দু'জনের চোখেই স্থির দৃষ্টি, যেন তাকিয়ে আছে কিন্তু দেখছে না কিছু।

খানিক পর উঠে হেঁটে চলে এল ডানিয়েল, পিছনে পড়ে থাকল গ্রেসন। এখানে কেউ গ্রেসনকে চেনে না। আরেকজন মাতাল। লাশকাটা ঘরে ঠাঁই পাবে। বেওয়ারিশ লাশ।

হলিডে ইনের ডেস্ক ক্লার্ককে পাসপোর্টটা দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। লোকটা পাসপোর্টের ওপর চোখ বুলাল শুধু, খুঁটিয়ে দেখল না।

ওপরতলায়, গ্রেসনের রির্জাভ করা কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো, গ্রেসনের ফাইলগুলো পড়বে।

টেপ আর মুভি ফিল্ম ডানিয়েলকে দিয়ে এসেছে রানা, সব নষ্ট

করে ফেলা হবে। সাথে করে নিয়ে এসেছে ডোশিয়ে, স্টিল ফটো, এফ.বি.আই. রিপোর্ট, আর সিক্রেট সার্ভিস ক্লিয়ার‍্যান্স। ক্লিয়ার‍্যান্সটা সই করা হয়েছে তিন দিন আগে।

আর রয়েছে চিঠিগুলো, পঁচাত্তর হাজার থেকে ঘেঁটে উদ্ধার করা। এই পঁচাত্তর হাজারের ভেতর থেকেই স্যাম গ্রেসনকে আবিষ্কার করেছে রানা।

ওগুলো আবার একবার পড়তে শুরু করল ও।

'ডিয়ার মিসেস কেনটারকি,
আমাদের কখনও দেখা হয়নি, তবে মায়ের মুখে শুনতে শুনতে আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে আমার আর বাকি নেই। ডরোথি গ্রেসনের বড় ছেলে আমি। আমার ছেলেবেলার অর্ধেকটাই কেটেছে আপনার আর মায়ের স্কুল-জীবনের গন্ধ শুনে। আমার আমেরিকায় বেড়াতে যাবার প্ল্যানটা যখন পাকা হয়ে গেল, মা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, আপনার সাথে অবশ্যই আমি যেন দেখা করি।

এপ্রিলের উনিশ তারিখে কুইন এলিজাবেথ টু আমাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি পোর্টে নোঙর ফেলবে। ওখানে আমি দু'রাতের জন্যে হোটেল রূম রিজার্ভ করেছি। তারপর ওয়াশিংটনে যাবার ইচ্ছে রাখি।

আমি জানি, প্রেসিডেন্টের মেয়ে টিউলিপ কনওয়ের গভর্নেস আপনি। আমার ভারি শখ, সম্ভব হলে হোয়াইট হাউসটা এক বার দেখি। কিন্তু সম্ভব যদি না হয়, শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে যেখানে বলবেন সেখানেই আপনার সাথে আমি দেখা করব।

কোন ব্যবস্থা করা যাক বা না যাক, দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখবেন। আপনার সাথে দেখা হওয়ার আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত থাকতে চাই না। মা আপনাকে ভালবাসা জানিয়েছেন।

আন্তরিকতার সাথে
স্যাম গ্রেসন।'

মিসেস কেনটারকি ক'দিন পরই জবাব দিলেন:

'ডিয়ার স্যাম,
ডরোথির ছেলে! চিনি, চিনি, তোমাকে আমি চিনি। ডরোথি এমন একটা চিঠি লেখেনি যাতে তোমার গন্ধ ছিল না। অবশ্যই আমার সাথে দেখা হবে তোমার। ডরোথির ছেলে আমেরিকায় আসবে, আর আমার সাথে দেখা হবে না, এ-ও কি সম্ভব!

তবে, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তুমি যখন আসবে আমি তখন ওয়াশিংটনে থাকব না। প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস কনওয়ে মেক্সিকো সফরে যাচ্ছেন। তুমি নিউ ইয়র্ক থাকার সময় ওদের যাত্রা শুরু হবে। ওরা রওনা হবার পর আমিও টিউলিপকে নিয়ে মিশিগানে চলে যাব, খুকুমণির মামার বাড়ি।

তবু আমি তোমাকে হোয়াইট হাউস দেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তবে একটু ভেবে দেখো দেখি তোমার পক্ষে কি মিশিগানে আসা সম্ভব হবে?

তোমার মাকে আমার অগাধ ভালবাসা জানাবে।

প্রীতি এবং শুভেচ্ছা সহ
লুসি কেনটারকি।'

'ডিয়ার মিসেস কেনটারকি,
হ্যাঁ, মিশিগানে যাব আমি। প্লেনে করে ক্যালিফোর্নিয়া যাবার প্ল্যান আছে, ধারণা করছি মিশিগান বোধহয় পথেই কোথাও পড়বে। কখন এবং কোথায় দেখা করব জানাবেন।

শ্রদ্ধা জানবেন।

স্যাম গ্রেসন।'

'ডিয়ার স্যাম,
তুমি আসতে পারবে শুনে কি যে খুশি হয়েছি! না, ক্যালিফোর্নিয়া আসার পথে মিশিগান পড়বে না, তবে পথ থেকে খুব একটা দূরেও নয়।

মিসেস কনওয়ের ভাই লেক মিশিগান, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে বাস করেন, ওখানে আমরা উঠব। ম্যাপে চোখ বুলালেই তুমি দেখতে পাবে, জায়গাটা পেটোস্কি-র একেবারে কাছাকাছি। মিসেস ল্যাঙ্গার, টিউলিপের মামী, দু'এক রাত তোমার বেড়াবার কথা শুনে আপত্তি তো করেনইনি, বরং খুশি হয়েছেন। সিক্রেট সার্ভিসকে তোমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি দিতে হয়েছে। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না। এ স্রেফ নিয়ম রক্ষা, অপরাধমূলক কোন কাজ যদি না করে থাকো, ক্লিয়ার‍্যান্স পেতে কোন সমস্যা হবে না।

কখন তুমি পৌঁছাবে, তাড়াতাড়ি জানাও আমাকে, স্যাম। তোমাকে দেখব এই আশায় অস্থির হয়ে আছি। প্রীতি এবং শুভেচ্ছা সহ।

লুসি কেনটারকি।'

গ্রেসনের আরও একটা জবাব আছে, কিন্তু রানা সেটা অন্যগুলোর সাথে সরিয়ে রাখল। আরও যা কিছু জানা দরকার, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে পৌঁছে জানা যাবে। তার আগে, সামনের দুটো দিন, নিউ ইয়র্কে থাকতে হবে ওকে—গ্রেসনের ছদ্মবেশ নিয়ে। এই দু'দিন গ্রেসন যা করত, তাই করতে হবে ওকে। পকেট থেকে একটা কোয়ার্টার বের করল ও, ছুঁড়ে দিল শূন্যে, হাতের উল্টো পিঠে পড়ল সেটা। স্ট্যাচু অভ লিবার্টি। নিউ ইয়র্ক হারবার থেকে শহর দেখা শুরু করবে রানা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্রেসনের ফাইল পুড়িয়ে ফেলল ও।

বাথরুমের সিঙ্কে আগুন নিভল, ট্যাপ খুলে দিতেই ছাইগুলো নেমে গেল নর্দমায়।

চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। মনটা যে শুধু খুঁত খুঁত করছে তাই নয়, কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে ও।

ভুলটা কি হতে পারে অনেক ভেবেও বের করতে পারল না রানা। এবার ব্যাগ থেকে নয়, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল। এনভেলাপের ওপর নানারকম সীল মারা। 'শুধু যার জন্যে প্রযোজ্য তার দেখার অধিকার আছে,' এই কথাটাও টাইপ করা রয়েছে। ভেতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল রানা। কাগজটার মাথায় হোয়াইট হাউসের প্রতীক চিহ্ন ছাপা রয়েছে, প্রেসিডেনশিয়াল রাইটিং প্যাড। আরেক মাথায় তারিখ লেখা—দিন, মাস, বছর সহ। প্যাডের মাঝখানে অন্ধ কয়েকটা লাইন টাইপ করা:

'এই কাজে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। জরুরী একটা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে টিউলিপকে অন্ধ ক'দিন নিজের কাছে রাখার অনুমতি মাসুদ রানাকে দেয়া হলো। এর জন্যে তাকে কোনভাবেই দায়ী বা অভিযুক্ত করা যাবে না।

প্রেসিডেন্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস।'

নিচে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম সই করেছেন প্রেসিডেন্ট। পরিচিত সই, নকল বলে মনে হলো না।

কাগজটা এনভেলাপে ভরে, এনভেলাপটা সযত্নে পকেটে রাখল রানা। কেউ যদি বেঈমানী করে, বা কোথাও যদি কোন ঘাপলা দেখা দেয়, প্রেসিডেন্টের এই চিঠি রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ওপর দিয়ে উদয় হলো মেরিন ওয়ান, ভোঁতা নাক আকাশের দিকে সামান্য উঁচু হয়ে আছে। হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনের দিকে এগোল সেটা।

কালো কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে। তবে আগেভাগেই চিন্তা করে হেলিকপ্টারের ল্যাণ্ডিং প্যাড এমন জায়গায় তৈরি করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগোবার সময় দর্শকরা তাঁকে দেখতে পাবে না। সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সেইই-স্ট্রীট পর্যন্ত। আবার হেলিকপ্টার টেক-অফ না করা পর্যন্ত রাস্তাগুলোয় কিছুই নড়াচড়া করতে পারবে না।

কোথায়, কোন্ রুট ধরে কোন্ দিকে যাবে হেলিকপ্টার, মিলিটারি পাইলট আর অন্ধ কয়েকজন সিকিউরিটি অফিসার ছাড়া কেউ তা জানে না।

মেরিন ওয়ানের গন্তব্য এনড্রু এয়ারফোর্স বেস। এয়ারফোর্স ওয়ান ওখানে প্রেসিডেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রেসিডেন্টের মেক্সিকো সফরের জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ক্রুরা।

হোয়াইট হাউসের ভেতরের মাঠে সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা মাথা নিচু করে ছুটোছুটি শুরু করল। সবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল মেরিন ওয়ান, রোটর ব্লেডের বাতাসে মাথায় এলোমেলো হলো চুল, গায়ে সেঁটে বসল শার্ট আর জ্যাকেট। ছুটে গিয়ে বিশাল যান্ত্রিক ফড়িং তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ল। বাতাসের বাধা না থাকায় আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করল লোকজন।

মিলিটারি অফিসাররা হ্যাচ খুলল, জায়গা মত বসিয়ে লক করল সিঁড়ি। কর্মচারীদের মুখ্য দু'জন সচিব ওয়েস্ট উইং দিককার ঝোপ ঘুরে বেরিয়ে এল, গম্ভীর রাশভারী চেহারা। হাতে ব্রীফকেস, কোন দিকে না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে এসে

মেরিন ওয়ানে উঠে পড়ল তারা।

এরপর দেখা গেল ফার্স্ট লেডিকে। ডিপ্লোম্যাটিক এনট্রান্স দিয়ে বেরুলেন তিনি, প্রবেশ পথের ওপর রঙিন শামিয়ানা টাঙানো। ক্যামেরাগুলোর দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন। হাত নাড়ালেন। তারপর মেয়ে টিউলিপের দিকে ফিরলেন। ভিড় এড়িয়ে, গভর্নেস মিসেস কেনটারকির সাথে দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব। মেয়ের সাথে দু'একটা কথা বললেন ফার্স্ট লেডি, গাল টিপে দিয়ে হাসলেন, দ্রুত একবার আলিঙ্গন করলেন, তারপর উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

সবশেষে এলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে দেখা মাত্র সাংবাদিকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। বৈদ্যুতিক আলোর মত তাঁর মুখে ঝিক্ করে উঠল হাসি। ঝুঁকে, মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন।

ক্লিক, ক্লিক···। অসংখ্য ক্যামেরা সচল হয়ে উঠল। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল তাঁর হাসি। গভর্নেসের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। 'ওর দিকে ভালভাবে নজর রাখবেন।'

মাথা ঝাঁকাল মিসেস কেনটারকি। মেয়ের সাথে কি মধুর সম্পর্ক প্রেসিডেন্টের, জানা আছে তার। বাপ এত্তোটুকুন মেয়ের সাথে এখনি এমন সব রসিকতা করেন, লজ্জায় তারই কান গরম হয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে। চুমোর জন্যে মেয়ের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে প্রায়ই তিনি বলেন, 'অভ্যেস করো, তা না হলে বয়-ফ্রেণ্ডদের চুমো খেতে গেলে অসুবিধে হবে।' সবাই জানে, মেয়েকে তিনি সবার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। মিসেস কেনটারকি প্রেসিডেন্টের হাত স্পর্শ করল, বলল, 'আপনি জানেন তা আমি সব সময় রাখি।'

'হ্যাঁ,' প্রেসিডেন্ট গলা পরিষ্কার করলেন। টিউলিপের দিকে

তাকালেন আবার। 'শান্ত হয়ে থেকো, মা,' বলে তিনি কোটের বাটন-হোল থেকে একটা গোলাপ কুঁড়ি খুলে মেয়ের মাথায় পরিয়ে দিলেন, তারপর অনেকটা যেন ঝোঁকের বশে, আলিঙ্গন করলেন মেয়েকে। বিড় বিড় করে বললেন, 'যীশু তোমাকে দেখবেন।'

মৃদু ঠেলা দিয়ে বাপকে একটু সরিয়ে দিল টিউলিপ। বাপের চোখে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে হাসল সে। তারপর জড়িয়ে ধরল বাপকে, চুমো খেলো গালে।

মেয়েকে পাল্টা আদর করে নামিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে হেলিকপ্টারে উঠে গেলেন তিনি।

ইন্সপেক্টর বব হাডসনের চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল। ডেস্কের ওপর দিয়ে ইউনিফর্ম পরা বিট পুলিসের দিকে রাগের সাথে তাকাল সে। 'বোয়েরী-তে আরেকটা মাতাল মারা গেছে, তো হয়েছেটা কি? এরকম তো প্রায়ই মারা যাচ্ছে।'

কেশে গলাটা পরিষ্কার করল বিট পুলিস। 'কিন্তু, স্যার, এই লোকটার ব্যাপার একটু অন্য রকম।'

'অন্য রকম মানে?' জিজ্ঞেস করল বব হাডসন, কুঁচকে উঠল ভুরু। ম্যানহাটন সাউথের হোমিসাইড ডিভিশনে নতুন এসেছে সে, চীফ হয়ে। বোয়েরী তার এলাকার মধ্যে পড়ে। ওখানকার মাতালদের কুকীর্তি সম্পর্কে শুনতে শুনতে এরই মধ্যে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তার।

'লোকটার পরনে একটা আণ্ডারঅয়্যার ছিল,' বলল বিট পুলিস। 'আণ্ডারঅয়্যারে দোকানের নাম লেখা স্টিকার রয়েছে। রিজেন্ট স্ট্রীটের একটা দোকান, স্যার।'

'রিজেন্ট স্ট্রীট? কোথায় সেটা? ব্রুকলিনে নাকি?' জানতে চাইল হাডসন।

'না, স্যার,' বলল পুলিস লোকটা। 'আমেরিকায় নয়, লণ্ডনে সেজন্যেই আমার মনে হলো···'

'লণ্ডন, মানে ইংল্যাণ্ড?' দাঁতের ফাঁকে চুরুট তুলতে গিয়েও থেমে গেল হাডসন।

মাথা ঝাঁকাল বিট পুলিস। 'গায়ে কাপড়চোপড় যা রয়েছে, সব নোংরা, পুরানো, দু'এক জায়গায় ছেঁড়া। কিন্তু আণ্ডারঅয়্যারটা একেবারে আনকোরা নতুন। কিভাবে সম্ভব? তাও আবার লণ্ডন থেকে কেনা!'

'তোমার সাথে কথা বলতে গিয়ে চুরুট নিভে গেল,' অভিযোগের সুরে বলল হাডসন। 'তবে, হ্যাঁ, তোমার সাবজেক্টটা ইণ্টারেস্টিং।' নতুন করে চুরুট ধরিয়ে একগাল সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ল সে। তারপর চিন্তিত দৃষ্টিতে পেট্রলম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'কাজেই, পোস্ট মর্টেমের নির্দেশ দিতে হয়। সব ব্যবস্থা করে ফেলো তাহলে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাথেও যোগাযোগ করো, বুঝলে। ফিঙ্গারপ্রিণ্ট চেক করো। হতভাগা আদম সন্তানটি কে ছিল আমি জানতে চাই।'

আট

ল্যাঙ্গার পরিবারের বাড়িটা খাঁটি ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য রীতির নিদর্শন হলেও, মূল অংশের সাথে অন্যান্য যে-সব অঙ্গ-কাঠামো যোগ হয়েছে সেগুলোকে কোন রীতির সাথে মেলানো কঠিন। কোথাও কোথাও বারান্দার পরিসর ছোট করে সেখানে তোলা হয়েছে উল্লট আকৃতির ঘর, খামখেয়ালী করে যেখানে-সেখানে তৈরি করা হয়েছে দরজা বা জানালা। গোটা বাড়িটা দাঁড়িয়ে

আছে পাহাড়ের ঢালে, চারদিক থেকে গাছপালা দিয়ে ঘেরা, বাড়ি থেকে লেক মিশিগান পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কাঁটাতারের ঘেরা আছে, সেটা নিচের বালুকাবেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তার ধারের অন্যান্য বাড়িগুলোও বড় আকারের, পরস্পরের কাছ থেকে দূরে, এবং সুরক্ষিত।

বাড়িটায় ঢোকার দুটো মাত্র পথ–সৈকত একটা, অপরটা সামনের গেট। গেট খুললেই বাইরে গাড়ি-পথ, পথটা বড় রাস্তার সাথে মিশেছে। প্রেসিডেন্টের মেয়ে এখানে আসার পর থেকে দুটো পথই পাহারা দিচ্ছে ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস। একটা পিঁপড়ে গলার উপায় নেই।

বুধবার সকাল, রানা স্যাম গ্রেসনের ভূমিকা নেয়ার পর দু'দিন পেরিয়ে গেছে। গাড়িটা সামনের গেটে থামাল ও, গেট-হাউস থেকে একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে হাতল ঘুরিয়ে জানালার কাঁচ নামাল।

লম্বা-চওড়া লোক, পরনে সাধারণ একটা বিজনেস স্যুট, বুকের সামনে কোটের ভাঁজে লাল আর সাদা রঙ করা একটা পিন। বগলের কাছটা ফুলে নেই, কিন্তু রানা জানে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে লোকটা।

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, কাজেই বেল্টের সাথে আটকানো আছে ট্র্যান্সমিটার। তার দুটো দেখা গেল। একটা জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে ওপর দিকে উঠেছে, কলারের কাছে বেরিয়ে একটা প্লাস্টিক প্লাগের সাথে জোড়া লেগেছে, প্লাগটা রয়েছে লোকটার কানের ভেতর, হিয়ারিং এইড-এর মত। অপরটা বেরিয়েছে বাঁ আস্তিন থেকে, হাত সমান উঁচুতে একটা মাইক্রোফোনের ভেতর ঢুকেছে সেটা।

মাইক্রোফোনের সুইচ সারাক্ষণ অন করা থাকে।

'গুডমর্নিং,' বলল রানা। লক্ষ করল, গেট-হাউসের ভেতর

আরও একজন লোক রয়েছে, কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে।

'আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল এজেন্ট।

'আমি স্যাম গ্রেসন।'

সামনের দিকে ঝুঁকল লোকটা, তীক্ষ্ণ চোখে ভেতরটা দ্রুত জরিপ করে নিল। 'ইয়েস, মি. গ্রেসন। আপনার আইডেনটিফিকেশন।' হাত পাতল সে।

গ্রেসনের পাসপোর্ট বের করল রানা, জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল।

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল এজেন্ট। মুহূর্তের জন্যে তাকে ইতস্তত করতে দেখল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে গেট-হাউসের দিকে লোকটা তাকাতে একটা হার্টবিট মিস করল ও। বিসমিল্লাতেই গলদ নাকি?

পাসপোর্ট থেকে চোখ সরিয়ে রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল এজেন্ট। 'এক মিনিট।' সিধে হলো সে, ঘুরল, ব্যস্ত পায়ে এগোল গেট-হাউসের দিকে।

মনে সংশয় দেখা দিলেও আত্মবিশ্বাস হারাল না রানা। যেন সন্দেহ হয়েছে বা কোন জালিয়াতি ধরা পড়েছে, এরকম ভান করা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের স্বভাব। আসলে হয়তো কিছুই না। আগন্তুকদের নার্ভ পরীক্ষা করার এটা একটা কৌশল। কান খাড়া করল রানা। কিন্তু গেট-হাউস থেকে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তবে দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছে ও। আলোচনা শেষ করে দু'জনেই রানার দিকে ফিরল, জানালা দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ওদের একজন হাত বাড়িয়ে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

সঙ্কটময় মুহূর্ত, শুরু না হতেই ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে।

আত্মবিশ্বাসে একটু চিড় ধরল রানার। সাথে কোন অস্ত্রও নেই। স্যাম গ্রেসনকে সার্চ করা যেতে পারে, না-ও হতে পারে। ঝুঁকিটা রানা নেয়নি।

কথা শেষ করে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল লোকটা। সঙ্গীকে কি যেন ইঙ্গিত করল। সঙ্গী, প্রথম লোকটা, গেট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল। সোজা রানার দিকে চোখ রেখে হেঁটে আসছে। তার হাবভাবে একটা ঢিলেঢালা ভাব রানার দৃষ্টি এড়াল না।

'সব ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে, মি. গ্রেসন,' পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল এজেন্ট। 'আপনার লাগেজগুলো দেখতে হবে।'

'অবশ্যই।'

গাড়ি থেকে নেমে পিছনে চলে এল রানা, তালায় চাবি ঢুকিয়ে বুট খুলল। রানা এক পাশে সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল এজেন্ট, তারপর ওর সুটকেসের ঢাকনি তুলে ভেতরটা নেড়েচেড়ে দেখল। অভ্যস্ত, দক্ষ হাত। প্রচুর সময় নিয়ে পরীক্ষা করল ক্যামেরা ব্যাগটা। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল ক্যামেরার কয়েকটা পার্টস। প্রতিটি অতিরিক্ত ফিল্ম খুঁটিয়ে দেখল। ইতোমধ্যে ব্যাক সীটের পিছনে কাঁচ-ঢাকা জানালার কার্নিসে বার কয়েক তাকানো হয়ে গেছে। বাদামী কাগজে মোড়া বড়সড় একটা প্যাকেট রয়েছে ওখানে।

ক্যামেরা ব্যাগ রেখে দিয়ে রানার দিকে তাকাল এজেন্ট। 'প্যাকেটে কি?'

এক গাল হাসল স্যাম গ্রেসন ওরফে মাসুদ রানা। 'প্রেসিডেন্টের মেয়ের জন্যে সামান্য একটা উপহার।'

প্যাকেটটা ধরে নিজের দিকে টানল এজেন্ট। 'ভাগ্যিস উপহার প্যাকেট করার জন্য আলাদা কোন পয়সা দিতে হয় না।'

রানা একটু আহত হবার ভান করে জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে কি আপনারা···?'

'হ্যাঁ, মি. গ্রেসন। প্যাকেটটা ছিঁড়ে দেখতে হবে আমাদের। নিয়ম, ভাই। সমস্ত উপহার আমাদের পরীক্ষা করতে হয়। ওটা আপনাকে রেখে যেতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'ঠিক আছে।'

প্যাকেটটা বুকের সাথে চেপে ধরে গেট-হাউসের দিকে হাঁটা দিল এজেন্ট। মাঝপথে থামল সে, ফিরল রানার দিকে। 'এবার আপনি ভেতরে ঢুকতে পারেন। গাড়ি-পথের পর বাঁ দিকে বাঁক নেবেন। গ্যারেজটা পিছন দিকে। ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

এক এক করে দুটো রিপোর্টই পড়ল ইন্সপেক্টর বব হাডসন। থমথমে হয়ে উঠল চেহারা।

প্রথম রিপোর্টটা এসেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে। হতভাগা আদম সন্তান যে ব্রিটিশ নাগরিক, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার, স্যাম গ্রেসন। ইয়ার্ডের ফাইলেই তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে—না, তার কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। এক সময় রয়্যাল এয়ারফোর্সে চাকরি করেছিল।

দ্বিতীয়টা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বলা চলে অস্বাভাবিক কোন কারণে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, আশ্চর্য, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকেও মারা যায়নি লোকটা। নার্ভাস সিস্টেম বা ব্রেনে কোন ক্ষতি হয়নি। রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ প্রচুর, নেশাগ্রস্ত হবার জন্যে যথেষ্ট, তবে লিভার তাতে রিয়্যাক্ট করেনি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নির্জলা একটা সত্যই বেরিয়ে আসে। আটাশ বছরের এক যুবক মারা গেছে, অথচ বিশেষজ্ঞ

ডাক্তাররা মৃত্যুর কারণ বলতে পারছেন না। কিভাবে এবং কেন, কোন প্রশ্নেরই উত্তর তাঁদের জানা নেই।

এটাও একটা উত্তর। একটা প্রমাণ।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর বব হাডসন। স্যাম গ্রেসন কে জানে সে। কিন্তু লোকটা সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানতে হবে তাকে। দেরাজ খুলে ভেতর থেকে একটা সরকারি ফর্ম বের করল সে। ফর্মটা পূরণ করে পাঠালেই ওয়াশিংটন, এফ.বি.আই.কমপিউটর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এসে যাবে।

দরজায় একজন হাউজকীপার অপেক্ষা করছিল, পথ দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে এসে রানাকে ওর কামরায় দিয়ে গেল। ছোটখাট মহিলা, আলাপী, হাসিটুকু লেগেই আছে মুখে। মি. গ্রেসন, আপনি এসেছেন শুনে মিসেস কেনটারকি যা খুশি হবেন না! কখন থেকে তাগাদা দিচ্ছেন আমাকে, দেখো না ছেলেটা এল কিনা! এই মুহূর্তে টিউলিপকে নিয়ে তিনি ব্যস্ত, ছাড়া পেলেই চলে আসবেন। বেশিরভাগ দিন একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘুমায় টিউলিপ। এই দু'ঘণ্টা, আর সাতটার পর–টিউলিপ যখন রাতের জন্যে বিছানায় ওঠে–ব্যস, নিজের সময় বলতে মিসেস কেনটারকির এটুকুই। বড় ভাল মানুষ, আমাদের মিসেস কেনটারকি। এত নরম।

ঠোঁটে মৃদু হাসি, কোমল দৃষ্টি চোখে, মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কিছু দরকার হলে রিঙ করবেন,' দরজার কাছে থেমে বলল হাউজকীপার। 'বসে বসে অপেক্ষা করতে যদি খারাপ লাগে, যেখানে খুশি বেড়িয়ে আসতে পারেন। সৈকতের দিকে যদি যান, ভাল লাগবে।'

'ধন্যবাদ, হয়তো একবার যেতেও পারি।'

একা হয়েই একটা সিগারেট ধরাল রানা, গ্রেসনের রূপালী

সিগারেট কেস টেবিলে রেখে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনেই লন, তারপর লেক। এক ধারে গাছপালার ফাঁকে গেস্ট হাউসের ছাদ দেখা গেল। জানালা দিয়ে যা কিছু দেখল, সব গেঁথে নিল মনে। ও জানে, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা গেস্ট হাউসটাকে অপারেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করছে। ওখান থেকেই তারা সরাসরি যোগাযোগ রাখে ওয়াশিংটন হেডকোয়ার্টারের সাথে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দুটো আগেই পেয়েছে রানা, হাউজকীপার জানিয়ে গেল, ওগুলো নির্ভুল। রাতে টিউলিপের শুতে যাবার সময়টা–সন্ধে সাতটা। আর, ইচ্ছে করলেই যখন খুশি বাড়ির সবখানে যেতে পারবে ও। এর আগে কাগজ-পত্রে দেখেছে ও, এখন ঘুরেফিরে নিজের চোখে দেখতে পাবে সব। চোখে দেখাটা জরুরী: বাড়ি থেকে লেক কত দূরে, কাঁটাতারের বেড়া কোথেকে শুরু হয়ে কোথায় থেমেছে, গার্ডরা কে কখন কোথায় থাকে।

মুখে সিগারেট নিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। সুটকেস খুলে ভেতর থেকে কাপড়চোপড় বের করল। ও বের না করলে, চাকরদের কেউ করতে পারে। সুটকেসটা কেউ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করুক চায় না ও।

তবে চাকরবাকররা রহস্যটা ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট তো পারেনি। সুটকেসের তলায় একটা ফলস বটম রয়েছে, আসলে ঠিক ফলস বটম নয়; ওটাকে স্রেফ দ্বিতীয় একটা স্তর বলা যেতে পারে–আক্ষরিক অর্থে, তৃতীয় স্তর। ওখানে আর কিছু নয়, শুধু বাদামী, বেশ বড়, চ্যাপ্টা একটা ব্যাগ আছে। ফলস বটমের সাথে এমনভাবে সাঁটা, ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক্স-রে করলেও ধরা পড়বে না। সহজে খোলার কোন উপায় নেই। গোপন কোন কৌশল, ব্যাপারটা তাও নয়; লুকানো কোন লিভারও নেই। সেলাই খোলার জন্যে ছুরি

লাগবে।

রানা যে কোন ঝুঁকি নিচ্ছে, ঠিক তা নয়। প্ল্যানটা সফল করার জন্যে একটা জিনিস একান্তই ওর দরকার, বাদামী পেপার ব্যাগে করে সেটাই নিয়ে এসেছে ও। না, কোন আগ্নেয়াস্ত্র নয়। অস্ত্র নিয়ে আসার মত বোকামি করছে না ও।

তবে জিনিসটাকে খেলনাও বলা চলে না।

ইন্সপেক্টর বব হাডসনের কাছে এফ.বি.আই. রিপোর্ট পৌঁছুল। তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত স্যাম গ্রেসনকে ওরা চিনত না। একুশ দিন আগে সিক্রেট সার্ভিস তার সম্পর্কে একটা সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দেয়। স্যাম গ্রেসন তদন্তে উতরে যায়, কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। তদন্তের রিপোর্ট সিক্রেট সার্ভিসকে পাঠিয়ে দিয়েছে এফ.বি.আই.।

সিক্রেট সার্ভিস? সিক্রেট সার্ভিস কেন স্যাম গ্রেসনকে নিয়ে মাথা ঘামাল?

একটা সিগারেট ধরাল বব হাডসন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে না সাপ বেরিয়ে পড়ে, ভাবল সে। রানার উপহার খুব কাজ দিল।

প্রথম দিনই সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা রানার ঘরে রেখে গেল ওটা। ডিনার সেরে ঘরে ফিরে দেখতে পেল রানা। পরদিন সকালে ও টিউলিপকে দিল ওটা।

কাগজের মোড়ক খুলল রানা, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রুদ্ধশ্বাসে টিউলিপ বলল, 'গ্রিজলি বেয়ার! ও মা, এ যে দেখছি আমার চেয়েও বড়!'

'প্রায়।'

'তুমি খুব ভাল,' মৌখিক হলেও, মূল্যবান একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেল রানা। ডান হাতের একটা আঙুল রানার মুখের সামনে তুলল সে। 'তোমার সাথে আমার চিরকালের ভাব হয়ে গেল।'

'ও, আচ্ছা, তাই নাকি?' টিউলিপের তর্জনীর সাথে নিজের তর্জনী এক করল রানা।

খেলনা ভাল্লুকটাকে আদর করতে করতে টিউলিপ বলল, 'তুমি একটা আনাড়ি।'

থতমত খেয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলো তো?'

'কিছু যদি না বোঝো, জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতে হয়, বুঝলে?'

'ও, আচ্ছা···!'

'থাক, আর ও-আচ্ছা করতে হবে না,' ভাল্লুকের গায়ে একটা হাত রাখল টিউলিপ, আরেক হাত পাকা গিন্নীর মত রাখল নিজের কোমরে। 'চিরকালের ভাব মানে বোঝো তুমি? মানে হলো, তোমার সাথে আমি কখনও আড়ি নিতে পারব না।'

'বাহ, খুব মজা হবে তাহলে··· ।'

খিল খিল করে হেসে উঠল টিউলিপ। 'কিছুই দেখছি জানো না! যখনই আমি বললাম তোমার সাথে আমার চিরকালের ভাব হয়ে গেল তখুনি তোমার উচিত ছিল গালটা নিচু করা, আমি যাতে পা√ দিতে পারি।'

'দুঃখিত, ভুল হয়ে গেছে,' বলে ঝুঁকল রানা, ওর গালে চুমো খেলো টিউলিপ।

টিউলিপের সাথে পরিচয় কালই হয়েছে, কিন্তু মিসেস কেনটারকির বন্ধু হিসেবে রানাকে সে মিষ্টি একটু হাসি উপহার দিয়েই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কাছে আসার বা ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টা করেনি। এই বয়সেই তাজ্জব হবার মত ব্যক্তিত্ব মেয়েটার। তার সবকিছুর মধ্যে মার্জিত একটা ভাব রয়েছে। মনে মনে রানা খুশি, টিউলিপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দরকার ছিল, সেটা পাওয়া গেছে।

ভাল্লুকটাকে নিয়ে মেতে উঠল টিউলিপ, সেদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল রানা। মেয়েটার আনন্দ ওর মধ্যেও

সংক্রমিত হচ্ছে। এত দামী একটা উপহার দেখে মিসেস কেনটারকি মৃদু আপত্তি তুলল। রানা বলল, 'দোকানের শো-কেসে দেখে ঝোঁকটা সামলাতে পারলাম না।'

মিসেস কেনটারকি গর্বের ভাবটুকু চেহারায় লুকিয়ে রাখতে পারল না। এই উপহার হোয়াইট হাউসে তার মর্যাদা আরেকটু বাড়াবে। ওখানে ফিরে গিয়ে সবাইকে সে বলতে পারবে, আমার বান্ধবীর ছেলে দিয়েছে। চাপা হাসি ফুটল তার মুখে। 'তবে জিনিসের মত জিনিস, দিলে এই রকম উপহারই দিতে হয়। আমি খুশিই হয়েছি, স্যাম।'

'ধন্যবাদ, মিসেস কেনটারকি। টিউলিপ, দেখো দেখাই, হাত-পা কেমন নড়াচড়া করে…,' সামনের দিকে ঝুঁকে কোথায় চাবি আছে দেখিয়ে দিল ও।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল টিউলিপ, নতুন করে মেতে উঠল খেলনাটাকে নিয়ে। হাত-পা শুধু সামনে আর পিছনে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু টিউলিপ সেগুলোকে এ-পাশে ও-পাশে ঘোরাতে চেষ্টা করল। শক্ত করে তৈরি করা হয়েছে, সহজে ভাঙবে না।

সিগারেট ধরিয়ে মিসেস কেনটারকির দিকে ফিরল রানা। 'দেশে, মানে, লণ্ডনে কখনও যাবেন বলে মনে হয়?' মৃদু হেসে জানতে চাইল ও।

'বোধহয় না,' বলে টিউলিপের দিকে তাকাল মিসেস কেনটারকি। 'বাচ্চাটার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি, বুঝতেই তো পারো। ও যেন আমারই সন্তান… ।'

মেঝে থেকে একটা চিৎকার উঠল।

কামরার অন্য মাথায় বসে রয়েছে একজন এজেন্ট, চমকে উঠে তাকাল সে। কোন বিপদ নয় বুঝতে পেরে আবার চেয়ারে হেলান দিল সে, মুখ গুঁজল পেপারব্যাক বইটায়।

টিউলিপের দিকে তাকাল রানা। প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হয়েছে মেয়েটার, চোখে টলমল করছে পানি। ভাল্লুকটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে কার্পেটে, একটা বাহু টিউলিপের হাতে। বাহুটার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে বেচারি। মুখ তুলে রানার দিকে একবার তাকাল, ভেজা দৃষ্টিতে অপরাধী ভাব।

'আশ্চর্য, হাতটা ছিঁড়ল কিভাবে!' চেয়ার ছেড়ে কার্পেটে উবু হয়ে বসল রানা। 'কই, দেখি তো!' টিউলিপের কাছ থেকে নিয়ে হাতটা পরীক্ষা করল ও। তারপর ভাল্লুকের গায়ে, যেখান থেকে হাতটা খসে গেছে, ভাল করে দেখল। ভেতরে সাদা তুলো দেখা গেল। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'কিসের সাথে আটকে ছিল কে জানে, গায়েব হয়ে গেছে।' অক্ষত দ্বিতীয় বাহুটা টেনে-টুনে পরীক্ষা করতে গেল ও, সেটাও খসে এল।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না টিউলিপ, ফুঁপিয়ে কেদে উঠল। তার মাথায় একটা হাত রাখল রানা। 'ছি-ছি, কাঁদে না। খুলে গেছে তো কি হয়েছে, আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়া যাবে… ।'

ছুটে গিয়ে মিসেস কেনটারকির কোলে মুখ গুঁজল টিউলিপ। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠল।

মিসেস কেনটারকির দিকে তাকাল রানা। নিচু গলায় বলল, 'আর জোড়া লাগানো গেছে! ওটা আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নতুন একটা আদায় না করে দোকানদারকে ছাড়ছি না!'

সেদিনই, আরও পরে, টিউলিপকে নিয়ে মিসেস কেনটারকি বাইরে বেড়াতে বেরুল। গার্ড হিসেবে কয়েকজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টও গেল ওদের সাথে। চাকরবাকর, কর্মচারী, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, সবার দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিসারে দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এল রানা। দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল

ও। না, ওর পিছু নিয়ে কেউ দোতলায় ওঠেনি। অন্তত করিডরে কারও পায়ের আওয়াজ নেই। ক্লজিট থেকে সুটকেসটা নামাল ও। ফলস বটমের চারদিকে ছুরি চালিয়ে বাদামী পেপার ব্যাগটা বের করল।

সন্তর্পণে দরজা খুলল রানা। সাথে সাথে ছুটে পালাল একটা বিড়াল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল দেয়ালঘড়িতে। টিক টিক করে উঠল একটা টিকটিকি। ধীর পায়ে করিডর ধরে এগোল রানা। হলরূমে কেউ নেই, তবে একদিকের করিডরে ফিসফিস করে যুবতী চাকরানীর সাথে কথা বলছে প্রৌঢ় এক কর্মচারী। রানাকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল দু'জনেই, তাড়াতাড়ি সরে গেল ওখান থেকে।

হলরূমে কিছুটা সময় কাটাল রানা। এক সময় বুঝল, ধারে কাছে কেউ নেই। মিসেস কেনটারকির কামরার দিকে এগোল ও। পাশাপাশি দুটো কামরা, একটা টিউলিপের। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। হলরূম থেকে মিসেস কেনটারকির ঘরে ঢুকল রানা। ঢুকেই আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজা।

মিসেস কেনটারকির ড্রেসিং টেবিল দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে। সাবধানে, কোন আওয়াজ না করে, দেয়ালের কাছ থেকে সেটাকে সরাল রানা। ড্রেসারের পিছনে হার্ডবোর্ড, টেপ দিয়ে তাতে পেপার ব্যাগটা আটকাল। টেবিলটা আবার জায়গা মত বসিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ল স্বস্তির।

মাঝখানের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলল রানা। দোরগোড়া থেকেই দেখতে পেল, খেলনা ভাল্লুকটা বিছানার গোড়ায়, কার্পেটের ওপর পড়ে রয়েছে। কাছের একটা টেবিলে রয়েছে বাহু জোড়া। আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা, দরজা বন্ধ করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

ওয়াশিংটন, সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার। ডেস্কে ফিরে এসে একটা চিরকুট পেল জেরি অ্যাডামস। চিরকুটে বলা হয়েছে, নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিসের ইন্সপেক্টর বব হাডসনকে টেলিফোন করতে হবে তার। খুবই নাকি জরুরী ব্যাপার।

রিসিভার তোলার জন্যে ফোনের দিকে হাত বাড়াল জেরি অ্যাডামস।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল হাতঘড়ির দিকে। সর্বনাশ! ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে মীটিং আছে না! সেটাও তো ভয়ানক জরুরী। উঁহুঁ, ইন্সপেক্টর বব হাডসনকে অপেক্ষা করতে হবে।

ল্যাঙ্গার পরিবারের সাথে নির্বিঘ্নে দুটো দিন কাটিয়ে দিল রানা। টিউলিপের মামার সাথে রাজনীতি, আর মামীর সাথে থিয়েটার নিয়ে আলাপ করল। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ছেলেকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো মিসেস কেনটারকি, তবে টিউলিপের দায়িত্ব ঘাড়ে থাকায় খাতিরের নামে রানার ওপর অত্যাচার চালাবার সুযোগ পেল না সে। যাকে রানা চেনেই না, সেই গ্রেসনের মা সম্পর্কে মজার মজার গন্ধ শুনল রানা মিসেস কেনটারকির মুখে, সবই ছেলেবেলার। চাকরবাকর আর কর্মচারীদের সাথেও খুব ভাব হয়ে গেল ওর। সিকিউরিটি গার্ডরা সবাই গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু রানার সদা প্রসন্ন উপস্থিতি তাদের চেহারাতেও কোমল একটা ভাব এনে দিল। সুযোগ সময় পেলেই তাদের সাথে গন্ধ করল রানা। আর টিউলিপের সাথে, তাকে নিয়ে প্রচুর ছবি তুলল।

এমন মেহমান হয় না, একবাক্যে স্বীকার করল সবাই। যেমন ভদ্র, তেমনি মার্জিত। দ্বিতীয় দিনের শেষ ভাগে ওকে বিদায় নিতে দেখে সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। মাত্র দু'দিনেই লোকটা যেন আপনজন হয়ে উঠেছিল।

টিউলিপের মামী আর মিসেস কেনটারকি সামনের ঘরে ওর

জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাত আটটা। ব্যাগগুলো নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা।

মিসেস কেনটারকি বাড়িয়ে দিল হাতটা। 'এত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যাচ্ছ, মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না,' বলল সে। 'কথা দাও, সময় করে আবার একবার বেড়াতে আসবে।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'আমেরিকায় এলে নিশ্চয়ই আসব।' মিসেস কেনটারকির পিঠে একটা হাত রাখল ও, ঝুঁকে চুমো খেলো গালে। 'মাকে আপনার গন্ধ শোনাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

গভর্নেসের চোখ ছলছল করে উঠল। 'স্যাম, তোমার মাকে আমার ভালবাসা জানাবে। বলবে, এরপর যেন তোমার সাথে সে-ও একবার এসে বেড়িয়ে যায়।'

'বলব। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবেন। পৌঁছেই চিঠি দেব।' ব্যাগ তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। হঠাৎ থমকাল ও, দ্রুত ঘুরল। চেহারা দেখে মনে হলো, কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'ধেত্তেরি, ভাল্লুকটার কথা একদম ভুলে গেছি!'

'তাই তো! কিন্তু···থাক না, স্যাম।'

'থাকবে মানে?' হেসে ফেলল রানা। 'এত শখ করে একটা উপহার দিলাম, তাও কিনা ভাঙা! কচি মেয়েটা কি রকম দুঃখ পাবে বলুন তো। না-না···।' ব্যাগগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে, কারও দিকে না তাকিয়ে, সিঁড়ির দিকে হন হন করে এগোল ও।

ঘরে ঢুকে রানা দেখল, টিউলিপ ঘুমাচ্ছে। দরজা বন্ধ করল, কিন্তু তালা লাগাল না। দরজার সামনেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে, শব্দটা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল। না, বাইরে থেকে আসছে না। টিউলিপের নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে এরই মধ্যে হাতে চলে এসেছে

একটা ঝর্না কলম। ক্যাপ খুলল, বেরিয়ে পড়ল সূঁচাল সিরিঞ্জের ডগা। ডগাটা টিউলিপের নগ্ন বাহুতে ঠেকাল ও।

প্লাঞ্জারে মৃদু চাপ দিল রানা। ধীরে ধীরে বাড়াল চাপ। পরিমিত মাত্রায় সোডিয়াম পেন্টোথাল পুশ করছে ও।

চামড়া ফুঁড়ে সূঁচের ডগা ভেতরে ঢুকতেই ঝাঁকি খেলো টিউলিপের হাত। তার হাতের সাথে রানার হাতও নড়ল, তবে চামড়ায় ঢুকে পড়া সূঁচের ডগা এক চুল কাঁপল না। মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলল টিউলিপ, তারপরই ক্লান্তিতে বুজে এল। এই মুহূর্তে চেতন আর অচেতন অবস্থার মাঝখানে রয়েছে মেয়েটা। ওষুধের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে, মারা যেতে পারে। মাত্রা বেশি হয়ে গেছে কিনা বুঝতে হলে মেডিকেল ইকুইপমেন্টের সাহায্য দরকার, কিন্তু সে-সব রানার হাতের কাছে নেই। নিজের বিচার বুদ্ধি আর আন্দাজের ওপর কাজ করছে ও। টিউলিপের বয়স, ওজন, ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে মাত্রা ঠিক করা হয়েছে, ভুল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ইঞ্জেকশন পুশ করার পর টিউলিপকে পরীক্ষা করল রানা। পালস রেট যা আশা করেছিল, তাই; বিচলিত হওয়ার মত কিছু নয়। হার্টবিটও নিয়মিত। বিছানার কাছ থেকে দ্রুত সরে এল রানা।

ড্রেসিং টেবিলের পিছনে হাত গলিয়ে বাদামী পেপার ব্যাগটা খুলে আনল ও। ব্যাগের ভেতর থেকে বেরুল একটা গ্রিজলি বেয়ার–বড়সড় আরও একটা খেলনা ভাল্লুক। এটারও বাহু নেই। তবে প্রথমটার সাথে দু'জায়গায় অমিল আছে। এটার ঘন পশমের ভেতর লুকানো চেইন আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা, টানলে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে খুলে যায় খেলনাটা। আর, ভেতরে কিছু নেই, চ্যাপ্টা। ভেতর দিকে বেলুনের মত কোমল গা। চাপ পড়লে বেলুনের মতই ফুলে উঠবে ভাল্লুক। প্লাস্টিক নাকের

ফুটোগুলো দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারবে।

চ্যাপ্টা ভাল্লুকটাকে মেঝেতে ফেলে সমান করল রানা। সিধে হয়ে আবার একবার পরীক্ষা করল টিউলিপকে। তারপর বুকে তুলে নিল তাকে। ওর পিছনে খুলে গেল ঘরের দরজা।

ধ্বক করে উঠল রানার বুক।

'স্যাম, আমি···।' মিসেস কেনটারকি বোবা বনে গেল। দোরগোড়ায় পাথর হয়ে গেছে সে। মুখ ঝুলে পড়ল, চোখ জোড়া বিস্ফারিত। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা। 'স্যাম!'

টিউলিপকে বুকে নিয়েই মিসেস কেনটারকির দিকে এগোল রানা, এখন আর নামাবার সময় নেই। এক পা পিছিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল মিসেস কেনটারকি। রানার চেহারায় উদ্বেগ। 'দেখুন তো, টিউলিপ কেমন হাঁপাচ্ছে–বোধহয় অসুস্থ,' শান্ত গলায় বলল ও।

'অ্যাঁ? কি? ও, আচ্ছা, তাই বলো···।' এগিয়ে এল গভর্নেস, টিউলিপকে নেয়ার জন্যে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। এরই মধ্যে ঘাম দেখা দিয়েছে তার চেহারায়। তবে আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত। হতভ' মনে হলো, কিন্তু আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছে।

প্রৌঢ়ার হাতে টিউলিপকে তুলে দিল রানা, কিন্তু মেয়েটার পিঠে একটা হাত থেকেই গেল। পিছিয়ে আসার ভান করে মিসেস কেনটারকির মুখের দিকে অপর হাতটা তুলল ও। চমকে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মিসেস কেনটারকি। তার কানের পিছনে পৌঁছে গেল রানার হাত, আঙুল দিয়ে নার্ভ সেন্টারে জোরে একটা খোঁচা মারল।

পিছুতে গিয়ে টিউলিপকে ছেড়ে দিল মিসেস কেনটারকি, অজ্ঞান দেহটাকে বাঁ হাতে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরল রানা। ডান হাতটা মিসেস কেনটারকির ঘাড়ের পিছনে চলে গেছে। দ্বিতীয় নার্ভ সেন্টারে আরও একটা খোঁচা খেলো গভর্নেস। খোলা

মুখ দিয়ে চিৎকার বেরুবার আগেই টলে উঠল সে, আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল হাঁ। তীব্র ব্যথায় নীল হয়ে উঠল তার চেহারা। খালি হাতটা দিয়ে তার পতন রোধ করল রানা। মিসেস কেনটারকি জ্ঞান হারিয়েছে। তার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। ঢিল পড়েছে মুখের পেশীতে।

গভর্নেসের বগলের তলায় ডান হাত রেখে, তার সাথে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, বসল। আলতোভাবে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ল মিসেস কেনটারকি।

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট জেরি অ্যাডামস আবার অফিসে ফিরল সাড়ে সাতটায়। ডেস্কে তখনও চিরকুটটা পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল সে, ডায়াল করল নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিসের দফতরে। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল ইন্সপেক্টর বব হাডসন। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল অ্যাডামস।

ইন্সপেক্টরের কথা শেষ হতে অ্যাডামস বলল, 'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। স্যাম গ্রেসন সম্পর্কে কেন আমরা সিকিউরিটি চেকের ব্যবস্থা করেছিলাম, আমি জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। ধন্যবাদ।'

এরপর রেকর্ড ডিভিশনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করল অ্যাডামস। কি তার দরকার জানিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পরই তথ্যগুলো পেয়ে গেল সে।

স্যাম গ্রেসন মিসেস কেনটারকির বন্ধু। তাকে ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের মেয়ে! ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে টিউলিপ রয়েছে!

দ্রুত হাতে আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল অ্যাডামস। কিন্তু লাইন এনগেজড। এক লাফে চেয়ার ছাড়ল সে, ঘর থেকে হলরুমে বেরিয়ে এল হন হন করে। প্রোটেকশন অফিসে ঝড়ের

বেগে ঢুকল সে। ডিউটি অফিসারকে গ্রাহ্য না করে সেকশন চীফের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' দ্রুত, প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডামস। স্যাম গ্রেসন সম্পর্কে সব কথা, যতটুকু জানে সে, হড়বড় করে ব্যাখ্যা করল।

'কিন্তু তা সম্ভব নয়,' সেকশন চীফ মাথা নেড়ে বলল। স্যাম গ্রেসন মারা যায়নি। কাল সকালে ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে বহাল তবিয়তেই পৌঁচেছে সে। কথাটা শেষ করেই আঁতকে উঠল সে, চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কি ঘটেছে উপলব্ধি করতে পেরে এক সেকেণ্ড পাথর হয়ে থাকল সে। তারপরই ডাইরেক্ট লাইনের দিকে হাত বাড়াল। মিশিগানকে বিপদ সঙ্কেত দিতে হবে।

টিউলিপের মামী তখনও সামনের ঘরে বসে আছে, গন্ধ করছে একজন সিকিউরিটি এজেন্টের সাথে। সিঁড়িতে রানা উদয় হতে, দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল।

রানার বগলের তলায় রয়েছে খেলনা ভাল্লুকটা। কোমরে ঠেকিয়ে রেখে, ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। যথেষ্ট ভারী, কিন্তু ধরে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হবে খুবই হালকা।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে থামল ও। 'মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি,' বলল ও। 'ওর সাথে মিসেস কেনটারকি আছেন।'

মিসেস ল্যাঙ্গার হাসল। 'সময় করে আরেকবার এসো, বাপু। দু'দিনই মেয়েটা তোমার ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। ক'টা দিন মন খারাপ করে থাকবে।'

'না এসে উপায় আছে,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'টিউলিপ আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে। চলি তাহলে, কেমন? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে···।' খালি হাত দিয়ে

ক্যামেরার ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝোলাল ও।

সিকিউরিটি এজেন্ট ওর দিকে এগিয়ে এল। 'দিন, সুটকেসটা আমি নিয়ে যাই।'

মৃদু হাসল রানা। 'ধন্যবাদ, আমিই পারব। আপনি বরং দরজাটা খুলুন।' সুটকেস তুলল ও। 'ধন্যবাদ, মিসেস ল্যাঙ্গার। আপনাদের আতিথেয়তা আমি কখনও ভুলব না।'

'তোমাকে পেয়ে আমরা সবাই খুব আনন্দে ছিলাম।'

'গুডবাই।'

রানার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে। পিছনের বনেট তুলে সুটকেসটা রাখল ও। ব্যাক সীটে ঠাঁই পেল খেলনা ভাল্লুক। হাত তুলে নাড়ল ও, শেষবার বিদায় নিল সবার কাছ থেকে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়িতে।

বিশ্বাস হচ্ছে না এত সহজে নিয়ে যেতে পারছে টিউলিপকে।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোল গাড়ি।

ল্যাঙ্গার কটেজের পিছনে গেস্ট হাউস, ঝন ঝন শব্দে সেখানে একটা ফোন বেজে উঠল। ওয়াশিংটনের সাথে সরাসরি লাইন ওটা। ডিউটি-রত এজেন্ট রিসিভার তুলে এক মুহূর্ত অপরপ্রান্তের কথা শুনল। চোখের পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা, রিসিভার ছেড়ে দিয়ে এক ছুটে কামরা থেকেই বেরিয়ে এল সে। কেউ দেখলে ভাববে, লোকটার গায়ে বোধহয় আগুন ধরে গেছে।

'গ্রেসন কোথায়?' সামনের ঘরে ঢুকেই চিৎকার করল সে।

মিসেস ল্যাঙ্গার মুখ তুলে তাকাল। থতমত খেয়ে গেছে। 'কেন, এইমাত্র তো চলে গেল। কিছু হয়েছে নাকি?'

তাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল এজেন্ট, একসাথে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে এল দোতলায়। টিউলিপের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল

সে। না জানি ভেতরে ঢুকে কি দেখবে!

দরজা ঠেলে ভেতরে তাকাল সে। পরম স্বস্তি বোধ করল সাথে সাথে। বিছানায় শুয়ে রয়েছে টিউলিপ। কিন্তু তারপরই নতুন করে ভয় পেল সে।

এক ছুটে ঘরে ঢুকল এজেন্ট। চাদরের নিচে শুয়ে রয়েছে টিউলিপ। কিন্তু চাদর নড়ছে না কেন? মেয়েটার নিঃশ্বাস···

ছোঁ দিয়ে চাদরটা তুলে নিল সে। হিম শীতল একটা অনুভূতি হলো তার। এত ভয় জীবনে কখনও পায়নি।

চাদরের তলায় টিউলিপ নয়, খেলনা ভাল্লুকটা রয়েছে। ঘরে কোথাও টিউলিপকে দেখা গেল না।

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সংবিৎ ফিরল তার। মিসেস ল্যাঙ্গারকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'টিউলিপ··· ।' বিছানার দিকে দৃষ্টি পড়তে মাথায় যেন বাজ পড়ল। চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল সে। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এজেন্ট লোকটা।

নয়

মাত্র দশ মিনিট এগিয়ে থাকার সুযোগ পেল রানা।

ল্যাঙ্গার ভিলা থেকে একটাই রাস্তা চলে গেছে ইণ্ডিয়ান স্প্রিং শহরের দিকে। দশ মিনিট আগে এই রাস্তা দিয়েই গেছে রানা। একই রাস্তা দিয়ে এই মুহূর্তে একই দিকে ছুটছে সিক্রেট সার্ভিসের শক্তিশালী গাড়ি।

গাড়ির সামনে দু'জন এজেন্ট–একজন ড্রাইভ করছে, অপরজন রাস্তার ওপর চোখ রেখে কথা বলছে রেডিওতে; পিছনে

বসেছে আরও দু'জন, রাস্তার দু'দিকে ঘন বনভূমির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে তারা।

ছ'মাইল সামনে রয়েছে ইণ্ডিয়ান স্প্রিং শহর, এবং প্রথম চৌরাস্তা। চিন্তার কিছু নেই, রেডিওতে খবর পেয়ে আগেই রাস্তাগুলোর ওপর ব্যারিকেড তৈরি করেছে পুলিস। রোড-ব্লক বলে কোন যানবাহনই কোন দিকে যেতে পারবে না। ভুয়া স্যাম গ্রেসনের পালাবার কোন উপায় নেই।

হঠাৎ পিছনের একজন এজেন্ট চেঁচিয়ে উঠে আকাশের দিকে একটা হাত তুলল। ছোট একটা প্লেন, এই মাত্র গাছপালার ভেতর থেকে আকাশে উঠেছে। একটা পাইপার চেরোকি, কালো আকাশের গায়ে প্রায় মিশে আছে গাঢ় রঙের প্লেনটা।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার, প্রচণ্ড ঝাঁকি সামলে উঠেই লাফ দিয়ে বাকি তিনজন এজেন্ট রাস্তায় নামল। জঙ্গলে ঢুকে একটু পরই বেরিয়ে এল ওরা। ভুয়া স্যাম গ্রেসনের গাড়িটা রয়েছে ওখানে, বনভূমির মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গায়। ওখান থেকেই টেক-অফ করেছে প্লেন। ড্রাইভারের পাশের এজেন্টরা রেডিওতে কথা বলতে শুরু করল। সমস্ত এজেন্টকে চেরোকির ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিল সে। ড্রাইভার বসে নেই, মস্ত একটা ইউ টার্ন নিয়ে ভিলার দিকে ফিরে চলল সে।

গাছপালার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে রাস্তায় তাকাল রানা। সিক্রেট সার্ভিসের গাড়িটাকে বাঁক নিতে দেখল ও। ভিলার দিকে ওরা ফিরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।

জানে, আরও গাড়ি আর লোকজন নিয়ে আবার ফিরে আসবে ওরা। বিভিন্ন সংস্থার ফেডারেল এজেন্টরা দলে দলে এসে ঘিরে ফেলবে গোটা বনভূমি, তন্ন তন্ন করে এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজবে। ডেট্রয়েট, শিকাগো, ওয়াশিংটন থেকে আসবে ফেডারেল

পুলিস আর এফ.বি.আই-এর অপারেটররা। কিন্তু এখুনি নয়, দেরি আছে, অন্তত ঘণ্টা দু'ঘণ্টার আগে নয়।

এখন শুধু পিছু লেগে থাকবে ল্যাঙ্গার ভিলার এজেন্টরা। তবে, শুরুতেই ওদেরকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। ওরা জানে টিউলিপকে নিয়ে ভুয়া স্যাম গ্রেসন প্লেনে করে পালিয়েছে। ভুলটা এক সময় ভাঙবে ওদের, ততক্ষণে ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে।

লেক মিশিগানের ওপর দিয়ে পশ্চিমে অদৃশ্য হয়ে গেছে চেরোকি। এবার নিজের পালাবার ব্যবস্থা করতে হয়। জঙ্গলের ভেতর ওর জন্যে একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার রয়েছে। রেখে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কে রেখে গেছে রানা জানে না। হয়তো পাইলটকে দিয়েই কাজটা করিয়েছে ডানিয়েল। সেট অন করে ছোট্ট মেসেজ পাঠাল রানা, 'গোলাপ কুঁড়ি বলছি। ফোন কলটা এখুনি করো।'

দূরে কোথাও ডানিয়েলের একজন লোক মেসেজটা রিসিভ করল। সাথে সাথে সাড়া দিল সে, 'রজার, গোলাপ কুঁড়ি।'

এক ঝটকায় ট্র্যান্সমিটার অফ করল রানা। সেট বেশিক্ষণ অন করা থাকলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যেতে পারে। রেডিও যোগাযোগ খুব সহজেই ট্রেস করা যায়।

ওখানে দাঁড়িয়ে কালো রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটা ধরল ও। ল্যাঙ্গার ভিলার দিকে আধ মাইল এগিয়ে থামল। সামনে একটা গাড়ি রয়েছে ওর জন্যে। ভেতরে নতুন পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি। যেখানে যা থাকার কথা সবই আছে–সত্যি, কাজের লোক ডানিয়েল।

চাকরবাকর আর কর্মচারীরা মিসেস কেনটারকিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে

আছে। তার মাথায় পানি ঢালছে হাউজকীপার। গভর্নেসকে তার বেডরুমেই পাওয়া যায়, অজ্ঞান অবস্থায়। চাপা স্বরে কথা বলছিল সবাই, হঠাৎ থেমে গেল গুঞ্জনটা। মিসেস কেনটারকির জ্ঞান ফিরছে।

ফাদার কলার্ড কথা দিয়েছেন, এখুনি রওনা হবেন তিনি।

অফিস থেকে বেরিয়ে কালো ডজ ডার্ট-এ চড়লেন ভদ্রলোক। উত্তর দিকে বাঁক নিল গাড়ি, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙের দিকে ছুটল।

যাজকদের যার যার এলাকা ভাগ করা থাকে। ল্যাঙ্গার পরিবার ফাদার কলার্ডের এলাকায় নিয়মিত বাস করে না। গ্রীষ্মকালে ভিলায় বেড়াতে আসে তারা, তখন প্রার্থনাসভায় হাজিরা দেয়। তবে বছরের শেষে চার্চের নামে ঠিকই পৌঁছে যায় চেকটা।

আজ হঠাৎ করে তাঁকে ওদের দরকার পড়েছে। ল্যাঙ্গার ভিলায় বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটে গেছে। কেউ হয়তো অসুস্থ। অথবা মারা যাচ্ছে। ফোনে লোকটা পরিষ্কার করে কিছু বলেনি।

নির্জন, অন্ধকার রাস্তা। হেডলাইটের আলোয় ফাদার কলার্ড কিছুই নড়তে দেখলেন না। সামনে একটা বাঁক, গাড়ি ঘোরাবার সাথে সাথে ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

রোডব্লক। রাস্তার দু'ধারে একজোড়া স্টেট পুলিস কার, দু'জোড়া হেডলাইটের আলোয় তিনজন ইউনিফর্ম পরা স্টেট পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই সশস্ত্র।

গাড়ি থামিয়ে জানালার কাঁচ নামালেন ফাদার। একজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এল। স্টেট ট্রুপার, এলাকার কেউ নয়, ফাদার তাকে চিনতে পারলেন না।

'কোথায় যাচ্ছেন, ফাদার?'

'কেন, ল্যাঙ্গার ভিলায়। ওরা আমাকে ফোনে ডেকে পাঠাল।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাকি দু'জনের দিকে তাকাল লোকটা। ওদের দৃষ্টি বিনিময়ের অর্থ ফাদারের বোধগম্য হলো না। জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কি? কিছু ঘটেছে?'

লোকটা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'সাথে পরিচয়-পত্র আছে?'

'হ্যাঁ, কেন থাকবে না।' পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, আর ক্লেরিকাল আইডেনটিফিকেশন কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলেন ফাদার।

কাগজগুলো নিয়ে একটা গাড়ির কাছে ফিরে গেল লোকটা। ড্যাশবোর্ড থেকে রেডিও মাউথপীস তুলে কথা বলল সে। তার কথা কিছুই শুনতে পেলেন না ফাদার। তবে লক্ষ করলেন, বাকি লোক দু'জন তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়ি নিয়ে এগোবার পথ বন্ধ।

এক মিনিট পর গাড়ির কাছ থেকে ফিরে এল লোকটা। 'সব ঠিক আছে, ফাদার,' বলল সে। 'আপনি যেতে পারেন।' ফাদারের হাতে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল সে। তারপর নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল সঙ্গীদের।

'ধন্যবাদ,' ফাদার বললেন। 'জিজ্ঞেস করতে পারি, এ-সব কি নিয়ে?'

'দুঃখিত, ফাদার, আমাদের মুখ খোলা বারণ। তবে ওখানে পৌঁছে আপনি বোধহয় সবই জানতে পারবেন।'

বিশ মিনিট পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে গাড়ি ছুটাল রানা। কোথাও থামতে হলো না, ইণ্ডিয়ান স্প্রিং পেরিয়ে এল নিরাপদে। গাড়িটা এলাকার সবার পরিচিত–কালো একটা ডজ ডার্ট। ফাদার কলার্ড আর রানা, দু'জনের লাইসেন্স প্লেটও হুবহু এক। গাড়ি দুটোর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, রানার ডজে

একটা ট্রাঙ্ক রয়েছে, ভেন্টিলেটর সহ। ভেতরে একটা খেলনা।

আরও দশ মাইল পেরিয়ে শহরের শেষ মাথায় পৌঁছুল রানা। ধীরে ধীরে স্পীড কমিয়ে দাঁড় করাল গাড়ি। সামনে রোড ব্লক। স্টেট পুলিস কারের দু'জোড়া হেডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন ট্রুপার।

ট্রুপারদের একজন এগিয়ে এল। 'ও, আপনি, ফাদার,' বলল সে, 'ভিলার কি অবস্থা বলুন।'

'কি আর অবস্থা,' বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'সবাই খুব আতঙ্কিত। কোন খবর পাওয়া গেল?'

'এখনও কিছু কানে আসেনি। ফেডারেল পুলিস মুখ খুলতে চায় না। শুধু জানি, এখনও আমাদের ফিরে যেতে বলেনি।'

রানা গম্ভীর। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'যাই, বাড়ি ফিরে অপেক্ষা করি...'

'ঠিক আছে, ফাদার, যান। আবার হয়তো দেখা হবে।'

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'অতক্ষণ আপনারা এখানে থাকবেন না বলেই আশা করি।'

জানালার কাঁচ তুলে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। জোড়া পুলিস কারের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এল। সামনে একটা বাঁক, সেটা পেরিয়েই পিছন দিকে তাকাল একবার। নির্জন, অন্ধকার রাস্তা। গ্রে উইগ আর ক্লেরিকাল কলার খুলে ফেলল ও। তারপর ফুল স্পীডে ছোটাল গাড়ি। ব্যাপারটা ফাঁস হবার আগেই পালাতে হবে। ল্যাঙ্গার ভিলায় কখন ফাদারের ডাক পড়েছিল, ও জানে; জঙ্গলে অপেক্ষা করার সময় ফাদারের গাড়িটাকে যেতেও দেখেছে। কিন্তু ফাদারের ফেরত আসা ঠেকানো ওর ক্ষমতার বাইরে। আসল ফাদার হয়তো খুব একটা পিছনে নন।

পাইপার চেরোকির পাইলট মহা ফুর্তিতে গুনগুন করে গান

গাইছে। সরাসরি পশ্চিম দিকে কোর্স স্থির করেছে সে, এই মুহূর্তে উইসকনসিন বা কাছে-পিঠের কোন এলাকার ওপর রয়েছে। পরিষ্কার আকাশ, মৃদু বাতাস, হালকা প্লেন–তার মত অভিজ্ঞ পাইলটের জন্যে কাজটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কি। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, তা না হলে সামান্য এই কাজের জন্যে হাজার ডলার গুঁজে দেয় হাতে?

তবে, লোকটার শর্তটা কিন্তু অদ্ভুত ছিল। কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

করেওনি সে। এক রাতে হাজার ডলার পেলে বেয়াড়া প্রশ্ন করার কি দরকার তার?

তার সামনে পাহাড়ী এলাকা দেখা গেল। সাবলীল ভঙ্গিতে প্লেনের নাক উঁচু করল সে, ছ'হাজার ফিটে উঠে এসে সমান হলো চেরোকি।

কানাডিয়ান সীমান্ত বরাবর এন.ও.আর.এ.ডি. পেট্রল ডিউটিতে ছিল এস.এ.সি. বম্বার, দশ হাজার ফিট উঁচুতে উড়ছিল। কনট্রোল টাওয়ার থেকে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কোর্স বদল করল পাইলট।

রাডারে পাইপার চেরোকিকে দেখা গেল, পাঁচ মাইল সামনে, পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, চার হাজার ফিট নিচে।

ইউ.এস. এয়ারফোর্স পাইলট ঘাড় ফিরিয়ে কেবিনের আরেক প্রান্তে বসা লোকটার দিকে তাকাল। 'চেরোকির পাইলট কিন্তু আমাদের খসাবার চেষ্টা করছে না।'

কো-পাইলট, একজন ক্যানাডিয়ান, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'না। একই কোর্সে, একই স্পীডে যাচ্ছে।' হঠাৎ, সীটের কিনারায় সরে এল সে, সামনের দিকে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাডার স্ক্রীনে। 'আরে! নেই!'

'নেই?'

'একেবারে গায়েব! ব্যাপার কি! চোখের পলকে কোন প্লেন ল্যাণ্ড করতে পারে না!'

'তাই তো! তাহলে?' আমেরিকান পাইলটের ভুরু কুঁচকে উঠল। 'তবে কি...!'

ল্যাঙ্গার ভিলার গেস্ট হাউস। প্রথমবার বেজে উঠতেই ডিউটি রত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল।

'খারাপ খবর,' অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো তাকে। 'তোমরা যে পাইপার চেরোকির ওপর নজর রাখতে বলেছিলে, উত্তর উইসকনসিনে বিধ্বস্ত হয়েছে সেটা।'

রিসিভারটা শক্ত করে চেপে ধরল এজেন্ট। প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে এল, 'কেউ বেঁচেছে?'

'বেঁচেছে মানে?' পাল্টা প্রশ্ন এল অপরপ্রান্ত থেকে। 'পাইলট ছাড়া কেউ থাকলে তো বাঁচবে!'

সাইনবোর্ডটা খুব জমকালো। কালকাসকা এভিয়েশন ইনকরপোরেটেড: ফ্লাইট ইন্সট্রাকশন, জি.ই.টি. সিমিউলেটর, এ.টি.পি. স্পেশালিস্ট, হ্যাঙ্গারস, টাইডাউনস, এয়ারক্রাফট ফর রেন্ট অর লীজ। কিন্তু বিল্ডিংটা অস্থায়ী ব্যারাকের মত, আর কাউন্টারের পিছনে বসে ছেলেটার এখনও মদ ধরার বয়স হয়নি।

তবে আজ সে কয়েকটা বিয়ার খেয়েছে। কেউ যদি মনের ভুলে একটা নয়, দুটো নয়, ছ'ছটা ক্যান রেখে যায় অফিসে, না খেয়ে উপায় কি তার? ফেলে দেবে নাকি? মাগনা?

কাউন্টারের ওদিকে দাঁড়ানো খদ্দেরের দিকে লালচে, ঘোর লাগা চোখ মেলে তাকাল সে। উঁহুঁ, এলাকার কেউ নয়। কালা আদমি, তবে ব্যাটাচ্ছেলে সৌখিন বটে। দামী স্যুট, চোখে চশমা, সম্ভবত ডেট্রয়েটের কোন প্রফেসর বা হোটেল মালিক হবে। তার

দিকে একটু তেরছা চোখে তাকাল ছেলেটা, বলল, 'এই মুহূর্তে শুধু একটা লীয়ার জেট আছে আমাদের। প্রচুর খরচ পড়বে, মিস্টার।'

পকেটে হাত ভরল খদ্দের, মানি ব্যাগ নয়, টাকার মোটা একটা বাণ্ডিল বের করল। ছানাবড়া হয়ে উঠল ছোকরার চোখ। ওরে সর্বনাশ! সবই একশো ডলারের নোট! 'কত?'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় নিল ছেলেটা। একজন কালা আদমির পকেটে এত টাকা! তাও আবার ক্যাশ! অত কথা কি, কোন সাদা চামড়ার কাছেও এত টাকা একসাথে দেখেনি সে। কে বাওয়া তুমি, কোথাকার লাটসাহেব? ধ্যেৎ, তা জেনে তার কি লাভ? কালো টাকা বা সাদা টাকা, তার কাছে সবই এক। 'শুধু আপনি?'

'সাথে আমার মেয়ে আছে,' নিগ্রো লোকটা বলল। 'বাইরে, গাড়িতে ঘুমাচ্ছে সে।'

ঝট্ করে মুখ তুলল ছেলেটা। এক ঘণ্টাও হয়নি স্টেট পুলিস টেলিফোনে সতর্ক করে দিয়েছে ওকে। চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি দিয়ে তাকে জানানো হয়েছে, ছোট্ট এক মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে লোকটা।

কিন্তু এই লোকটা মেয়ের কথা গোপন করছে না। গায়ের রঙও ফর্সা নয়, চেহারার বর্ণনা বা বয়সও মেলে না। ছেলেটার পেশীতে ঢিল পড়ল, ঝুঁকে দেরাজ থেকে ট্রিপলিকেট ফর্ম বের করল সে। 'ক'দিনের জন্যে দরকার আপনার?'

'এক হপ্তা।'

'কোথায় যাবেন?'

'নর্দার্ন পেনিনসূলা। মারকেটের জন্যে প্ল্যান ফাইল করব।'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'ঠিক আছে–সাথে যদি তিন ধরনের আইডেনটিফিকেশন থাকে, সেই সাথে পাইলট'স আই.ডি.

তাহলে ব্যবসা হতে পারে।'

বিশ মিনিট পর টেক-অফ করল লীয়ার জেট। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল সগর্জনে। উত্তর দিকে যাচ্ছে। খানিক পর নিচের এয়ারফিল্ড থেকে প্লেনটাকে আর দেখা গেল না। এবার নাক ঘুরিয়ে পুব দিকে ছুটল জেট।

গন্তব্য ওয়াশিংটন ডি.সি.।

দশ

ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার। পটোম্যাক নদীর ওপর দিয়ে ডাউনটাউন ওয়াশিংটন বিশ মিনিটের পথ।

বিশাল ভবনের সাততলায় নিজের ডেস্কে বসে আছেন জেফ রিকার্ড, সি.আই.এ.চীফ। রাত পৌনে ন'টা।

কির কির করে যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন উঠল। ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন রিকার্ড।

'এক্সকিউজ মি, স্যার,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল রিকার্ডের স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট, বাইরে অফিসে বসে আছে সে, 'জানি আপনি নিষেধ করেছেন, বিরক্ত করা চলবে না, কিন্তু ফোন করেছেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ নিজে।'

বিরক্তির সাথে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন রিকার্ড। 'কীথ? কি চায় সে?'

'জানি না, স্যার; তবে খুব নাকি জরুরী।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন রিকার্ড। তারপর ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। 'বলো, কীথ।' এক মুহূর্ত, তারপরই তাঁর চেহারা থেকে সমস্ত বিরক্তির

ছাপ উধাও হয়ে গেল। নিজেও টের পেলেন না, ধীরে ধীরে শক্ত করে ধরেছেন রিসিভারটা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটল কপালে। শুনছেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, আবার এ-ও জানেন, প্রতিটি শব্দ বাস্তব সত্য। পাথর হয়ে বসে থাকলেন চেয়ারে–বোবা, যেন বেকুব।

কীথ বিউমন্ট থামলেন। মাত্র একটা প্রশ্ন করলেন রিকার্ড, 'প্রেসিডেন্ট জানেন?'

'হ্যাঁ। মেক্সিকো থেকে রওনা হয়েছেন তিনি। পৌঁছেই আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।'

সন্দেহ কি!

'থাকব ওখানে,' বিড়বিড় করে বললেন রিকার্ড। রিসিভার নামিয়ে রেখে নিঃসাড় বসে থাকলেন। সামনের সাদা দেয়ালে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

কি করে সম্ভব? কেন?

এত থাকতে প্রেসিডেন্টের মেয়ে কিডন্যাপ হলো!

কে দায়ী? কারা? কেন?

সি.আই.এ. চীফের গলা শুকিয়ে গেল। ঢোক গিলতে ভুলে গেলেন তিনি। ভাবলেন, উত্তরগুলো জানার আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেও বোধহয় মন্দ হয় না।

ডেস্কের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ড্যাম ইট, জেফ! সিক্রেট সার্ভিস ওখানে আমাকে তুলো দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। ওদের সন্দেহ প্রতিটি বিছানার তলায় টেরোরিস্ট লুকিয়ে আছে। মিশিগানে কি করছিল ওরা? এটা ওরা কিভাবে ঘটতে দিল?'

সাথে সাথে কোন জবাব দিলেন না জেফ রিকার্ড। অপেক্ষা করছেন, বিস্ফোরণের প্রকোপ আগে কমুক। রিচার্ড কনওয়েকে পঁচিশ বছর ধরে চেনেন তিনি, সেই কলেজ জীবন থেকে। এক

সাথে রাজনীতি করেছেন তাঁরা, কংগ্রেসে গেছেন, প্রেসিডেন্ট ইলেকশনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন, তারপর এখানে এই ওভাল অফিসে এসেছেন। জানেন, সঙ্কট যত জটিলই হোক এক সময় রিচার্ড কনওয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবেন।

তবে এ-ধরনের সঙ্কটের কথা ভাবা যায় না। বন্ধুর দিকে তাকালেন তিনি। যুবক প্রেসিডেন্ট, বয়স এখনও পঞ্চাশ পুরো হয়নি। এমনিতে কোমল স্বভাবের, কিন্তু প্রয়োজনে কঠিন হতে জানেন। বিনা যুক্তিতে বুঝ মানার লোক নন। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভালবাসেন। তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। সমাধান নেই, এ অজুহাত শুনতে তিনি রাজি নন।

রক্তে আভিজাত্য রয়েছে, অথচ রক্তপিপাসু যোদ্ধা কখনোই হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট, তাঁর বন্ধু, সুকুমার বৃত্তির চর্চা করেন, শিল্প এবং শিল্পীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। সন্দেহ নেই, তাঁর মত ব্যক্তিত্বকেই ওভাল অফিসে মানায়।

বাইরে থেকে অতটা বোঝা না গেলেও, এই মুহূর্তে ভেতরে ক্রোধান্ধ অসুরে পরিণত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। প্রিয়জনকে হারাবার আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত। কোন রাজনৈতিক সঙ্কট তাঁকে এতটা উত্তেজিত করতে পারত না, রিকার্ড জানেন। এমন একজন মানুষ, যিনি সারা দুনিয়ার সমস্যা সমাধান করে থাকেন–আজ হঠাৎ করে নিজেই বিকট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছেন। তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এখন তাঁর অন্য লোকদের ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই। যত ক্ষমতাই তাঁর থাক, নিজেই তিনি মেয়েকে খুঁজতে বেরুতে পারেন না।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জেফ রিকার্ডের চিন্তা-ভাবনা হঠাৎ অন্য খাতে বইতে শুরু করল। প্রেসিডেন্টের আচরণের মধ্যে কি রকম যেন একটা প্রচ্ছন্ন লোক-দেখানো ভাব

রয়েছে। নাকি চোখের ভুল? তাঁর বসার ভঙ্গিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। মেক্সিকো সফর থেকে সদ্য ফিরেছেন, অথচ মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, পরনে সদ্য ভাঁজ খোলা ধূসর রঙের স্যুট, আলো লেগে ঝিক করে উঠছে হীরের আংটি। মনের ভেতর যাই ঘটে যাক, চেহারায় লাবণ্যের কোন কমতি নেই। উদ্বিগ্ন, কিন্তু কেমন যেন বানোয়াট মনে হয়।

না, নিশ্চয়ই ভুল বিশ্লেষণ করছেন তিনি।

চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ দুটো মুছলেন রিকার্ড। রাত তিনটে বাজে, বিছানায় যাবার সময় পাননি। আবার কবে ঘুমাবেন, জানেন না।

'কেউ ঘটতে দেয়নি,' বললেন তিনি। 'এটা কোন পাগলের কাজ নয় যে সিকিউরিটি আরও কড়া হলে ঠেকানো যেত। না, ঝোঁকের মাথায় বা হঠাৎ করে কাজটা করা হয়নি। লোকটা প্রফেশনাল, হাইলি স্কিলড প্রফেশনাল।'

'আর সিক্রেট সার্ভিস?' সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ওরা প্রফেশনাল নয়?'

'রিচার্ড,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জেফ রিকার্ড বললেন, 'ওরাও প্রফেশনাল। কিন্তু আমি ট্রেনিং পাওয়া বডিগার্ড সম্পর্কে বলছি না। বলছি স্কিলড ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সম্পর্কে। সিক্রেট সার্ভিসকে তুমি দোষ দিতে পারো না।'

'আমার যাকে খুশি তাকে দোষ দেব!' বিস্ফোরিত হলেন প্রেসিডেন্ট। চোখে আগুন নিয়ে বন্ধু সি.আই.এ. চীফের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন, ধীরে ধীরে পড়ে আসছে রাগ। হাতটা একটু তুলে শূন্যে নাড়লেন তিনি। 'আমি জানি,' শান্তভাবে বললেন। 'অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের জন্ম দেয়।' আবার তিনি চোখ মেললেন। দৃষ্টিতে উদ্বেগ, কিন্তু চেহারা শান্ত। 'তুমি তাহলে তাই ভাবছ,

জেফ? বিদেশী কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি?'

চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন জেফ রিকার্ড। 'সে রকমই দেখাচ্ছে না? আর কার এত সাহস বা যোগ্যতা আছে? টেরোরিস্টদের কাজ নয়, এটুকু পরিষ্কার। কাজের ধরনই সে-কথা বলে দেয়। দলবেঁধে আসেনি ওরা, কমাণ্ডো হামলা চালায়নি। তবে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা ছিল লোকটার। ছদ্মবেশে কোন ত্রুটি নেই, সময়ের চুলচেরা হিসেব ধরে কাজ সেরেছে। এ-সব গুণ একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টেরই থাকে।' এক মুহূর্ত থেমে ডেস্কের ওপর ঝুঁকলেন তিনি। 'তবে এ ধরনের ব্যাখ্যা এখুনি না করাই ভাল। কাউকে বাদ দেয়া বোকামি হবে। বিদেশী শত্রু, দেশী শত্রু, রাজনৈতিক শত্রু, তালিকায় সবাইকেই রাখতে হবে।'

'রাজনৈতিক শত্রু?'

প্রেসিডেন্টের দিকে সরাসরি তাকালেন রিকার্ড। 'যে-কেউ হতে পারে, রিচার্ড। তুমি অসহায় হয়ে পড়লে যারা লাভবান হবে তাদের যে কেউ কাজটা করিয়ে থাকতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট তিক্ত একটু হাসলেন। 'তালিকাটা তাহলে শুধু লম্বাই হতে থাকবে। আমি অসহায় হয়ে পড়লে লাভবান হবে না এমন কেউ সত্যি আছে নাকি?' চেয়ার ছাড়লেন তিনি, পায়চারি শুরু করলেন। ফায়ার প্লেসের কাছে, জর্জ ওয়াশিংটনের পোর্ট্রেটের সামনে থামলেন, ঘুরে ফিরে এলেন বিশাল জানালার পাশে নিজের ডেস্কের পিছনে। মুহূর্তের জন্যে থেমে সবুজাভ বুলেটপ্রুফ কাঁচের গায়ে হাত বুলালেন। 'বিদেশী ইন্টেলিজেন্স,' যেন নিজের সাথে কথা বলছেন। তারপর ফিরলেন তিনি। 'তোমার কি মনে হয়, জেফ? কে.জি.বি.?'

'প্রচুর সম্ভাবনা।' কাঁধ ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'আরেকদিক থেকে ভাবলে সম্ভাবনা ক্ষীণ।'

'ক্ষীণ কেন?'

'কারণ, সাংঘাতিক ঝুঁকি। যদি ধরা পড়ে অনেক কিছু হারাতে হবে ওদের।'

'যদি ধরা পড়ে? যদি? আমরা টিউলিপকে নিয়ে কথা বলছি, ফর গডস সেক! আমার মেয়ের জীবন বিপন্ন, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে! এরপরও তুমি বলছ, যদি ধরা পড়ে?'

না, ভান নয়; ভাবলেন রিকার্ড। ক্ষমতা ভোগ করলে বিনিময়ে চড়া মূল্য দিতে হয়, রিচার্ড কনওয়ের কাছ থেকে সেই মূল্য দাবি করছে প্রকৃতি। জেফ রিকার্ড বন্ধুর চেহারায় ক্ষীণ একটু অপরাধ ভাব লক্ষ করলেন।

'খুন-খারাবির মধ্যে যাবে না ওরা,' প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন রিকার্ড। বললেন জোরের সাথেই, কিন্তু নিজেই আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করলেন। 'যে বা যারাই তাকে নিয়ে যাক, টিউলিপকে মেরে ফেলবে না। আমরা জানি, ওরা প্রফেশনাল। সত্যি কথা বলতে কি, এখানেই যা একটু সান্ত্বনা আমাদের।'

'কিসের ভিত্তিতে এত জোর দিয়ে বলছ?'

'বলছি, কারণ, আমাদের মেয়ে মারা গেলে তার আর কোন দাম থাকবে না।'

প্রেসিডেন্ট একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে ওরা টাকার জন্যে কাজটা করেছে?'

'দাম শুধু টাকা দিয়ে মেটানো হয় না,' বললেন রিকার্ড। 'না, ওরা টাকা চাইবে বলে মনে হয় না। ইউ.এস. ট্রেজারির মাথায় যে বসে আছে তার জন্যে টাকা কোন সমস্যা নয়। যদি চায়, এমন কিছু চাইবে, দেয়া অসম্ভব বলে মনে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে তোমার সাথে আমি একমত,' প্রেসিডেন্ট ধীরেসুস্থে আবার বসলেন চেয়ারে। মুখ নিচু করে নিজের হাতের

দিকে তাকিয়ে আছেন। 'বড় ধরনের কিছু একটা চাইবে ওরা। আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়, এমন কিছু।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে এমন কিছু নেই যা একজন বাপ দিতে পারেন না। অপরদিকে, বিশ কোটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে প্রেসিডেন্টের কাঁধে, তিনি তাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। বাপ আর প্রেসিডেন্ট, দুটো আলাদা সত্তা। কিডন্যাপাররা অসম্ভব কিছু দাবি করে বসলে দুই সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে।

'ওঁরা দু'জনেই জানেন, প্রেসিডেন্ট হারবেন, নাকি বাপ হারবেন। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করা।'

'জল্পনাকল্পনার সময় নয় এটা,' মুখ তুলে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'টিউলিপকে খুঁজে বের করতে হবে–জলদি। ওরা কোন দাবি জানাবার আগেই। সেজন্যেই তুমি এখানে। তোমাকে যতটা বিশ্বাস করি, আর কাউকে তার অর্ধেকও করি না। এফ.বি.আই. চীফের কথা ধরো। আমিই তাকে বেছেছি, কিন্তু মাত্র ছ'মাস হলো অফিসে বসছে। সে কতটুকু কি করতে পারবে আমার জানা নেই।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন রিকার্ড। 'আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি করব, রিচার্ড। কিন্তু, জানোই তো, আইন বলে কাজটা এফ.বি.আই-এর...'

'ঘরোয়া বলে? ঘরোয়া কিনা তা-ই তো জানি না। যদি বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি দায়ী হয়ে থাকে, দায়িত্বটা তোমার ঘাড়েই চাপে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'তোমার সিদ্ধান্তের ওপর আর কথা কি।'

'হ্যাঁ, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। তাছাড়া, জেফ, আমি

এফ.বি.আই.বা সি.আই.এ.-কে নিয়ে কথা বলছি না। বলছি তোমাকে নিয়ে। তুমি আমার বন্ধু, তোমার প্রতি এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আমি চাই তুমি আমার মেয়েকে খুঁজে বের করো।'

কয়েক যুগ ধরে, ধীরে ধীরে জন্মে ওঠা আস্থা, বিশ্বাস, আর দাবি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। কিন্তু শুধুই কি আস্থা আর বিশ্বাস? এতগুলো বছর ধরে পরস্পরের প্রতি খানিকটা অবিশ্বাসও কি জন্মায়নি? খানিকটা ঈর্ষা? সামান্য বিদ্বেষ? বন্ধুত্ব বজায় আছে, কিন্তু অসন্তোষ কি একেবারেই নেই?

'শুধু সি.আই.এ. নয়, এফ.বি.আই.কেও তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'এমন কি সিক্রেট সার্ভিসও, যদি দরকার মনে করো। ট্রেজারি, ডিফেন্স, সামরিক বাহিনী—আমার সরকারের ক্ষমতার সমস্ত উৎস তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

আপনা থেকেই নত হয়ে এল জেফ রিকার্ডের মাথা। গুরুদায়িত্বের ভার তিনি অনুভব করছেন। আগেই ধারণা করেছিলেন, এই সংকটে বড় একটা ভূমিকা পালন করতে হবে তাঁকে। হয়তো সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে এই? হাতের তালু এক করে ঘষলেন তিনি। ঘামে ভিজে গেছে। অগাধ ক্ষমতা, বিশাল দায়িত্ব, বিষম ঝুঁকি।

বিকল্প কোন পথ নেই। 'আমার সাধ্যমত করব আমি, রিচার্ড,' তিনি বললেন।

পামেলা কনওয়ের প্রেস সেক্রেটারি অসুস্থ বোধ করল। কিন্তু জানে, কাজটা এখুনি সারতে হবে। চেয়ারে সিধে হয়ে বসে টাইপরাইটারে কাগজ ঢোকাল সে। অভ্যস্ত দক্ষতার সাথে, সংক্ষিপ্ত ভাষায় টাইপ করে ফেলল প্রেস রিলিজ। অন্যান্য রুটিন

স্টেটমেন্টের সাথে এই খবরটাও যাবে।

'ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে টিউলিপ কনওয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে সে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে বলেছেন, ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, তবে দিন কয়েক বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। আরও অন্তত এক হপ্তা প্রেসিডেন্টের মেয়ে ওয়াশিংটনে ফিরবে না।'

প্রেস রিলিজটা আগামীকাল ইস্ট উইং থেকে সাংবাদিকদের দেয়া হবে। তারা সম্ভবত খবরটাকে তেমন গুরুত্বের সাথে নেবে না।

মোটাসোটা একটা রিপোর্ট, পাতাগুলো উল্টে গেলেন জেফ রিকার্ড। চোখ থেকে চশমা খুলে হেলান দিলেন চেয়ারে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালেন। আবার সিধে হয়ে বসলেন, ঝাঁক বেঁধে থাকা সুইচগুলোর একটায় চাপ দিলেন জোরে।

'ইয়েস, স্যার?'

'পিকেরিং-কে বলো, এখন আমি তার সাথে দেখা করতে পারি।'

'ইয়েস, স্যার।'

হেনরি পিকেরিং জেফ রিকার্ডের ডেপুটি, সি.আই.এ-র দ্বিতীয় ব্যক্তি। লম্বা, একহারা গড়ন, মাথার দু'পাশের চুলে সবে পাক ধরতে শুরু করেছে। পিকেরিং আগে ফিল্ড এজেন্ট ছিল, সেখান থেকে সরে এসেও মুটিয়ে যায়নি, তার প্রাণপ্রাচুর্য এবং রিফ্লেক্স আগের মতই অটুট আছে। সংশ্লিষ্ট ওয়াশিংটন মহলে 'বয় জিনিয়াস' বলে ডাকা হয় তাকে। তার এই খ্যাতির পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উর্বর মস্তিষ্ক, দুটোরই সমান কৃতিত্ব রয়েছে। বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ পেরোয়নি। ল্যাংলিতে কাজ করে সে।

পিকেরিং ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালেন জেফ রিকার্ড। সপ্রতিভ এবং ব্যগ্র, ভাবলেন তিনি। তাঁর ধারণা, পঁচাশিতেও পিকেরিং এরকম তাজা আর প্রাণচঞ্চল থাকবে।

'তোমার স্পেকিউলেশনগুলো পড়লাম, হেনরি,' বললেন তিনি। 'মন্দ নয়, কিন্তু···আরে, বসো!'

ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসে পা দুটো সামনে লম্বা করে দিল পিকেরিং। জেফ রিকার্ডের মতই, শুধু শার্ট পরে আছে সে। চোখের কোলে কালি, যেন কত দিন ঘুমায়নি। 'মন্দ নয় মানে, স্যার?'

রিপোর্টটার ওপর একটা হাত রাখলেন সি.আই.এ. চীফ। আড়াইশো পৃষ্ঠার একটা গবেষণা। কমপিউটর আর হিউম্যান ইনফরমেশন ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা ডাটা-র সাহায্যে নিরেট একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কিছু সাজেশন। 'ধারণা আর সাজেশন যথেষ্ট নয়, হেনরি,' বললেন তিনি। 'তাড়াতাড়ি অ্যাকশনে নেমে তাড়াতাড়ি ফল পাবার মত কিছু একটা করতে হবে আমাদের।'

দু'জনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব নতুন নয়। এজেন্সি-চীফ পলিসি নির্ধারণ করে সেই মুহূর্তে রেজাল্ট চাইবেন, কিন্তু তাঁর ডান হাতকে কাজ করতে হয় বাস্তবতা নামে সীমাবদ্ধতার ভেতর। খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল পিকেরিং, তারপর শুরু করল, 'এরপর আর কি করার আছে, আমার জানা নেই। ওঅর রুম-কে রেড অ্যালার্টের মধ্যে রেখেছি। পেন্টাগন আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-কে সতর্ক রাখা হয়েছে। দেশে আর দেশের বাইরে যেখানে যত স্টেশন চীফ আছে তাদের সবাইকে সাবধান করা হয়েছে। মিত্র দেশের সব ক'টা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে যোগাযোগ রাখছি। এমনকি আন অফিশিয়ালি সামরিক বাহিনীকেও সতর্ক রাখা হয়েছে। জানি, এত সব করে

পরিবেশটাকে আড়ষ্ট করে তোলা হচ্ছে, অথচ কোন ফলাফল আশা করার উপায় নেই। ফল পাব, যদি নতুন কোন সূত্র হাতে আসে।'

'ইতিমধ্যে যেগুলো হাতে এসেছে?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন সি.আই.এ. চীফ।

'সেগুলোর ওপর কাজ হচ্ছে। কোত্থেকে কেনা হয়েছে খেলনা ভাল্লুকটা, ভুয়া স্যাম গ্রেসনের গাড়িটা কোত্থেকে এল। প্রিস্ট ভদ্রলোককে কে ফোন করেছিল সেটাও জানার চেষ্টা করছি আমরা। স্যাম গ্রেসন আমেরিকায় আসছে এই খবর যারা জানত তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে। এফ.বি.আই. ল্যাবরেটরিতে প্লেনের প্রতিটি অংশ টেস্ট করব আমরা···।'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি,' ডেপুটিকে বাধা দিলেন জেফ রিকার্ড। 'প্লেনটা পরীক্ষা করে কিছুই আমরা জানতে পারব না। কিডন্যাপার ওটায় ছিলই না। ওটাকে ধোঁকা দেয়ার একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কৌশলটা কাজেও লাগে। গরু, বুঝলে, সিক্রেট সার্ভিসে ওরা একপাল গরু কাজ করছে।'

চেহারায় সহানুভূতি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল পিকেরিং। 'ব্যাপারটা আমি বুঝি, স্যার। দারুণ অস্বস্তিকর–কারণ প্রেসিডেন্টকে বুঝ দেয়ার কাজটা একা আপনার ওপর চেপেছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হলো, খোলা একটা পথ না পেলে এই মুহূর্তে তেমন কিছু আমাদের করার নেই। প্রথম চাল ওদের, স্যার।'

রিকার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'হ্যাঁ, অনেকটা দাবা খেলার মতই বটে, কিন্তু মুশকিল হলো বোর্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু, না, হেনরি–আমি অ্যাকশন চাই। কোথাও একটু ফাঁক থেকে গেলে, তার জন্যে যে-ই দায়ী হোক, তাকে আমি ক্ষমা করব না।' তাঁর হাত আবার রিপোর্টের ওপর নামল। 'এতে শুধু

গত ছ'মাসের হট স্পটস সার্ভে করা হয়েছে। আমি চাই দু'বছরের রিপোর্ট দাও তুমি। অ্যানালিস্টদের বলো, এই কিডন্যাপিঙের মোটিভ হতে পারে এমন যে-কোন অ্যাকটিভিটি খতিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যে-কোন ধরনের, যে-কোন সময়ের, যে-কোন জায়গার।'

শার্টের পকেট থেকে একটা ইনডেক্স কার্ড বের করল পিকেরিং, নোট নিল।

'বললে, স্টেশন চীফদের সতর্ক করে দিয়েছ। কী ফিল্ড এজেন্টদের কথা ভাবোনি?'

'ধরে নিয়েছি স্টেশন চীফরাই...'

'ধরে নিলে চলবে না, হেনরি! সিদ্ধান্ত নাও কারা আমাদের টপ এজেন্ট, কাজ থেকে তুলে এনে এখানে জড়ো করো সবাইকে। প্রত্যেককে তুমি নিজে ব্রিফ করবে। বুঝতে পারছ না, আমাদের সমস্ত ক্ষমতা এই কাজে লাগাতে হবে! প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্মগুলোরও সাহায্য নিতে পারি আমরা। মিত্র দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সাথে যোগাযোগ একটা কাজের কাজ হয়েছে...।'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম, স্যার?'

'নয় কেন? শুধু দেশী নয়, বিদেশী ফার্ম যেগুলো খুব নাম করা তাদের সাহায্য নিতে আপত্তি কিসের?' এক মুহূর্ত স্মরণ করার চেষ্টা করলেন সি.আই.এ. চীফ। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তো এর আগেও জটিল কিছু কাজ করে দিয়েছে আমাদের, তাই না? তবে...'

'জ্বী, স্যার,' বলল পিকেরিং। 'তবে ফার্মটার ডিরেক্টর মাসুদ রানা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'মারা গেলে কি আর করা। কিন্তু ফার্মটা তো আর বন্ধ হয়ে যায়নি। তাছাড়া, খোঁজ নিয়ে দেখো সত্যি মাসুদ রানা মারা গেছে

কিনা। এর আগেও একবার তার মৃত্যুর খবর রটানো হয়েছিল। হয়তো কোন কারণে গা ঢাকা দেয়ার দরকার হয়েছে, তাই...'

'মনে হয় না, স্যার,' বলল পিকেরিং। 'খবরটা পাবার সাথে সাথে তদন্ত করে দেখা হয়েছে। রিপোর্ট পেয়েছি, খবরটা ভুয়া নয়।'

কাঁধ ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'আমাদের দূতাবাসগুলোর পলিটিক্যাল অফিসারদেরও সতর্ক করা দরকার। ওদের বলো, বিদেশী ইন্টেলিজেন্স দফতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে খবর রাখতে হবে। কুখ্যাত টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর তৎপরতার ওপরও নজর রাখা জরুরী।'

কার্ডে আরেকটা নোট নিল পিকেরিং।

'হয়তো এই একবার অন্তত পলিটিক্যাল অফিসাররা এমন কিছু বলবে যা আমরা ইতিমধ্যে জানি না। ভাল কথা, জিজ্ঞেস করবে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কি বলার আছে। ওরা রিপোর্ট পাঠালে সেই মুহূর্তে আমাকে যেন দেখানো হয়। আরেকটা কথা, কোন রিপোর্টই সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে না, সবার আগে আমাকে দেখিয়ে নিতে হবে–এর যেন কোন ব্যতিক্রম না হয়।'

চেহারায় ক্ষীণ একটু বিস্ময় ফুটে উঠলেও পিকেরিং কোন প্রশ্ন করল না।

'এফ.বি.আই. চীফ,' বলে চললেন রিকার্ড, 'কি করছে না করছে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখো। ভদ্রলোকের ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। ওভাল অফিসে কার কথা খাটে, উনি জানেন না।'

নিঃশব্দে হাসল পিকেরিং। 'একটু সময় দিন, স্যার। উনি শিখে নেবেন। কিন্তু, স্যার, ডিরেক্টরের সাথে আমার কোন যোগাযোগ হয়নি কখনও। এফ.বি.আই-এর ভেতরে আমার নিজস্ব লোক আছে–কয়েক বছর ধরেই।'

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রিকার্ড। 'গুড।' জানেন, এ-সব কাজে পিকেরিঙের তুলনা হয় না। কাজের সুবিধের জন্যে সবখানে নিজের লোক ঢোকানো আছে তার। চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। নিচের পার্কিং লটে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, তবে বিল্ডিংটাকে ঘিরে থাকা ঘন গাছপালার বেড় আবছা অন্ধকারে ঢাকা। গাছগুলোর মাথার ওপর আলোর ক্ষীণ আভাস দেখা গেল। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। 'শুধু একটা কথা মনে রেখো, হেনরি,' ঘাড় ফিরিয়ে ডেপুটির দিকে তাকালেন তিনি। 'ওয়াশিংটনের সব কটা সান-অভ এ বীচ চাইছে এই সুযোগে হিরো বনে যাবে।' তিনি ঘুরলেন। 'কিন্তু সুযোগটা একা আমি নিতে চাই।'

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, গাড়িটা পুব দিকে বাঁক নিয়ে ভার্জিনিয়া রুট একশো তেইশে পড়ল। সি.আই.এ-র ল্যাংলি হেডকোয়ার্টারের পাশ ঘেঁষে এগোল রানা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। ওল্ড জর্জটাউন পাইক-এ পৌঁছে সামনে আরেকটা বাঁক দেখল, সেটা পেরিয়ে চলে এল টার্কি রান রোডে। এদিকে সব অভিজাতদের বাড়ি।

একজন কমপিউটর সেলসম্যান, রোজ সকালেই ব্রেকফাস্ট মীটিঙে উপস্থিত থাকার জন্যে ওয়াশিংটনে একবার আসতে হয়। আজও ঠিক সময়ে তাকে নিয়ে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছে লীয়ার জেট। সেলসম্যানের বদলে, কিন্তু একই চেহারা নিয়ে, প্লেন থেকে নেমে এসেছে রানা, হাতে অ্যাটাচি কেস আর একটা গারমেণ্ট ব্যাগ। এয়ারপোর্ট কর্মী আর ক্রুরা অনেকেই তাকে দেখেছে, পরিচিত লোক, কাজেই বিশেষ মনোযোগ দেয়নি কেউ। ফেডারেল পুলিস যে ব্যারিকেড তৈরি করেছে, সেখানে এয়ারপোর্টের লোকজনও ছিল, ব্যারিকেড

পেরোতেও তাই কোন অসুবিধে হয়নি।

পুলিস যদি খোঁজ নিত, সহজেই ট্রেস করতে পারত ওর ফ্লাইট প্ল্যান। নক্সভিল, টেনেসি থেকে হুবহু একই চেহারার একটা লীয়ার জেট টেক-অফ করেছে, ঠিক যখন রানা মিশিগান ত্যাগ করে। সেটা অন্য কোথাও, সম্ভবত কোন প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে ল্যাণ্ড করেছে। কমপিউটর সেলসম্যান বেচারা এই মুহূর্তে কোথায়, কেউ তা জানে না। প্লেনে চড়ার জন্যে বাড়ি থেকে ঠিকই বেরিয়েছে সে, কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার ভাগ্য তার হয়নি। মাঝ রাস্তা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার নিখোঁজ হওয়ার জন্যে দায়ী রানা এজেন্সির এজেণ্টরা, কিন্তু রানা ছাড়া সে-কথা আর কেউ জানে না। পাইলটকে বলা আছে, ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দ্বিতীয় লীয়ার জেটটা নিয়ে যাবে সে।

আবার ডান দিকে বাঁক নিল রানার গাড়ি। বনভূমির গভীরে প্রবেশ করছে ও। মাইলখানেক এগোবার পর রাস্তার ধারে একটা লেটারবক্স চোখে পড়ল, গায়ে সদ্য আঁকা একজোড়া লাল গোলাপ কুঁড়ি।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে পথ দেখিয়ে পিছনের গ্যারেজে নিয়ে এল ডানিয়েল। ভেতরে ঢুকল গাড়ি, দরজা বন্ধ করে দিল ডানিয়েল। বলল, 'একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।'

শুধু একটু মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনার আরোহী কেমন আছে?'

'এখনও ঘুমিয়ে।'

চেইন টেনে গারমেণ্ট ব্যাগটা খুলল রানা। এ-ধরনের ব্যাগ বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়, সাধারণত গারমেণ্টস ফ্যাক্টরিগুলো ব্যবহার করে। কয়েক জোড়া স্যুট সুন্দরভাবে রাখার মত জায়গা থাকে ভেতরে। কিন্তু রানার এটা শুধু বাইরে থেকে দেখতে গারমেণ্ট ব্যাগের মত, ভেতরে অন্য রকম।

মহাশূন্যচারীদের জন্যে বিশেষ এক ধরনের স্পেস স্যুট তৈরি করেছিল নাসা, তার নমুনা সংগ্রহ করে খুদে একটা স্পেস স্যুট তৈরি করেছে রানা। স্পঞ্জ, তুলো, আর ফোম দিয়ে তৈরি, ভেতরে শুয়ে বা বসে থাকতে পারে ছোট একটা বাচ্চা, বাতাস চলাচলের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। ব্যাগের ভেতর পাতলা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি কাঠামোয় আটকানো রয়েছে স্পেস স্যুট। ফ্রেমের ওপর থেকে কিছু কাপড়চোপড় সরাল রানা, তারপর ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে টিউলিপের দিকে তাকাল। নরম কুশনে হেলান দিয়ে আরামে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। পালস আর শ্বাস পরীক্ষা করল রানা, তারপর আরেকটা ইঞ্জেকশন দিল। সোডিয়াম পেন্টোথালের বদলে ভ্যালিয়াম ব্যবহার করছে ও, ট্রাংকুইলাইজার হিসেবে কড়া না হলেও নিরাপদ। এবারও, মাত্রা ঠিক থাকল, অচৈতন্যের অগভীর স্তরে নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্যে পৌঁছে গেল টিউলিপ।

গ্যারেজে আরেকটা বাহন রয়েছে। ডানিয়েলের ইঙ্গিতে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা।

'সুন্দর, তাই না? হুবহু আসলটার মত দেখতে।'

লম্বা, কালো একটা বাহন, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। শবযানের সাইড ডোরে খুদে, সোনালি হরফে লেখা রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি। 'হ্যাঁ, হুবহু,' একমত হলো রানা। পিছনের দরজা খুলে ভেতরে তাকাল ও।

মেঝেতে একটা ফাঁক রয়েছে, কফিন আকারের। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, বারো ইঞ্চি নিচে দ্বিতীয় মেঝেতে। 'ভেতরে যেটা ঢুকবে সেটা কই,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ইনসার্ট?'

'এখানে।' পথ দেখিয়ে গ্যারেজের সামনের দিকে চলে এল ডানিয়েল। লম্বা, চ্যাপ্টা আকৃতির একটা বাক্স দেখল রানা। মাটি থেকে এক ফুট উঁচু হয়ে আছে। বাক্সটা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা

করল ও। ঢাকনি তুলল। তালাগুলো খুলল। 'ফিট হয় কিনা ঢুকিয়ে দেখেছ?'

'কোন খুঁত নেই।'

'গুড।'

'একটা প্রশ্ন,' বলল ডানিয়েল।

চোখ তুলল রানা।

ইঙ্গিতে শবযানটা দেখাল ডানিয়েল। 'মি. অবসন জানতে চেয়েছেন আপনার প্ল্যানের মধ্যে ওটা কিভাবে আসছে।'

ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'অবসনকে বোলো, চিন্তিত হবার কারণ নেই। খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে সে।'

এগারো

পরদিন, শনিবার, ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট।

হোয়াইট হাউসের উল্টো দিকে, লাফায়েটি স্কয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুতল হে-অ্যাডামস হোটেল। হোটেলের সুসজ্জিত লবিতে ধীর পায়ে ঢুকল রানা। জানা সত্ত্বেও ডেস্কের পিছনে বসা লোকটাকে রকি ডুরেলসনের রূম নাম্বার জিজ্ঞেস করল ও। তারপর লবির অপর প্রান্তে হাউস ফোনের দিকে এগোল।

রকি ডুরেলসন দ্রুত জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস?' অত্যন্ত ব্যস্ত লোক সে, সোয়ানটেক্স করপোরেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, অপ্রত্যাশিত ফোন কলে বিরক্ত হয়েছে।

'মি. ডুরেলসন, আমার নাম হ্যালোরান,' বলল রানা। 'স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি।'

'ইয়েস?'

'আপনার যদি খানিক সময় হয়, দেখা করতে চাই।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা জরুরী।'

অপরপ্রান্তে ইতস্তত করতে লাগল রকি ডুরেলসন। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে। একটু পরই আমি বাইরে বেরিয়ে যাব।'

'ইয়েস, স্যার, জানি। এখুনি উঠে আসছি আমি।'

এলিভেটরে চেপে ছ'তলায় উঠল রানা, কার্পেট মোড়া করিডর ধরে বাঁ দিকে মোড় নিল। কামরার দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রকি ডুরেলসন। তার পরনে টক্সেডো প্যান্ট, ফরমাল শার্ট, বো-টাই। ধূসর চুল ব্যাকব্রাশ করা। চেহারায় ব্যস্ত আর বিরক্ত ভাব। 'কি এমন জরুরী ব্যাপার যে শনিবার রাতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এসে হাজির?' রানা ঘরে ঢোকার পর দরজা ঠেলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল সে।

'সত্যি কথা বলতে কি, অত্যন্ত নাজুক একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, স্যার,' বলল রানা। লক্ষ করল, রকি ডুরেলসন নিজেও বসছে না, ওকেও বসতে বলছে না। 'অস্ট্রিয়ান সরকার আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।'

'প্রতিবাদ?' রকি ডুরেলসন আকাশ থেকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। 'কি নিয়ে প্রতিবাদ?'

'কয়েকজন অস্ট্রিয়ান অফিশিয়ালকে পেমেন্ট দেয়ার ব্যাপারে। আপনাদের করপোরেশন পেমেন্ট করেছে...'

ডুরেলসনের চিবুক ঝুলে পড়ল, রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'কি ধরনের ননসেন্স এটা, শুনি? ত্রিশ বছর ধরে ভিয়েনায় আমাদের হেডকোয়ার্টার রয়েছে। অস্ট্রিয়ান সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল...।'

'তা হতে পারে, স্যার। কিন্তু, আমরা যতদূর জানি, আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।'

'আপনি জোক করছেন, ইয়ংম্যান?' হঠাৎ সতর্ক দেখাল ভাইস-প্রেসিডেন্টকে। 'কে আপনি?'

'আমার নাম মাইক হ্যালোরান। স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রটোকল অফিসার হিসেবে আছি।' পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দেখাল রানা, ভেতরে সরকারি আই.ডি. রয়েছে, ওর ছবি সহ। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। মনে মনে প্রশংসা করল সে, লোকটার মনের ভাব বাইরে ফুটছে না। এমন কোন লক্ষণ নেই চেহারায় যা দেখে বোঝা যাবে রানার মত সে-ও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু জানে যে সে-ব্যাপারে রানার কোন সন্দেহ নেই। সোয়ানটেক্স করপোরেশন সত্যি সত্যি অস্ট্রিয়ান সরকারের কিছু অফিসারকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়েছে। ঘটনা এই প্রথম নয়, অনেক বছর ধরেই ঘটছে। ঘুষের বিনিময়ে এক্সপোর্ট কোটা, আয়কর, জাহাজ চলাচল, এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়ে অবৈধ কিছু সুবিধে ভোগ করছে এই করপোরেশন।

অন্ধ কিছুদিন হলো ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে অস্ট্রিয়ান সরকার। তদন্তের ভার দেয়া হয় নাম করা একটা আন্তর্জাতিক মানের ইনভেস্টিগেশন ফার্মকে। তদন্তের রিপোর্ট এখনও অস্ট্রিয়ান সরকারের হাতে পৌঁছায়নি, কাজেই সোয়ানটেক্সের বিরুদ্ধে এখুনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, অপরাধবোধ থাকায় রকি ডুরেলসন সাবধানে পা ফেলবে। সোমবারের আগে টেরই পাবে না যে তাকে বোকা বানানো হয়েছে।

'এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে,' ওয়ালেট ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে ভরতে ভরতে বলল রানা, 'প্রটোকল অফিস ভাবছে, আজ রাতে সোয়ানটেক্সের তরফ থেকে হোয়াইট হাউসে কোন প্রতিনিধি না

পাঠানোই উচিত হবে।'

'আই সি! তারমানে অস্পষ্ট একটা অভিযোগ তুলে অফিশিয়ালি আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো, তাই কি? অভিযোগ কি প্রমাণিত হয়েছে, হ্যালোরান? জানতে পারি, অভিযোগটা কে করছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, স্যার। আমরা একটা ফরেন গভর্নমেন্টের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কাজ করছি। এর বেশি আপনাকে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'ব্যাখ্যা নেই, অথচ হোয়াইট হাউসে যেতে নিষেধ করা হলো আমাকে···।'

'ঠিক ওভাবে দেখবেন না, স্যার, প্লীজ। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়। তবে আমার ধারণা, অবস্থা কি আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি গেলে হয়তো···'

'ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দেয়া হবে, এই তো?' প্রচণ্ড ক্ষোভে টাই ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করল সে, খুলে ফেলে দিল ছুঁড়ে। 'বেরিয়ে যাও, হ্যালোরান! ফোনে জরুরী কথা বলতে হবে আমার!'

নিরীহ ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল রানা। স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা হোয়াইট হাউস, যেখানে খুশি ফোন করুক ডুরেলসন, শনিবার রাতে ডিউটি অফিসার ছাড়া কাউকে পাবে না সে। ডিউটি অফিসাররা সবাই এক বাক্যে জানাবে, এ-প্রসঙ্গে কিছুই তাদের জানা নেই। আর যদি চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সময় নেয় ডুরেলসন, কোথাও খোঁজ নেয়ার চেষ্টাই করবে না সে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, পরবর্তী ফ্লাইটে ভিয়েনায় চলে যাবে।

সোয়া ঘণ্টা পর রকি ডুরেলসনের চেহারা, পরিচয়-পত্র, আর নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে হোয়াইট হাউসের ইস্ট গেট-এ হাজির হলো রানা। এমন সময় পৌঁছুল, যখন নিমন্ত্রিতরা বেশিরভাগই ভেতরে

ঢুকে গেছে। ভিড় ঠেলতে বা লাইন দিতে হলো না, ওর হাত থেকে এনগ্রেভ করা কার্ড নিয়ে চোখ বুলাল গার্ড, খাতায় লেখা রকি ডুরেলসনের নামের পাশে একটা টিক চিহ্ন দিল। কার্ড ফেরত নিয়ে এগোল রানা, ঢুকে পড়ল ইস্ট উইং-এ। এখানে সামরিক পোশাক পরা একটা মেয়ে কার্ডটা নিয়ে আর ফেরত দিল না। 'হ্যাভ এ নাইস ইভনিং, মি. ডুরেলসন,' উজ্জ্বল হেসে বলল মেয়েটা।

'থাঙ্ক ইউ, আই য়্যাম শিওর আই উইল।'

প্রশস্ত একটা হলঘরে ঢুকল রানা, জানালার বাইরে জ্যাকুলিন কেনেডি গার্ডেন। ক্লোকরুমকে পাশ কাটিয়ে চলে এল ম্যানসনের প্রধান অংশে। এখানে কার্পেট মোড়া করিডরে মৃদু আলো জ্বলছে, দু'দিকের দেয়ালে সার সার পোর্ট্রেট ঝুলছে বর্তমান ফার্স্ট লেডির। লোকজন রয়েছে, কিন্তু খুব বেশি নয়—কয়েকজন মাত্র অতিথি, ইউনিফর্ম পরা আরও অনেক সোশিয়াল এইডস, গাঢ় রঙের স্যুট পরা দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট—বুকের কাছে কোটের ভাঁজে লাল পিন লাগানো।

হোয়াইট হাউসে এর আগে কখনও আসেনি রানা। ফ্লোর প্ল্যান দেখেছে, লোকমুখে শুনেছে কোথায় কি আছে না আছে। একজন ইউনিফর্ম পরা লোকের পাশে দাঁড়াল ও, জিজ্ঞেস করল, 'মেন'স রুম কোন্ দিকে, প্লীজ?'

'লাইব্রেরির ভেতর দিয়ে, স্যার, আপনার ডান দিকে।'

লাইব্রেরিতে ঢুকে চারদিকে ভাল করে দেখল রানা। দরজা আর জানালা বাদ দিয়ে দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি কাঁচ-ঢাকা র‍্যাকে শুধু বই আর বই। অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। কামরাটা তৈরিই করা হয়েছে আগুনের ধারে বসে গল্প-গুজব বা আলোচনা চালাবার জন্যে, যে-সব গল্প-গুজব বা আলোচনা ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেতে পারে। বিশাল কামরা জুড়ে এত দামী দামী

ফার্নিচার, এখানে বসে কেউ পড়ায় মন বসাতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো রানার। লাইব্রেরিতে ও একা। মেন'স রুমে ঢোকার পথ পুব দেয়ালে, চারজন ইণ্ডিয়ান চীফ-এর পোর্ট্রেট ঘেঁষে যেতে হয়। সবুজ একটা দরজা, পিতলের চকচকে হরফে লেখা: জেন্টলমেন।

কয়েক মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল রানা, ইউনিফর্ম পরা এইডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির ধাপ, সোনালি রেইলিং, ম্যানসনের স্টেট লেভেলে উঠে এল ও। ঢুকল সোনালি আর সাদায় ঝলমলে ইস্ট রুম-এ। আরও ঝলমলে পোশাক পরা নিমন্ত্রিত নারী-পুরুষ দলে দলে নাচছে, হাঁটাহাঁটি করছে, গল্প করছে। সবার মাথার ওপর থমথমে চেহারা নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন আর জন কুয়েন্সি অ্যাডামস। সব মিলিয়ে কয়েক শো-র কম নয়—পুরুষরা প্রায় সবাই কালো টাই পরেছে, ফুলে থাকা গাউন পরেছে মেয়েরা। এদের মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস সদস্য, ক্যাবিনেট অফিসার, বিদেশী কূটনীতিক, প্রখ্যাত জার্নালিস্ট, আর হোমরাচোমরা হোয়াইট হাউস স্টাফ। মুখ তুলে মার্থা ওয়াশিংটনের একটা পেইন্টিঙের দিকে তাকাল রানা, স্বামীর চেয়ে কম গম্ভীর নন।

একজন ওয়েটার পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে গ্লাসে স্কচ নিল রানা। পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে মোটেও কোন অসুবিধে হলো না ওর। ভদ্রতাবোধ যেখানে দাবি করে সেখানে থেমে মাথা ঝাঁকাল কখনও, কখনও মৃদু হাসল, বিখ্যাত কারও সামনে পড়ে গেলে কুশল জানতে চাইল। সুবিধে হলো, ওকে কেউ চেনে না, কিন্তু ও অনেককে চেনে। নিয়মিত টাইম আর নিউজউইক পড়ায় এই একটা লাভ হয়েছে।

বেশিক্ষণ কোথাও দাঁড়াল না রানা। প্রায় সারাক্ষণ ঘোরার মধ্যে থাকল ও। ওয়াশিংটন এমন একটা শহর যেখানে

বহিরাগতদের নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। পরিচয় নেই, কাজেই কেউ রানার দিকে মনোযোগ দিল না। কয়েকটা দলের পাশ ঘেঁষে গেল রানা, দু'একটা দলের ভেতর ঢুকে আলোচনায় অংশ নিল—বুঝল, এদের সাথে মেলামেশা না থাকলে পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। কেউ কোম্পানি বা করপোরেশনের পুরো নাম উচ্চারণ করে না, ইনিশিয়াল দিয়ে কাজ সারে। প্রখ্যাত কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ডাকনাম ব্যবহার করা হয়।

সরে এল রানা। একা হয়ে পড়ল। এরপর ওর একমাত্র কাজ হলো, সোশিয়াল এইডদের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা। ওদের দায়িত্বের একটা অংশ হলো, কেউ যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করে।

গ্রীন রুম থেকে ব্লু রুমে, সেখান থেকে রেড রুমে এল রানা। পেইন্টিং-এর সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাথে আলাপ করা অনেকটা নিরাপদ, কমবেশি সবাই তারা শিল্প বোঝে, অন্য কোন ব্যাপারে আগ্রহী নয়। প্রচুর অ্যান্টিকস দেখল রানা, সাধারণ অতিথিদের ছোঁয়া বারণ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে এল স্টেট ডাইনিং রুমে। বড়সড় একটা ভিড় জমে উঠেছে লম্বা বুফে টেবিলের সামনে। আরেকটা ভিড় বার-কে ঘিরে। ডাইনিং রুমটা এতই বড় যে আরেক ধারে কয়েকশো লোকের লম্বা একটা লাইন থাকা সত্ত্বেও প্রচুর জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ক্রস হলে যাবে ওরা, রিসিভিং লাইনে প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের সাথে হ্যাণ্ডশেক করবে। ক্রস রুম থেকে স্টেট রুমে যাওয়া যায়।

গ্লাসটা আবার ভরার জন্যে বারের সামনে থামল রানা। তারপর লাইনে দাঁড়াল। শুধু প্রেসিডেন্ট বা ফার্স্ট লেডির সাথে নয়, প্রেসিডেন্টের সম্মানিত একজন মেহমানের সাথেও হ্যাণ্ডশেক করবে ও।

*

রিসিভিং লাইনে দশ মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছেন পামেলা কনওয়ে। ক্লান্ত, অসুস্থ বোধ করলেন তিনি। মনে হলো, আরও দশ মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে তিনি জ্ঞান হারাবেন। আজ বলে কথা নয়, তাঁর জীবনে ভয়ানক একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে বলেও নয়, রিসিভিং লাইনে দাঁড়াতে চিরকালই খারাপ লাগে তাঁর। প্রতিটি মানুষের জন্যে দু'সেকেণ্ডের বেশি সময় দেয়া সম্ভব নয়, এই দু'সেকেণ্ডে একবার করে মানুষ হাসে কি করে?

না, আজ সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত নিয়ে পামেলা কনওয়ে পালিয়ে চলে এলেন ওপরতলায়। নিজস্ব পারিবারিক, ঘরোয়া পরিবেশে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সি.আই.এ. চীফের স্ত্রী মার্গারেট তাঁকে টিউলিপের শোবার ঘরে এসে খুঁজে পেল। পামেলা কনওয়ের চোখ শুকনো, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছেন, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মেয়ের নিভাঁজ বিছানার ওপর। টিউলিপ মিশিগানে যাবার আগে সাজানো হয়েছে বিছানাটা।

দোরগোড়ায় দাঁড়াল মার্গারেট। 'পামেলা?'

ফার্স্ট লেডি মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে যেমন ঘোর লাগা দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরও তেমনি ভোঁতা শোনাল। 'হাই, মার্গারেট। ভেতরে এসো।'

'এখানে তুমি কি করছ?' ঘরে ঢুকে এগিয়ে এল মার্গারেট, একটা হাত রাখল বান্ধবীর কাঁধে। 'এখানে তো তোমার থাকার কথা নয়।'

'জানি নেই, তবু বারবার শুধু মনে হচ্ছিল এখানে এলে ওকে হয়তো দেখতে পাব।'

দরদমাখা হাসি দেখা গেল মার্গারেটের ঠোঁটে, কিন্তু দৃঢ় ভাবটুকু বজায় থাকল চেহারায়। 'এসো, আমার সাথে এসো।

নিজেকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'জানি।' পাশের ঘরে যাবার বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন পামেলা। 'মিসেস কেনটারকিও হলরুমে থাকতে চেয়েছে, এখানে আসতে তার খারাপ লাগে।'

'কেমন আছে মিসেস কেনটারকি?'

'শরীর ভাল। কিন্তু সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।' চোখ বুজলেন পামেলা। 'মার্গারেট, দোষ তো আসলে আমার···।'

'কি ছাই বকছ! তোমার দোষ হতে যাবে কি জন্যে?'

'আমি যদি মেক্সিকোয় না যেতাম, আমরা যদি টিউলিপকে মিশিগানে না পাঠাতাম···।'

'অন্য কোনভাবে কাজটা ওরা ঠিকই করত।'

'হয়তো করত না, হয়তো করার সুযোগ পেত না, কিংবা হয়তো করতে গিয়ে পারত না···।'

মাথা নাড়ল মার্গারেট। 'প্রফেশনালদের এত সহজ ভেবো না, বুঝলে! সুযোগ ওদের পেতে হয় না, সুযোগ তৈরি করে নেয়। জেফের সাথে থেকে এটুকু অন্তত জেনেছি।'

পামেলা মেনে নিতে পারলেন না। সামনের দিকে ঝুঁকে বালিশের পাশ থেকে একটা পুতুল তুলে নিলেন, হাত দিয়ে ঠিক করে দিলেন কালো চুল। 'বলতে পারো, কি করব আমি?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, যেন নিজের সাথে কথা বলছেন। 'ছবি আঁকতে পারি না, চিঠি পড়তে পারি না···।'

বান্ধবীকে আরও শক্ত করে ধরল মার্গারেট। 'কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ, আমি জানি, ভাই। হায় ঈশ্বর, এর চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না। কিন্তু, পামেলা, এ-ও সত্যি যে টিউলিপকে ওরা ঠিকই ফিরিয়ে আনবে। এই মুহূর্তে হাজার হাজার লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। জানো, সেই থেকে জেফকে আমি

বলতে গেলে দেখিইনি…'

'কিন্তু মার্গারেট, দু'দিন হয়ে গেল! এখনও ওরা কোন সূত্রই পায়নি… ।' নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না, বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন পামেলা কনওয়ে । 'কি চায় ওরা? বলে না কেন কি চায়! টিউলিপের জন্যে সব দিতে পারি আমি, স-ব… ।'

পুতুলটাকে বুকে চেপে ধরে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন ফার্স্ট লেডি ।

কয়েকশো লোকের লাইনে রানাও একজন । সম্ভবত নামটা ছাড়া আর কিছু না শুনেই প্রেসিডেন্ট ওর সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন । কিংবা হয়তো তাও শোনেননি ।

'আপনি আসতে পেরেছেন সেজন্যে আমি খুশি,' বললেন তিনি । 'ওহো, ওস্তাদের সাথে পরিচয় হয়েছে কি?'

পাশে দাঁড়ানো পক্বকেশ বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা, ইতোমধ্যে লাইনের পরবর্তী লোকের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ।

প্রখ্যাত বেহালাবাদকের চোখে চোখ রেখে হাসল রানা । 'আমার সৌভাগ্য, হের ভ্যানডেরবার্গ । আপনার সঙ্গীতের আমি একজন নগণ্য শ্রোতা–অনেক বছর ধরে ।'

হাতের ছড়ি নেড়ে মৃদু হাসল ওস্তাদ বেহালাবাদক । 'ধন্যবাদ । শুনে খুশি হলাম ।'

'সম্ভবত আমার এক বন্ধুকে আপনিও চেনেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা ।

'ইয়েস?'

'অ্যানা দিয়েত্রিচ ।'

এক মুহূর্ত রানার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল ভ্যানডেরবার্গ ।

পরমুহূর্তে তার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল । কেউ যেন বোতাম টিপে দিয়েছে, আচমকা ঘামতে শুরু করল সে । ব্যস্ত, কাঁপা হাতে রুমাল বের করে কপাল আর মুখ মুছল ওস্তাদ ।

'আমরা সম্ভবত পরে এক সময় কথা বলব ।'

'হ্যাঁ, কথা বলার দরকার হবে ।'

ছোট্ট করে, সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা । ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ইস্ট রুমে চলে গেল ও । অটল দাঁড়িয়ে আছে হফ ভ্যানডেরবার্গ–বরাবরের মত ঋজু ভঙ্গি, চোখ দুটো ঠাণ্ডা, চেহারায় রাজ্যের অহমিকা । সরাসরি এমনভাবে তাকিয়ে আছে, রানা যেন একটা নর্দমার কীট ।

'অ্যানা দিয়েত্রিচ,' বলল রানা । 'নাৎসী বাহিনীর সাথে আপনার যোগাযোগের মাধ্যম ।'

কামরায় আর কেউ নেই । বাইরে লাল কার্পেট মোড়া করিডরে সিকিউরিটি এজেন্ট আর মিলিটারি এইডরা রয়েছে, একটু জোরে ডাকলেই ছুটে আসবে । তবে ওরা কেউ লাইব্রেরি রুমের দিকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে নেই ।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল ভ্যানডেরবার্গ ।

রানা নিরুত্তর ।

'ইসরায়েলী?'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা । 'না, তবে আপনার কথা জানলে ধেই ধেই করে নাচবে ওরা । আপনার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ লোকের জন্যে দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে ।'

ভ্যানডেরবার্গের চেহারায় ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল । 'ইসরায়েলী যদি না হন, কে আপনি? আর কার মাথাব্যথা থাকতে পারে?'

'ইসরায়েল ছাড়াও পাইকারী হত্যা অনুমোদন করে না এমন দেশ অনেক আছে,' বলল রানা । 'তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, হাটে

আমি হাঁড়ি ভাঙছি না। কাউকে কিছু বলার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

ভ্যানডেরবার্গের চেহারায় সন্দেহের ছায়া পড়ল। 'আপনার কি ধারণা, আপনাকে আমি ভয় পাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'লোকে আপনাকে বিশ্বাস করবে, নাকি আমাকে?'

'অত দূর ব্যাপারটা গড়াবে বলে মনে করি না আমি।'

'কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে? অ্যানা বার্লিনে মারা গেছে। আর সবাইও কেউ বেঁচে নেই।'

'এতটা বিশ্বাস করা বোকামি।' সবজান্তার হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'কেউ না কেউ ঠিকই বেঁচে থাকে। কেন, আমার চেয়ে ভাল জানেন আপনি, এমনকি নাৎসী ডেথ ক্যাম্পেও কিছু লোক বেঁচে গিয়েছিল, তাই না?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল ভ্যানডেরবার্গ। বিরক্তি বা রাগে নয়, ঘৃণায়। আগুনের পাশে একটা চেয়ারে বসল সে, ঠাণ্ডা শ্বাপদের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। টান টান হয়ে আছে পেশী, শিরদাঁড়া খাড়া। পঁয়তাল্লিশ, কি তারও বেশি বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু নাৎসী স্বভাব আজও রয়ে গেছে লোকটার মধ্যে।

তার জন্যে কিছুই বদলায়নি।

'আপনি কি জানেন বলে ধারণা করেন? আমার হয়তো শোনার আগ্রহ থাকতে পারে।'

রানা দাঁড়িয়েই থাকল। লোকটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে সিগারেট ধরাল ও। 'উনিশশো আটত্রিশ সাল,' শুরু করল ও। 'আপনি তখন তরুণ একজন বেহালাবাদক, দ্রুত নাম কিনছেন, অ্যানা দিয়েত্রিচ আপনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। অ্যানা ছিল জার্মান। নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নিল, সেই সাথে পাসপোর্ট বাতিল করার অভিযান শুরু হয়ে গেল।'

ভ্যানডেরবার্গের চোখ জোড়া ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে। 'এ সব ইতিহাস। আমার, আর থার্ড রাইখের। সবারই জানা আছে।'

'সব কথা সবার জানা নেই,' বলল রানা। 'উনচল্লিশ সালের শুরুতে আপনার সাথে গোপনে অ্যানার দেখা হয়েছিল, জানে কেউ? নিজের পাসপোর্ট রক্ষা করার জন্যে এক কথায় অ্যানার শর্তে রাজি হয়ে গেলেন আপনি, জানে কেউ? ভিয়েনার শিল্পী মহলে আপনার যারা বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাদের পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি নাৎসীদের হাতে তুলে দিলেন আপনি, কেউ জানে?'

'বন্ধু-বান্ধব? ওরা কেন আমার বন্ধু-বান্ধব হতে যাবে? ওরা তো ইহুদি ছিল!' চাপা স্বরে প্রতিবাদ জানাল ভ্যানডেরবার্গ। হুঁশ জ্ঞান বোধহয় হারাতে শুরু করেছে সে।

সত্যি, তার জন্যে কিছুই বদলায়নি।

'হ্যাঁ, ইহুদি ছিল ওরা,' বলল রানা। 'আত্মগোপন করে ছিল। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো পরিবার। সবগুলোর হদিশ আপনি ফাঁস করে দিলেন। কত, আপনার মনে আছে?'

'কম বা বেশি, কি আসে যায়!'

'এখন আর তেমন কিছু আসে যায় না।'

'তখনও কিছু আসে যায়নি।'

'না। হাজার হাজার ইহুদি ধরা পড়ছিল, তার মধ্যে দু'চারটে পরিবারকে কে ধরিয়ে দিল না দিল কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়। কেউ জানল না, আপনি নাৎসী না হয়েও নাৎসীদের সাহায্য করলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঠেলে দিলেন মৃত্যুর মুখে। আসলে, মনে প্রাণে আপনি বরাবরই নাৎসী ছিলেন, বাইরে সেটা প্রকাশ করেননি, এই যা।'

'নাৎসীদের আদর্শে আমার বিশ্বাস ছিল,' এমন সুরে কথাটা বলল ভ্যানডেরবার্গ, যেন কোন ছাত্রের ভুল সংশোধন করে দিচ্ছে। 'নাৎসীরা নিজেরাও মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট ছিল। মৌলিক

অনেক গুণের অভাব ছিল তাদের মধ্যে। আরও যোগ্য লোক পাওয়া গেলে আদর্শটা বাস্তবায়িত হত।' হাত নেড়ে আক্ষেপ প্রকাশ করল সে। 'নাৎসীরা নেই। তবে, হ্যাঁ, আদর্শ কখনও মরে না–আদর্শ আছে, থাকবে। কিন্তু, আপনি? আপনি কে? এত কথা জানলেন কিভাবে? কে আপনাকে বলতে পারে! ত্রিশ বছরের বেশি হলো মারা গেছে অ্যানা।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রানা বলল, 'অ্যানা দু'বছর আগে মারা গেছে। আত্মহত্যা। বার্লিনে নয়, ব্রাজিলে। মারা যাবার আগে এটা সই করে গেছে সে।' কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা কিছু কাগজ বের করল ও।

ভ্যানডেরবার্গ অপেক্ষা করল, কিন্তু রানা এগিয়ে এল না। অগত্যা চেয়ার ছাড়তে হলো ভ্যানডেরবার্গকে। মন দিয়ে পড়ার দরকার হলো না, চোখ বুলিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল সে। ধীরে ধীরে মুখ তুলল রানার দিকে, চোখ জোড়া এখন আর ঠাণ্ডা নয়। ধিকি ধিকি জ্বলছে। 'কি চান আপনি?'

'নাৎসীরা যা চেয়েছিল,' বলল রানা। 'আপনার সহযোগিতা।'

দ্রুত দরজার দিকে তাকাল রানা। বাইরের হলে অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠের গমগমে গুঞ্জন শোনা গেল। হলে ঢুকে আবার করিডরে বেরিয়ে এল তারা, অতিথিদের কয়েকটা দল একটু তাড়াতাড়ি বিদায় নিচ্ছে। 'ইচ্ছে করলে আপনি চিৎকার করে লোক জড়ো করতে পারেন, ভ্যানডেরবার্গ। অথবা আমার সাথে আসতে পারেন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ভ্যানডেরবার্গ। হাতের কাগজগুলোর দিকে একবার তাকাল। তারপর নিঃশব্দে রানাকে অনুসরণ করল সে, সবুজ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সিটিং রুমে। এখানে বিশাল একটা আয়না রয়েছে, দেয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক। সোজা বাথরুমের দিকে এগোল রানা।

মোজাইক করা মেঝে থেকে সিলিঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভ্যানডেরবার্গকে হঠাৎ করে ছোটখাট দেখাল। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেছে তার, চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। রানা জানে, নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। সম্মানীয় ওস্তাদকে এরই মধ্যে হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। দোতলা থেকে নির্দেশ পেয়ে যে-কোন মুহূর্তে সোশিয়াল এইড আর সিকিউরিটি এজেন্টরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পকেটে হাত ভরে ঝরনা কলমটা বের করল রানা। ক্যাপ খুলে কলমটা উল্টো করে ধরল।

সিরিঞ্জের সূঁচটা দেখল ভ্যানডেরবার্গ। ধীরে ধীরে তার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। তিক্ত একটু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। রানার দিকে তাকাল সে। চেহারায় ঘৃণা, আর চোখের দৃষ্টিতে পরাজয় না মানার জেদ। 'কি করতে চান?'

'আমি?' রানা হাসল। 'আমি কেন কিছু করতে যাব?' কলমটা ভ্যানডেরবার্গের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'ইচ্ছে করলে এটা নিতে পারেন আপনি। অথবা আমার সাথে বেরিয়ে যেতে পারেন।'

'থানায়?'

রানা কোন উত্তর দিল না।

তিক্ত হাসিটুকুও ভ্যানডেরবার্গের ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'সোয়াইন! অনার্য পশু! ঠিক আছে, জীবন দিয়েই আমি প্রমাণ করে যাব নাৎসী আদর্শের মৃত্যু নেই।' প্রায় ছোঁ দিয়ে রানার হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিল সে। হ্যাঁচকা টানে শার্টের আস্তিন ওপর দিকে তুলে দিয়ে বাহুতে সিরিঞ্জের সূঁচ ঠেকাল, রানার ওপর স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টি। সূঁচটা চামড়া ভেদ করে ঢুকে গেল ভেতরে, মুখের এক বিন্দু চামড়া কোঁচকাল না।

কোন প্রতিবাদ না, আক্ষেপ না, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি না, বুক

ফুলিয়ে মারা গেল লোকটা। টলে পড়ে যাচ্ছিল, রানা তাকে ধরে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল বাথরুমের মেঝেতে।

বারো

ধনুকের মত বাঁক ঘুরে কুয়াশা ঢাকা মেমোরিয়াল ব্রিজ পেরোল ডানিয়েল, পিছনে ফেলে এল লিংকন মেমোরিয়াল। ব্রিজ পেরিয়ে এসে লোয়ার হেডলাইট জ্বেলে দিল সে, দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়েতে গাড়ি তুলল। মাত্র দু'একটা গাড়ি রয়েছে রাস্তায়। ভোর, পাঁচটা এখনও বাজেনি।

পার্কওয়ে ধরে এক দেড় মাইল এগোবার পর বাদামী আর সাদা সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ল, ডান দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল গাড়ি। গাছপালার ভেতর দিয়ে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে চওড়া ফুটপাথে ঘেরা একটা পার্কিং লটে। গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল ডানিয়েল, নেমে পড়ল।

লটে আর কোন গাড়ি নেই, চারদিকে নিস্তব্ধতা আর কুয়াশা। সরু একটা পথ ধরে এগোল ডানিয়েল, কাঁকর ছড়ানো। পথের দু'পাশে সার সার পাইন গাছ। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সামনে দেখা গেল বিশাল একটা পাথুরে কাঠামো। এল.বি.জে. মেমোরিয়াল গ্রোভ।

পাথরের তৈরি একটা বেঞ্চে অপেক্ষা করছিল কর্নেল অবসন। তারপাশে, মাঝখানে একটু দুরত্ব রেখে, বসল ডানিয়েল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানার সাথে যোগাযোগ করো,' বলল

অবসন। 'কি করছে, কখন করছে, সব আমি জানতে চাই।'

ডানিয়েল গম্ভীর হয়ে গেল। 'এটা সে পছন্দ করবে না, স্যার।'

'জানি,' প্রায় ধমকের সুরে বলল অবসন। 'কিন্তু তার পছন্দ না হলেও আমাকে সব জানতে হবে। তাকে বলো, প্ল্যান প্রোগ্রাম নিজেই সে করতে পারবে, কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে আগেই ধারণা দিতে হবে আমাকে। তোমার মাধ্যমে।'

সিগারেট ধরাল ডানিয়েল। 'এ-সব কথা এখন বলে কোন লাভ আছে? বোধহয় দেরি হয়ে গেছে।'

অবসনের চেহারায় উদ্বেগের ছায়া পড়ল।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা আঙুলের টোকা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল ডানিয়েল। 'এই মাত্র রানার কাছ থেকে এলাম আমি,' বলল সে। 'আপনি জানেন, কাল রাতে হোয়াইট হাউসে গিয়েছিল ও?'

'রানা? হোয়াইট হাউসে?'

মাথা ঝাঁকাল ডানিয়েল।

'আশ্চর্য! ম্যানেজ করল কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডানিয়েল। 'আর সব যেভাবে ম্যানেজ করে। আমার ধারণা, অন্য কারও ভূমিকা পালন করছিল। মেহমানদের একটা তালিকা চায় সে, যোগাড় করে দিই। সে যাই হোক, ওখানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। হফ ভ্যানডেরবার্গ মারা গেছেন।'

চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে অবসন।

'হার্ট অ্যাটাক,' আবার বলল ডানিয়েল, অবসনের পেশীতে ঢিল পড়ল একটু। 'নাকি বলা উচিত সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক?'

অবসনের চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। 'তুমি কি বলতে চাইছ, হফ ভ্যানডেরবার্গকে খুন করেছে রানা?'

'আমার তাই ধারণা।'

'হোয়াইট হাউসে?'

'একেবারে প্রেসিডেন্টের নাকের ডগায়।'

একেবারে বোবা বনে গেল অবসন। স্থির বসে থাকল সে, শুধু চোখ দুটো অস্থির। তারপরই সে বিস্ফোরিত হলো, 'ক্রাইস্ট অলমাইটি, এ আমি কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম!'

'পাগল? মাসুদ রানা?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডানিয়েল। 'আমার তা মনে হয় না। আরও কি ঘটে দেখুন, তারপর বলবেন!'

সকালের হালকা কুয়াশা কেটে যাবার পর ওয়াশিংটন থেকে ট্রেনে চড়ল রানা, গন্তব্য নিউ ইয়র্ক। কাগজ-পত্রে ওর পরিচয়, ফ্রেঞ্চ অ্যান্টিক ডিলার। নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আবার একবার পরিচয় বদল করবে–অস্ট্রিয়ান ব্যবসায়ী, বাড়ির পথে ভিয়েনার ফ্লাইটে আরোহী।

সকালের কাগজে হফ ভ্যানডেরবার্গের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে। টাইমস খবরটা গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে ছেপেছে, কিন্তু নিউজ উইক বিয়োগান্ত কাব্য রচনা করার এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ একজন মানুষ, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে মানুষের শ্রদ্ধা আর সম্মান কুড়োচ্ছিলেন, তারপর সকলের অগোচরে, নিভৃতে-নির্জন বাথরুমে ঢুকে বিদায় নিলেন–তাও আবার হোয়াইট হাউসে, ফর গডস সেক!

আসল কথাটা যদি জানত রে!–ভাবল রানা। ছোঁয়া যেত না, আগুন হয়ে উঠত কাগজগুলো।

কাগজে আরও খবর দেখল রানা। এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা শিল্পীর এ-ধরনের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে হোয়াইট হাউস থেকে। ওস্তাদকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে সামরিক পরিবহনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন

প্রেসিডেন্ট। মিলিটারি জেট এনড্রু এয়ারফোর্স বেস থেকে টেক-অফ করবে, রানার কমার্শিয়াল ফ্লাইট জে.এফ.কে. এয়ারপোর্ট থেকে টেক-অফ করার খানিক পর।

প্রেসিডেন্ট একটা অফিশিয়াল কমিটি গঠন করেছেন, ভ্যানডেরবার্গকে এসকর্ট করে দেশে নিয়ে যাবে তারা। কমিটির সদস্য হলেন অস্ট্রিয়ায় আমেরিকার প্রাক্তন দূত, বিখ্যাত একজন আমেরিকান বেহালাবাদক, এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত অপর এক ব্যক্তি, যিনি সেক্রেটারি অভ স্টেটস-এর সমান পদমর্যাদা সম্পন্ন হবেন।

জেটে আরও একজন বিশিষ্ট আরোহী থাকবে, আপনমনে হাসতে হাসতে ভাবল রানা। ছোট, কিন্তু বিশিষ্ট, আর সব আরোহীদের চেয়ে যার গুরুত্ব অনেক বেশি।

আজ সারাটা দিন শুধু বারবার হফ ভ্যানডেরবার্গের কথা ভাবছেন জেফ রিকার্ড। সরকারি দায়িত্বের প্রেক্ষিতে বিচার করলে, ব্যাপারটা তাঁর জন্যে কোন উদ্বেগের বিষয় নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন তিনি। কারণটা কি জানা নেই। সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অথবা সময়ের তাৎপর্য···।

সময়! ওহ্ গড!

সামনের দিকে ঝুঁকে একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

'ইয়েস, স্যার?'

ইন্টারকমে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন রিকার্ড, 'লাইনে হোয়াইট হাউস ফিজিশিয়ানকে চাই। পিকেরিংকে বলো, এই মুহূর্তে আমার সাথে দেখা করতে হবে।'

ফোনে কথা বলছেন সি.আই.এ. চীফ, দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল পিকেরিং, রীতিমত হাঁপাচ্ছে। ওঅর রূমে ছিল সে, এলিভেটরের জন্যে দেরি না করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছে।

চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

'সম্ভব তাহলে, কেমন?' রিকার্ড বললেন। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। এটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডেপুটির দিকে ফিরলেন তিনি। চশমার ভেতর চোখে উত্তেজনার ঝিলিক। 'তোমাকে একটা থিওরি দিই, পিকেরিং। আমার ধারণা, ভ্যানডেরবার্গকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন করা হয়েছে!' হাঁ হয়ে গেল পিকেরিং। 'কিন্তু কেন?'

'মিলিটারি ট্রান্সপোর্টের সুবিধে কাজে লাগাবার জন্যে। সবাই জানে, কাস্টমস মিলিটারি ট্র্যান্সপোর্ট সার্চ করে না।'

'ও মাই গড!' পিকেরিং মাথায় হাত দিল।

পিকেরিং কখন মাথা থেকে হাত নামাবে, সে অপেক্ষায় বসে থাকলেন না রিকার্ড। 'আমাদের ভিয়েনা স্টেশন চীফকে সতর্ক করে দাও, ইমিডিয়েটলি,' নির্দেশ দিলেন তিনি। 'তাকে বলো, সব কাজ ফেলে সমস্ত মনোযোগ এই কাজে ঢালতে হবে। অস্ট্রিয়ার প্রপার অফিশিয়াল এবং প্রতিবেশি দেশগুলোকেও অ্যালার্ট করে দাও। সমস্ত কিছু যেন কাভার করা হয়–এয়ারপোর্ট, রেলরোড স্টেশন, সীমান্ত–প্রতিটি ফাঁকের প্রতিটি ইঞ্চি।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল পিকেরিং। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'স্যার, আমাকে যেতে দিন।'

'ভিয়েনা তোমাকে আমি কি করে পাঠাই! তোমাকে আমার এখানে দরকার।'

'এখানের চেয়ে ওখানেই আমাকে বেশি দরকার আপনার, স্যার। আমরা যে সূত্রটা খুঁজছি, এবার হয়তো পেয়ে যাব ওখানে। এত বড় একটা দায়িত্ব একজন স্টেশন চীফকে দিয়ে বসে থাকা উচিত হবে না। তা সে যত যোগ্যই হোক না কেন।'

জেফ রিকার্ড ইতস্তত করতে লাগলেন। তারপর, সিদ্ধান্ত

নিয়ে, একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। 'এনড্রু-র সাথে যোগাযোগ করো,' ইন্টারকমে নির্দেশ দিলেন। 'ত্রিশ মিনিটের মধ্যে একটা প্লেন রেডি করতে হবে, ভিয়েনায় যাবে। একটা হেলিকপ্টারকেও স্টার্ট নিতে বলো।'

'আপনার জন্যে, স্যার?'

'না, হেনরি পিকেরিঙের জন্যে।'

শহরে সন্ধ্যা নামছে। ভিয়েনার সোয়েস্যাত এয়ারপোর্টের চারদিকে যানবাহনের অসম্ভব ভিড়। আস্তে-ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে ডানিয়েল, দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেয়ার সময় নয় এটা।

এয়ারপোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ একটা গাড়ি-পথের দিকে বাঁক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। উপযুক্ত কাগজ-পত্র ছাড়া যে-কেউ এখানে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে পারে না। ভেতরে ঢুকে গাড়ি একবার মুহূর্তের জন্যে থামাল সে, সশস্ত্র গার্ডকে কার্ড দেখাল।

কংক্রিট অ্যাপ্রনে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকান জেট, টার্মিনাল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে। টারমাকে বেশ কিছু লোক রয়েছে, তাদের কাছাকাছি গাড়ি থামাল ডানিয়েল। নিচে নেমে শবযানের দরজা খুলল।

এরপর পিছিয়ে এল ডানিয়েল, অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ভাঁজ খুলতে খুলতে প্লেনের পেটের কাছে উঠে গেল ব্যাগেজ লিফট। আরোহীরা নামতে শুরু করল, ওদিকে চারজন ইউনিফর্ম পরা লোক ধরাধরি করে কফিনটাকে তুলে দিল লিফটে। কফিনের সাথেই নেমে এল তারা। কফিনটা বয়ে নিয়ে এল শবযানের কাছে।

ব্যাগেজ কর্মীরা আর যাই হোক, গোয়েন্দা নয়। এর আগে ওদের কেউ যদি কোন শবযানের ভেতরটা দেখেও থাকে,

খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু তাদের মনে থাকার কথা নয়। মেঝেতে একটা ফাঁক আছে বটে, কিন্তু জানা কথা গাড়ির ঝাঁকিতে ভারী কফিনটা যাতে উল্টে বা কাত হয়ে না পড়ে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

পিছনের দরজা বন্ধ করল ডানিয়েল, হুইলের পিছনে উঠে বসল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে পুলিস এসকর্টের পিছু নিল সে। ড্যাশবোর্ডের তলায় একটা বোতাম রয়েছে, হাত বাড়িয়ে চাপ দিল সেটায়। তার পিছনে খুলে গেল তালাগুলো। কফিন আর তার নিচে আলাদা কমপার্টমেণ্ট এখন আর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত নয়।

এসকর্ট কারের পিছু পিছু ভিয়েনার রাস্তা ধরে এগোল শবযান। গন্তব্য শহরের মাঝখানে একটা সরকারী শবাগার। জায়গাটা দানিয়ূব নদী আর স্টিফেন'স ক্যাথেড্রালের কাছাকাছি। কফিনটা যখন তোলা হলো, ডানিয়েল ছাড়া আর কেউ লক্ষ করল না যে আগের সেই ফাঁকটা আর নেই। শবযান এখন সম্পূর্ণ সমতল।

সিঁড়ি বেয়ে কফিনটাকে তুলে নিয়ে গেল লোক চারজন, আর সবার সাথে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল ডানিয়েল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরে এল সে, কেউ তেমন খেয়াল করল না। খানিক পর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে শিন্ধ এলাকায় ঢুকল গাড়ি। আরও দশ মিনিট পর ডান দিকে গ্যারেজটা দেখতে পেল। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডানিয়েল। পিছনে ঝপাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল গেট। মাথার ওপর জ্বলে উঠল নগ্ন একটা বালব্।

গাড়ির পিছন থেকে সামনে চলে এল একটা মেয়ে। যুবতী, কালো চুল। মিষ্টি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'নাহ্।' গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটার হাতে চাবি দিল

ডানিয়েল। 'গোলাপ কুঁড়ি এখন সম্পূর্ণ তোমার দায়িত্বে,' বলল সে। 'চলি, আমাকে আবার প্লেন ধরতে হবে।'

একই এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল রানার কমার্শিয়াল প্লেন, এক ঘণ্টা পর। টার্মিনাল থেকে বেরুবার সময় পকেট থেকে পার্কিং কার্ড বের করল ও, অস্ট্রিয়ান পাসপোর্টের সাথে এটাও ওর হস্তগত হয়েছে। পার্কিং লট থেকে নীল ফোক্সওয়াগেনটা খুঁজে নিল ও, ফ্লোরম্যাটের তলায় পেল চাবি।

শহর ভিয়েনাকে এড়িয়ে গ্রিনজিং গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটল গাড়ি, তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে ভিয়েনা উড নামে পরিচিত বনভূমিতে ঢুকে পড়ল। পাসপোর্টের সাথে খুদে একটা ম্যাপও পেয়েছে রানা, কাজেই বড় রাস্তা ছেড়ে সরু পথে আসতে কোন অসুবিধে হলো না। চারদিকে গভীর জঙ্গল, পথ থেকে কটেজটা দেখা যায় না। সেটাকে ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেল রানা, তারপর আরও সরু একটা পথে ঢুকে গাড়ি থামাল। বড় রাস্তা ছাড়ার পর একটা গাড়িও চোখে পড়েনি। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে কটেজের সামনে চলে এল ও।

ভেতর থেকে একটা দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় একটা মেয়ে। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু মোটা নয়। চুল দেখে তাকে চিনতে পারল রানা। পরনে সেদিনের কালো পোশাক নেই, বদলে রয়েছে বাদামী স্ল্যাকস, আর সাদা সোয়েটার। সেই কালোকেশী।

তেরো

পথ দেখিয়ে রানাকে দোতলায় নিয়ে এল কালোকেশী। ঘরে ঢুকে

ডবল খাটের ওপর নরম বিছানা, বিছানার পাশে টেবিলে একটা ল্যাম্প দেখল রানা। বিছানার এক ধারে শুয়ে রয়েছে পা'জামা পরা ছোট্ট একটা ছেলে। তার হাতে সূচ বেঁধানো, টিউবের আগায় ফিট করা, টিউবটা একটা ঝুলন্ত বোতলে গিয়ে ঢুকেছে। তরল গ্লুকোজের সাথে ভিটামিন আর মিনারেলস মেশানো হয়েছে, অজ্ঞান হলেও, টিউলিপ কনওয়ের খোরাক দরকার।

রানার পিছন থেকে উঁকি দিল কালোকেশী। 'বলুন।'

উত্তর না দিয়ে টিউলিপকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। বোঝার উপায় নেই এই মেয়েকেই মিশিগান থেকে চুরি করা হয়েছে। কোঁকড়ানো কালো চুল গায়েব হয়েছে। চুলগুলো এখন সমান, ছেলেদের মত করে কাটা, লম্বা হয়ে নেমে এসে বেশ খানিকটা ঢেকে ফেলেছে কপাল।

'কি হলো?'

'চমৎকার,' মন্তব্য করল রানা। ছেলের কাপড় পরালে অনায়াসে নিজের ছেলে বলে চালানো যাবে টিউলিপকে। পালস আর নিঃশ্বাস পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকল রানা। তারপর সিধে হয়ে বলল, 'ওকে আরও একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে।'

ইঙ্গিতে টেবিলটা দেখাল কালোকেশী। টেবিলে একটা হাইপোডারমিক কিট দেখল রানা।

'এভাবে কত দিন ওষুধ দিয়ে রাখা যাবে?' কালোকেশী জিজ্ঞেস করল।

'আরও দু'চার দিনে কোন অসুবিধে হবে না।' ঘুরে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ডাগর নীল চোখ, লাবণ্যমাখা তাজা মুখ, হলুদাভ মাখনের মত রঙ গায়ের। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে আজ আবার ভাবল রানা, ৩৬-২৪-৩৬?

'কি দেখছেন?' ঠোঁট নয়, যেন কমলার কোয়া–নড়ে উঠল। চেহারায় সারল্য, যেন কিছুই বোঝে না। রানা জানে, ওটা ভান।

'কি নামে ডাকব তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জিনা,' মধুর হেসে বলল কালোকেশী। 'জিনা উইলিয়ামস।'

'পাসপোর্টগুলো তোমার কাছে?'

'নিচের তলায়। দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। হলরুমে ঢুকল। পাথুরে ফায়ারপ্লেসে আগুন নিভু নিভু। আলো জ্বালল জিনা। দেরাজ থেকে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল।

এনভেলাপের ভেতর তিনটে পাসপোর্ট পেল রানা। বাবা, মা, এবং ওদের চার বছরের পুত্র সন্তানের জন্যে। উইলিয়ামস পরিবার সেন্ট লুই, মিসৌরি-তে বাস করে। সুখী একটা পরিবার, ইউরোপে ছুটি কাটাতে এসেছে।

এনভেলাপের ভেতর থেকে আরও কাগজ বের করল রানা। সেগুলোর মধ্যে ফোক্সওয়াগেনের রেন্টাল ফর্ম-ও আছে। সব পরীক্ষা করে আবার এনভেলাপে ভরে রাখল ও। 'আমার জিনিস-পত্র?'

'যা যা দরকার সব আপনি বেডরুমে পাবেন,' বন্ধ একটা দরজার দিকে তাকাল জিনা।

'বেডরুম কি...'

'হ্যাঁ,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল জিনা, লালচে হয়ে ওঠা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল। 'একটাই।'

'গুড...।'

ঝট্ করে ফিরল জিনা। 'জ্বী?'

'রঁদেভো?' জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাল বাদে পরশু, সেমেরিং পাস-এর কাছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'তারমানে সীমান্ত না পেরোনো পর্যন্ত

আমাদের কিছু করার নেই?'

'না।'

'তোমার বুঝি তাই ধারণা?'

মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারমানে?' গলা একটু রানার দিকে লম্বা করল মেয়েটা, চোখে শাসন।

'দুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে, বাইরে মুখ দেখানো চলবে না, একটাই বেডরুম, আমার বয়স একশো দশ নয়, তুমিও কচি খুকী নও, কাছে-পিঠে আইনের লোক নেই–তারপরও তুমি ভাবো আমাদের কিছু করার থাকবে না?'

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড বোকার মত তাকিয়ে থাকল জিনা, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। সমস্ত ভান উবে গেল চেহারা থেকে। নাচের ভঙ্গিতে জ্যান্ত, অস্থির হয়ে উঠল শরীর। হাসি থামতে ছোট্ট একটা মন্তব্য করল সে, 'দুই পাজিতে জমবে কিন্তু ভাল।'

সরকারি শবাগারের পরিচালক সসম্মানে বো করল, সরে গিয়ে পথ করে দিল আমেরিকান অফিসারকে। মনে মনে ভাবল, লোকটা শিল্পীর ব্যক্তিগত বন্ধু কিনা কে জানে। আমেরিকান অফিসারের পরিচয় জানা নেই তার। পররাষ্ট্র দফতর থেকে এক লোক এসে তাকে শুধু বলে গেছে, মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা হের ভ্যানডেরবার্গকে দেখতে আসবেন, তার সাথে যেন সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়।

চ্যাপেল্ থেকে বেরিয়ে গেল পরিচালক। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল হেনরি পিকেরিং। বড়সড় কামরা, র‍্যাকে মোমবাতি জ্বলছে। বোতাম টিপে ইলেকট্রিক আলো জ্বালল সে। দ্রুত পায়ে কাস্কেট-এর এক ধারে এসে দাঁড়াল। ওয়ালনাট আর

ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি কারুকাজ করা কাস্কেট, হফ ভ্যানডেরবার্গের শেষ বিশ্রামের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপহার। বৃদ্ধ ওস্তাদের দিকে তাকাল সে। ম্লান মুখ, চোখ বন্ধ, সাদা সাটিনে মোড়া কুশনে আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর। শুধু বেহালাটা বাস্তব মনে হলো, সতর্কতার সাথে নিষ্প্রাণ একজোড়া হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিজেকে কফিন চোর বলে মনে হলো পিকেরিঙের, একজন মানুষের সবচেয়ে অসহায় অবস্থাটা লুকিয়ে দেখতে এসেছে। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল সে। এখানে তার কাজ আছে।

কফিনের মেঝে পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকল সে। পালিশ করা কাঠে আঙুল বুলাল। কোথাও কোথাও ভাঁজ করা আঙুলের গিঁট দিয়ে টোকা মারল। কই, কিছু না। এমন কিছু নেই যা দেখে ধারণা করা চলে টিউলিপ কনওয়ে এখানে এক সময় ছিল।

অথচ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার জানা আছে। এই কাস্কেটের সাথেই কোনভাবে ছিল। তবে নিরেট প্রমাণ যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে তাকে। এমন কিছু, জেফ রিকার্ড যা সাথে করে ওভাল অফিসে নিয়ে যেতে পারেন।

আপনমনে মাথা নেড়ে পিছিয়ে এল পিকেরিং, আরেক কোণ থেকে কাস্কেটের দিকে তাকাল। হঠাৎ করেই চোখে পড়ল খুদে আঁচড়ের দাগটা। কাস্কেটের তলায় ব্রোঞ্জের সরু বর্ডার রয়েছে, দাগটা সেই বর্ডারের ওপর। ভাল করে পরীক্ষা করল পিকেরিং। একটা নয়, কয়েকটা দাগ। প্রতিটি দাগ পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরত্বে। মাপল সে। আঠারো ইঞ্চি পর পর একটা করে আঁচড়ের দাগ।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হলো তার, ক্ষীণ হাসি ফুটল চেহারায়। পকেট থেকে ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করল সে।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন জেফ রিকার্ড, উত্তেজিত। 'ওয়েল

ডান, হেনরি!' ফোনে কথা বলছেন তিনি। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফটোগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'কাজ আমি মোটেও দেখাতে পারিনি, স্যার,' ভিয়েনা থেকে বলল পিকেরিং। 'অনেক খুঁজেও ড্রাইভারের কোন হদিস বের করা যায়নি। মানে, যে লোকটা কফিন সহ গাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে...'

রিকার্ড তার ডেপুটিকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা ব্যাপারে তুমি শিওর তো? টিউলিপকে হার্স-এর ভেতর...'

'নিশ্চয়ই তাই। হাতব্যাগ নিয়ে কয়েকজন অফিসার আর কফিন ছাড়া প্লেন থেকে কিছুই নামেনি। আরেক মাথায় কফিন রিসিভ করেছে সরকারী শবাগারের পরিচালক, তার সাথে আরও ত্রিশজন লোক ছিল। আমার এখানে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত কফিনের কাছে একা থাকার সুযোগ হয়নি কারও। কোন সন্দেহ নেই হার্স-এর ভেতরই সরিয়ে ফেলা হয়েছে মেয়েটাকে, স্যার, কিন্তু ড্রাইভার লোকটা স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জেফ রিকার্ড নির্দেশ দিলেন, 'দেশটার সীমান্ত সীল করো, পিকেরিং। ওখানে আমাদের লোক আছে, প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে সবাইকে ডেকে নাও। ওদের ব্রিফিং করো, কি খুঁজতে হবে আভাস দাও।'

'জ্বী, স্যার। এরইমধ্যে ইউরোপে আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট যারা আছে তাদের অর্ধেকের বেশি লোককে ব্রিফ করেছি আমি। টেলিফোনে, অবশ্যই।'

'অস্ট্রিয়ান?'

'সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে।'

'বর্ডার?'

'ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার আগেই সতর্ক করে দিয়েছি।'

'গুড, আবার সতর্ক করো। কোথাও কোন ত্রুটি থাকুক আমি

চাই না। এয়ারপোর্ট আর রেইল রোড?'

'লোক আছে পাহারায়।'

'গুড।' রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন জেফ রিকার্ড। বললেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে অস্ট্রিয়ায় হয়তো ঢুকতে পেরেছে ওরা, কিন্তু বাই গড, বেরুবার কোন রাস্তা পাবে না!'

অতিথি বরণ অনুষ্ঠানের শেষ পর্বটা বাগান থেকে চাক্ষুষ করলেন জেফ রিকার্ড।

ভাষণ পর্ব শেষ হলো, মেরিন ব্যাণ্ড বেজে উঠল, প্রথমটার পর বাজল দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত। রঙচঙে একটা গার্ড দু'দেশের পতাকা বয়ে নিয়ে গেল। প্লাটফর্ম থেকে নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট, পথ দেখিয়ে বেলজিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এলেন। অতিথিদের ছোট্ট একটা দলের কাছে। ডিপ্লোম্যাটিক এনট্রান্সের সামনে কালো একটা লিমুসিন অপেক্ষা করছে।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে করমর্দন করার সময় আন্তরিক হাসিতে উল্লাসিত হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের চেহারা। দু'জনের মধ্যে বৈঠক হবে, তবে বিশ্রামের জন্যে এখন ব্লেয়ার হাউসে গিয়ে উঠবেন প্রধানমন্ত্রী। পিছিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট, মুখের হাসি আগের মতই উজ্জ্বল। মিলিটারি ব্যাণ্ড বেজে উঠল, সঙ্কেত পেয়ে সচল হলো লিমুসিন। অনুষ্ঠান শেষ হলো। ঘুরে বাগানের দিকে পা বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট।

বাগানে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, মুখের হাসি নিভে গেল। যেন খসে পড়ল মুখোশ। 'জেফ, তুমি এখানে!'

প্রেসিডেন্টের সাথে হাঁটতে শুরু করে মৃদু হাসলেন জেফ রিকার্ড। রোজ গার্ডেন থেকে ওভাল অফিসের দিকে হাঁটছেন ওঁরা। 'আগেই আমি রওনা হয়ে গেছি, এই সময় তোমার মেসেজ পেলাম,' সি.আই.এ. চীফ বললেন। 'কিছু ভাল খবর বোধহয়

দিতে পারব।'

দ্রুত মুখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'আমরা জানি, টিউলিপ অস্ট্রিয়ায় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'কিভাবে জানলে?'

দ্রুত, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন রিচার্ড। প্রতিটি মুহূর্ত রিচার্ড কনওয়ের চেহারায় কি পরিবর্তন হয় লক্ষ করছেন। বন্ধুর চোখে তিনি আশার আলো দেখতে চান। একটু কৃতজ্ঞতার ছায়া। কিন্তু দেখলেন শুধু বিমূঢ় ভাব।

'লাভ এইটুকু যে,' ব্যাখ্যা শেষ করলেন রিকার্ড, 'এখন আমরা জানি কোথায় খুঁজতে হবে। আয়ত্তের মধ্যে যত ক্ষমতা আছে সব ওখানে প্রয়োগ করব আমরা।'

এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখ বুজলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার তা মনে হয় না,' বলে প্যাসেজ ধরে আবার হাঁটতে লাগলেন। 'আমি তোমাকে ডেকেছি, কারণ ওরা যোগাযোগ করেছে।'

এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন জেফ রিকার্ড। 'ওরা···কিডন্যাপাররা?'

'হ্যাঁ।'

'হোয়াট? কোথায়? ভিয়েনা থেকে?'

'বার্লিন থেকে।'

'বার্লিন?'

কাঁচের দরজা ঠেলে সরাসরি নিজের অফিসে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট। ভেতরে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কীথ বিউমণ্ট, সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

'দেখান ওকে,' প্রেসিডেন্ট বললেন।

প্রেসিডেন্টের ডেস্ক থেকে কি যেন একটা তুলে রিকার্ডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন কীথ বিউমণ্ট। একটা লকেট। সূ্ক্ষ্ম কাজ করা সরু সোনার চেইনের সাথে আটকানো। লকেটের গায়ে টি

হরফটা এনগ্রেভ করা রয়েছে। ধীরে ধীরে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লেন রিকার্ড। দেখামাত্র চিনতে পেরেছেন লকেটটা। তৃতীয় জন্মদিনে মার্গারেট দিয়েছিল টিউলিপকে। মুখ তুলে কীথ বিউমণ্টের দিকে তাকালেন তিনি। 'টিউলিপ কি এটা পরে ছিল···?'

মাথা ঝাঁকালেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

'এখানে ফেরত এল কিভাবে?'

'ডাকযোগে, প্রেসিডেন্টের নামে। মেইলরুম থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়। এয়ার স্পেশাল, দু'দিন আগে ওয়েস্ট বার্লিন থেকে পোস্ট করা হয়।'

'প্যাকেটে শুধু এটাই ছিল? শুধু লকেটটা?'

'না, এটাও ছিল।'

লকেটটা প্রেসিডেন্টের ডেস্কে রেখে দিয়ে কীথ বিউমণ্টের হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিলেন রিকার্ড। কাগজের লেখাটা পড়লেন তিনি, সাথে সাথে সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে। ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি।

কাগজে তিনটে মাত্র শব্দ টাইপ করা। 'অ্যারো। গোল্ডেন বার।'

'লেখাটার কি মানে আমি জানি না,' বললেন বিউমণ্ট। 'বোঝা যাচ্ছে, আপনি জানেন।'

ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রিকার্ড। তারপর ঝট্ করে প্রেসিডেন্টের দিকে মুখ তুললেন। 'তোমার সাথে একা কথা বলতে পারি? দুঃখিত, মি. বিউমণ্ট, এর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট, কীথ বিউমণ্ট নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। ডেস্ক ঘুরে এগোলেন প্রেসিডেন্ট, নিজের চেয়ারে বসলেন। উত্তেজনা আর হতাশায় পরিশ্রান্ত হয়ে

পড়েছেন। 'কোথায় ও?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'অস্ট্রিয়ায়, না জার্মানীতে?'

কথা না বলে রিকার্ড শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু ওটার মানে কি তুমি জানো!' রিকার্ডের হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, জানি বৈকি।' সিধে হয়ে বসলেন রিকার্ড। 'গোল্ডেন বার পশ্চিম বার্লিনের একটা নাইটক্লাব,' শুরু করলেন তিনি। 'নামটা যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈনিকদের দেয়া।'

'আমেরিকান সৈনিকরা ছাড়া আর কে ওটা চিনবে?'

'বার্লিনে একবার যে গেছে গোল্ডেন বার চিনবে সে।'

'আর অ্যারো?'

'সোভিয়েত সেক্টরে অ্যারো আমার এজেন্টদের একজন,' ধীরে ধীরে বললেন রিকার্ড। 'ধারণা করছি, মেসেজে বলা হয়েছে, গোল্ডেন বারে অ্যারো-কে পাঠাব আমরা, তারপর ওরা পরবর্তী চাল না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

প্রেসিডেন্ট সামনের দিকে ঝুঁকলেন। 'ফর গডস সেক, তাহলে এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক কেন? পাঠিয়ে দাও তাকে!'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়, রিচার্ড। অ্যারো একটা কোড নেম। নিশ্ছিদ্র কাভার নিয়ে আছে সে। রাশিয়ানদের ইস্ট জার্মান কমাণ্ডে হাই র‍্যাঙ্কিং মিলিটারি অফিসার।'

'গড, জেফ! একজন রাশিয়ান?'

'কম-বেশি। তার জন্ম ওমাহায়, বহু বছর আগে সি.আই.এ. তাকে রাশিয়ায় পাঠিয়েছে। আমরা তার ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করে দিই। কোন কাজে লাগানো হয়নি, কাজেই কারও সন্দেহভাজনও হয়নি। বলতে পারো, সম্পূর্ণ রাশিয়ান হয়ে ওঠে সে। সোভিয়েত মিলিটারিতে ঢোকে, একটু একটু করে ওপরে ওঠে। প্রমাণ করে, তার রাশিয়া-প্রেমে কোন খাদ নেই। শুধু ট্রেনিং পেয়ে এত ওপরে

ওঠেনি, অনেকগুলো যুদ্ধেও প্রাণ বাজি রেখে লড়তে হয়েছে তাকে। যখন দেখলাম সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, পদটাও ভারি গুরুত্বপূর্ণ, ঘরে ফসল তুলতে শুরু করলাম আমরা। হের, রিচার্ড, পূর্ব জার্মানীতে রুশ তৎপরতা সম্পর্কে খবর পাবার সে-ই আমাদের প্রধান উৎস। তার কাভার নষ্ট হবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার তো মনে হচ্ছে তার কাভার এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'নট নেসেসারিলি,' রিকার্ড বললেন। 'অ্যারো সম্পর্কে কেউ হয়তো জানতে পারে, এই কোড নেম ব্যবহার করছি আমরা। কিন্তু ওরা হয়তো জানে না অ্যারো কে।'

'গোল্ডেন বারে গেলে জানবে।'

'হ্যাঁ।'

ডেস্কের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। ঘরের ভেতরটা নিস্তব্ধ। অবশেষে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ঝুঁকিটা আমাদের নিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন রিকার্ড।

অ্যারোর কপাল মন্দ! ওঁদের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

পশ্চিম বার্লিনের পুরানো রাইখস্ট্যাগ বিল্ডিং। টপ ফ্লোরের লাউঞ্জে ঢুকল পিকেরিং। প্রাইভেট লেখা দরজাটা বন্ধ করল সে। কামরার আরেক প্রান্তে জানালার সামনে চলে এল। স্প্রী নদী আর বার্লিন প্রাচীর একটা কোণ তৈরি করেছে, বিল্ডিংটা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বার্লিন প্রাচীরের ওপারে সোভিয়েত সেক্টরও দেখা যায় খানিক দূর। গার্ড টাওয়ারের মাথায় ইস্ট জার্মান সৈনিকরা সাবমেশিন গান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুলন্ত রশি টেনে জানালার পর্দা একটু নামাল পিকেরিং।

সঙ্কেত পেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করবে অ্যারো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পিকেরিং, তার পিছনে দরজায় তালা লাগল।

গোল্ডেন বার একটা এলাহি ব্যাপার। প্রায় অন্ধকার গুহা বলা চলে। দুশো টেবিল, প্রতিটি টেবিলে একটা করে টেলিফোন আর ভয়েস পাইপ রয়েছে, বাইরে কারও সাথে কথা বলতে হলে টেবিল ছাড়তে হয় না, বা ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে গলা ফাটাবার দরকার নেই। ভিতরটা লোকে লোকারণ্য।

গোপন সাক্ষাতের জন্যে খুব বাজে একটা জায়গা, ভাবল অ্যারো। কেউ যে তার সাথে দেখা করবে, এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত সে। এখানে তাকে আসতে বলার পিছনে আর কি কারণ থাকতে পারে?

মনে মনে সাংঘাতিক অস্বস্তিবোধ করছে অ্যারো। পূর্ব জার্মানীর একজন কর্নেল, পশ্চিম বার্লিনের একটা বারে বসে কি করছে?

তবু কাভার ভাঙার ঝুঁকি নেয়নি অ্যারো। কাভারটা অটুট রাখার একটা সুযোগ এখনও আছে তার।

ভাগ্যগুণে খালি একটা টেবিল পাওয়া গেছে। ভদকার অর্ডার দিয়েছে অ্যারো।

বিশাল একটা ড্যান্স ফ্লোরের সামনে অর্ধবৃত্ত আকৃতিতে ফেলা হয়েছে টেবিলগুলো। অর্কেস্ট্রা বাজছে ফ্লোরে, পিছনে সঙ্গীতের তালে তালে নাচছে ঝলমলে ঝর্না। বয়স্ক, যুবক, সব ধরনের লোক রয়েছে বারে, প্রায় অর্ধেকই মেয়ে। ট্যুরিস্টের সংখ্যাও কম নয়।

ড্যান্স ফ্লোরের উল্টো দিকের একটা টেবিলে গিনিপিগকে

দেখতে পেল অ্যারো। জানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও অন্তত দশ-বারো জন এজেন্ট আছে সি.আই.এ-র। কে কোথায় দেখার কোন চেষ্টা করল না সে। মনে মনে ভাবল, গিনিপিগ আসলে আমার কোড নেম হওয়া উচিত ছিল।

অপেক্ষা।

কি জন্যে? কার জন্যে?

গভীর একটা শ্বাস টেনে চেয়ারে হেলান দিল অ্যারো। ডিনারটা আজ এড়িয়ে যেতে পারলে শরীরের ওপর রহম করা হত। মনে হচ্ছে পেটটা যেন সীসায় ভর্তি হয়ে আছে।

ড্রিঙ্ক নিয়ে এল ওয়েটার, সাথে সাথে বিল মিটিয়ে দিল অ্যারো। হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার দরকার হলে তখন আর সময় নষ্ট হবে না। ভদকার গ্লাসে চুমুক দিয়ে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল সে।

সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘ এক ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে তার হেনরি পিকেরিঙের সাথে। পশ্চিম জার্মানী? না। ইউরোপে আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র পশ্চিম জার্মানী, অন্তত অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বটেই। না, পশ্চিম জার্মানী টিউলিপ কনওয়েকে কিডন্যাপ করবে না।

মাথার পিছনে ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করল অ্যারো। ঠিক ব্যথা নয়, একটু যেন চাপ। উত্তেজনা, ভাবল সে। গ্লাস তুলে আরেক ঢোক ভদকা খেলো।

কুখ্যাত কোন টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন? উদ্ভট কাজ করার প্রবণতা আছে ওদের, ঝুঁকি নেয়ার দুঃসাহস আছে। কিন্তু জার্মান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো সূক্ষ্ম কোন কাজ বোঝে না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার জন্যে কমাণ্ডো স্কোয়াড পাঠাত ওরা, সামনে যে ক'জনকে পেত খুন করে রেখে আসত।

টেরোরিস্টদের ধৈর্যও খুব কম। আরও অনেক আগেই দাবিটা

কি জানিয়ে দিত। সামান্যতম সাফল্য চেপে রাখার লোক ওরা নয়।

না, ওরা নয়।

বাকি থাকে পূর্ব জার্মানী। পূর্ব জার্মানী একা এ-ধরনের কাজে হাত দেবে, ভাবা যায় না। অবশ্য রাশিয়ার প্ররোচনা আর সাহায্য পেলে করতে পারে। কিন্তু করেনি। করলে জানতে পারত সে। নাকি পাঁচিলের ওপারের বন্ধুরা বিশেষ কোন কারণে ব্যাপারটা গোপন রেখেছে তার কাছে?

ধ্যেৎ, এসব কি ভাবছি! এমনিতেই কি আর মাথা ধরেছে! চাপটা বাড়ছে। এখন ব্যথাই বলা যায়। মাথার পিছন থেকে সামনের দিকে, কপালে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের পিছনটাও কেমন যেন দপ্ দপ্ করছে তার। ওয়েটারকে ডেকে একজোড়া অ্যাসপিরিন আনতে বলবে নাকি? ভয়েস পাইপে কথা বলল সে, কিন্তু ওর ওয়েটার সাড়া দিল না।

গোল্ডেন বারের কিচেন থেকে পিছনের দরজা দিয়ে সরু গলিতে বেরিয়ে এল এক লোক। গলির মুখে অপেক্ষা করছিল তার গাড়ি। ভেতরে ঢুকে ওয়েটার'স কস্ট্যুমের ওপর একটা কোট চাপাল সে। স্টার্ট নিল গাড়ি, চলতে শুরু করল। রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা।

মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অ্যারোর। কামরার উল্টো দিকে বসা গিনিপিগের দিকে তাকাল সে, কিন্তু দেখতে পেল না মেয়েটাকে। কাউকেই সে দেখতে পাচ্ছে না আর। যেদিকেই তাকাল, ছোপ ছোপ রঙ আর আলো ছাড়া কিছুই দেখল না। অর্কেস্ট্রার আওয়াজ হাতুড়ির বাড়ি মারছে মাথার ভেতর।

যোগাযোগ করতে হবে। গিনিপিগ অন্তত জানুক। ভাঙে ভাঙুক কাভার। জানানো দরকার মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

টেবিলের টেলিফোন হঠাৎ যেন নড়ে উঠে ধরা দিল দৃষ্টিতে, তারপরই কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত বাড়াল অ্যারো, হাতড়াতে গিয়ে গ্লাস ওল্টাল। আঙুল ঠেকল রিসিভারে, খপ্ করে ধরে ফেলল সেটা।

রিসিভার কানে তোলার চেষ্টা করল অ্যারো। গিনিপিগ কোথায়, তার টেবিলের ন'র কত?

মাথার প্রচণ্ড ব্যথায় কিছুই মনে করতে পারল না সে। চিন্তা করতে পারছে না, ইচ্ছেও করছে না। ঘুম! হ্যাঁ, ঘুমাতে চায় সে। শুধু যদি টেবিলে রাখতে পারত মাথাটা, তারপর ঘুমিয়ে যেত…।

কামরার ওদিক থেকে গিনিপিগ দেখল টেবিলের ওপর ঢলে পড়ল অ্যারো, অতিরিক্ত মদ খাওয়া মাতালের মত। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সে, কিন্তু অ্যারো নড়ল না।

শান্তভাবে চেয়ার ছাড়ল গিনিপিগ, মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। দু'একটা টেবিলে থামল সে, এর-তার সাথে কুশলাদি বিনিময় করল, একটা মেয়েকে তার প্রেমিকের সাথে দেখে চোখ টিপল। গিনিপিগ সুন্দরী, বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অ্যারোর টেবিলের কাছে পৌঁছে গেল সে। টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর, যেন কৌতূহলবশত ঘুরে দাঁড়াল। 'এই যে ভাই, হ্যালো,' চাপা হাসির সাথে বলল সে, 'আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

অ্যারো নড়ল না।

'আপনি কি অসুস্থ?' অ্যারোর দিকে ঝুঁকে তাকাল গিনিপিগ। তার ঘাড়ে হাত রাখল একটা। তারপর, হঠাৎ সিধে হয়ে একজন

ওয়েটারকে ডাকল সে। 'এই, ভদ্রলোকের একটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার!'

ওয়েটার অ্যারোর দিকে ঝুঁকল, এক পা পিছিয়ে এল গিনিপিগ। গলায় হাত দিল সে। এই সঙ্কেতটা সবাই ওরা ব্যবহার করে। অর্থটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবে না।

অ্যারো মারা গেছে।

চোদ্দো

অস্ট্রিয়ান সীমান্তে পৌঁছুল ওরা।

নীল ফোক্সওয়াগেনকে অন্যান্য গাড়ির সাথে এক লাইনে দাঁড় করাল জিনা। সীমান্ত পেরিয়ে ইটালিতে যাবে গাড়িগুলো।

টিমোথি উইলিয়ামসের মার্কিন পাসপোর্ট গাড়ির কাগজ-পত্রের সাথে গ্লাভ কমপার্টমেন্টে রয়েছে। পাকাপোক্ত ভাবে তৈরি করা হয়েছে কাহিনী, নিশ্ছিদ্র। এখন সেটাকে কাজে লাগাবার সময়।

'ওঠো,' জরুরী সুরে তাগাদা দিল জিনা। 'বর্ডারে পৌঁছে গেছি আমরা।'

তার পাশে বসা লোকটা নড়েচড়ে সিধে হলো, চোখ রগড়ে সামনে তাকাল। প্রায় ঊনত্রিশ বছর বয়স তার, তাজা আমেরিকান অবয়ব, গরম-কোট পরে আছে। ছুটিতে সপরিবারে ইউরোপে বেড়াতে এসেছে।

চোখ মেলেই সতর্ক হয়ে গেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাক সীটে তাকাল, টনি উইলিয়ামস নড়াচড়া করছে না। বেচারা অসুস্থ। চিকেন পক্স। এত থাকতে এই সময়!

একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টরকে এগিয়ে আসতে দেখে স্ত্রীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল টিমোথি।

'আপনাদের পাসপোর্ট।'

মিষ্টি করে হাসল জিনা, জানালা দিয়ে গলিয়ে পাসপোর্টগুলো ধরিয়ে দিল ইন্সপেক্টরের হাতে।

একটা পাসপোর্টে চোখ বুলাল ইন্সপেক্টর, তারপর ঝট্ করে জিনার দিকে তাকাল। নিচু হলো লোকটা, পাশে বসা টিমোথিকে দেখল। সবশেষে নজর ফেলল ব্যাক সীটে।

এবার বাকি দুটো পাসপোর্টে চোখ বুলাল ইন্সপেক্টর। 'ইটালি ভিজিট করার উদ্দেশ্য, ম্যাডাম জিনা?'

ইন্সপেক্টরের চোখে নগ্ন সন্দেহ দেখতে পেল জিনা। এবং হঠাৎ করে মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল তার। চেষ্টা করল, কিন্তু মনে পড়ল না কিছু–সব ভুলে গেছে। রানার সাথে প্রশ্ন আর উত্তরের রিহার্সেল দিয়েছে, কিন্তু কিছুই স্মরণ করতে পারল না। কোথায় যাচ্ছে জানে না। কেন যাচ্ছে তাও মনে নেই।

ভাগ্যই বলতে হবে, ঠিক এই সময় একটা পিক-আপ ট্রাক দ্বিতীয় লাইনে এসে দাঁড়াল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনে বিরক্তির সাথে সেদিকে তাকাল ইন্সপেক্টর।

শুধু আওয়াজ নয়, সেই সাথে উৎকট দুর্গন্ধও।

ট্রাক ভর্তি এক পাল শুয়োর।

বড় করে শ্বাস টেনে সীটের গায়ে হেলান দিল জিনা।

কটু একটা মন্তব্য করে ঘাড় ফেরাল ইন্সপেক্টর, পাসপোর্টগুলো আবার একবার পরীক্ষা করল। 'হ্যাঁ, ম্যাডাম জিনা, ইটালি ভিজিটের উদ্দেশ্য কি আপনাদের?'

'বেড়ানো,' শান্তভাবে উত্তর দিতে পারল জিনা, মুখ টিপে একটু হাসলও। 'ছুটি কিনা, তাই বেরিয়ে পড়েছি। দক্ষিণে গাড়ি

ছোটাব–ফ্লোরেন্স দেখব, রোম দেখব··· ।'

পিক-আপ ট্রাককে ঘিরে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। কাস্টমস অফিসাররা সবাই খুব বিরক্ত। দুর্গন্ধ কার সহ্য হয়! ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট কই? কোয়ারানটাইন পেপারস?

থোঃ করে এক দলা থুথু ফেলল ইন্সপেক্টর। 'আর গাড়িটা?' জানতে চাইল সে। 'আপনাদের?'

'ভিয়েনা থেকে ভাড়া করেছি।'

'কাগজগুলো দেখান।'

ট্রাকের ড্রাইভার ক্যাব থেকে নামল। লোকটা ইটালিয়ান কৃষক, প্রৌঢ়। নোংরা ক্যাপের ভেতর থেকে ততোধিক নোংরা কাঁচাপাকা চুল বেরিয়ে আছে। পরনের কাপড়ে চিমটি দিলে নখে ময়লা ঢুকবে। ট্রাকের পিছনে চলে গেল সে, খপ্ করে একটা শূকরছানাকে ধরল। তিনজন কাস্টমস অফিসার ছেঁকে ধরেছে তাকে। ছানার পায়ে একটা মেটাল ট্যাগ রয়েছে, অফিসারদের দেখাল সেটা।

কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ আর তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকল। উইলিয়ামসদের পাসপোর্ট হাতে ইন্সপেক্টর এবার রেগে গেল। ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল সে, 'এত দেরি হচ্ছে কেন?'

একজন সাব-ইন্সপেক্টর দ্রুত কথা বলতে শুরু করল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর জানতে চাইল, 'কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'ট্যাগ লাগানো আছে?'

'জ্বী।'

'তাহলে বিদায় করো। জলদি!'

সাব-ইন্সপেক্টর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে হাত ঝাপটাল। কাঁধ ঝাঁকাল প্রৌঢ় কৃষক, গজর গজর করতে করতে উঠে পড়ল

ক্যাবে। জিনার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'প্লীজ, আপনার গাড়ির কাগজ।'

গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে কার রেন্টাল ফর্ম বের করে বাড়িয়ে দিল জিনা। 'বোধহয় ঠিকঠাকই আছে সব,' বলে আবার মিষ্টি করে হাসল সে।

কিন্তু ইন্সপেক্টরের মেজাজ ভাল নেই। 'দেখা যাক।' খুঁটিয়ে কাগজগুলো দেখছে সে, তার পিছন থেকে চলে গেল পিক-আপ ট্রাক। হঠাৎ করে চারদিক বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আবার ঝুঁকল ইন্সপেক্টর, গাড়ির ভেতরটা ভাল করে দেখছে। এবার ঘুমন্ত বাচ্চাটার ওপর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টি।

টি-শার্ট আর জিনস পরে আছে বাচ্চা। আমেরিকান টেনিস জুতো। মুখে লাল লাল দাগ।

'আপনার ছেলের মুখে ওগুলো কি, ম্যাডাম জিনা?'

'চিকেন পক্স।'

'চিকেন পক্স?' গলার আওয়াজেই বোঝা গেল, ইন্সপেক্টর বিশ্বাস করেনি। গাড়ির ওপাশের দরজা খুলে ফেলল সে। কাছ থেকে ভাল করে দেখল। তারপর আলতো করে হাত বুলাল টনি উইলিয়ামসের মুখে।

হঠাৎ সিধে হলো ইন্সপেক্টর। থমথম করছে চেহারা। 'দুঃখিত, ম্যাডাম। আপনাদের আমার সাথে আসতে হবে।'

চট্ করে একবার কাস্টমস বিল্ডিঙের দিকে তাকাল জিনা। তারপর ইন্সপেক্টরের কঠিন চোখে চোখ রাখল। 'কেন, কোথাও গোলমাল আছে?'

'এগুলো চিকেন পক্স নয়। আসুন আমার সাথে। আপনিও, স্যার। প্লীজ, বাচ্চাটাকেও সাথে নিন।'

রিসিভার আরও শক্ত করে চেপে ধরায় জেফ রিকার্ডের মুঠো সাদা

হয়ে গেল। 'কি বলছ, অ্যারো মারা গেছে!'

'ইয়েস স্যার, অ্যারো ইজ ডেড,' আবার বলল পিকেরিং। 'কেউ যেন প্ল্যানটাই করেছিল এভাবে, প্রকাশ্যে বের করে আনিয়ে খুন করবে অ্যারোকে।'

'কিন্তু কে? রাশিয়ানরা তাকে মারবে না। তার আগে তারা জানার চেষ্টা করবে কি কি তথ্য ওর কাছ থেকে পেয়েছি আমরা।'

'তাছাড়া, এভাবে প্রকাশ্যেও ওরা তাকে মারবে না।'

'তাহলে কে? অ্যারোর মৃত্যু আর কে চাইতে পারে?'

উত্তরটা সহজ। কেউ না।

রাগে, ক্ষোভে ডেস্কের ওপর দুম করে একটা ঘুসি মেরে বসলেন সি.আই.এ. চীফ। এমনকি বিস্ফোরিত কাভার নিয়ে দেশে ফিরে এলেও অমূল্য একটা সম্পদ হতে পারত অ্যারো। কিন্তু এখন সে লাশ, সি. আই. এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর আর এক ডজন ক্র্যাক এজেন্টের চোখের সামনে খুন করা হয়েছে তাকে অজ্ঞাত কারণে। অ্যারো মারা গেল, কিন্তু তারা কি প্রেসিডেন্টের মেয়ে সম্পর্কে কিছু জানতে পারল?

না।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন রিকার্ড। 'তুমি ঠিক জানো মারা যাবার আগে কেউ তার সাথে যোগাযোগ করেনি?'

'জানি, করেনি,' বলল পিকেরিং। 'পুরোটা সময় ওখানে আমি নিজে ছিলাম। ওয়েটার ছাড়া কেউ তার কাছাকাছি যায়নি।'

'ওয়েটার! ফর গডস সেক, হেনরি, বিষ যদি ভদকাতেই ছিল...'

'জানি,' কথার মাঝখানে শুকনো গলায় বলল পিকেরিং। 'ওয়েটার গায়েব। পালিয়েছে।'

হিস হিস করে উঠলেন রিকার্ড। 'ঠিক ভিয়েনায় যা ঘটেছে। অস্ট্রিয়া পুলিস বা আমাদের এজেন্টরা হার্স-এর ড্রাইভারকে

এখনও খুঁজে পায়নি।'

'একেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। নামটা পর্যন্ত জানা যায়নি, স্যার।'

'কেন, গোল্ডেন বারের লোকেরা চেনে না?'

'কিভাবে! কিচেনে ঢুকে বলল, আজ অমুকের ডিউটি, কিন্তু সে অসুস্থ, তার বদলে আমি কাজ করব–সেই আমাকে পাঠিয়েছে।'

'অমুকটি কোথায়? সে-ও কি...?'

'জ্বী, স্যার। তারও কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খবর হয়তো পাওয়া যাবে,' রিকার্ড গম্ভীর সুরে বললেন। 'কিন্তু মরা মানুষ কথা বলে না।'

'জ্বী, স্যার।'

'শোনো, হেনরি, দরকার হলে গোটা আর্মি ব্যবহার করো। ওয়েটার লোকটাকে চাই আমি। আর, জার্মানদের সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখো। কিডন্যাপাররা যদি বার্লিনে থাকে, ওদের সাথে টিউলিপও থাকতে পারে। আমরা যতই সতর্ক থাকি, ওরা সীমান্ত পেরোতে পারেনি এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি বলতে চাইছি, একই ঘটনা আবার যেন না ঘটে।'

'না, আসলে চিকেন পক্স নয়,' বলল জিনা। নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চার দিকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় টনি উইলিয়ামস এখনও ঢুলছে।

একটা ভুরু উঁচু করল ইন্সপেক্টর। 'চিকেন পক্স তাহলে নকলও হয়?'

'বলতে পারেন ছেলেমানুষি কৌতুক,' ব্যাখ্যা করল জিনা। 'টনি নিজেই ওগুলো নিজের মুখে এঁকেছে। পাকা রঙ, ধুলে যায়

না। বিশ্বাস করুন, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিনি আমরা…'

'কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি কথা বলতে কি হয়েছিল?'

'সুযোগ দিলেন কোথায়! আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম…'

'ম্যাডাম জিনা,' ইন্সপেক্টর চটে উঠে বলল, 'এখানে আমাদের কৌতুক করার মত সময় নেই। আপনি জানেন, গোটা সীমান্তকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে? পুলিস আপনার ছেলের বয়েসী নিখোঁজ একটা বাচ্চাকে খুঁজছে। আমাদের বলা হয়েছে, সন্দেহ হলে সাথে বাচ্চা আছে এমন যে-কোন লোককে গ্রেফতার করতে হবে। নকল চিকেন পক্স অবশ্যই একটা সন্দেহজনক ব্যাপার!'

বিস্ময়ে, উদ্বেগে বিস্ফারিত হয়ে উঠল জিনার চোখ।

এতক্ষণে টিমোথি উইলিয়ামস ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বলল, 'ঠিক কি বলতে চাইছেন, ইন্সপেক্টর? নিজেদের বাচ্চা কিডন্যাপ করেছি আমরা?'

'কি করেছেন না করেছেন তদন্তের পর জানা যাবে, স্যার,' ইন্সপেক্টর ঝাঁঝের সাথে বলল। 'আমি শুধু বলতে চাইছি, আপনাদের আইডেনটিটি ভেরিফাই না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারবেন না।'

টিমোথি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল। তারপর সে বলল, 'দেশে এ-ধরনের সমস্যায় পড়লে ফোন করার অধিকার থাকত আমাদের।'

'সে অধিকার এখানেও আপনার আছে।'

'তাহলে সবচেয়ে কাছের আমেরিকান দূতাবাসের লাইন পাইয়ে দিন।'

অভ্যস্ত হয়ে গেছে রানা, শুয়োরগুলোর গায়ের গন্ধ তেমন আর নাকে লাগছে না। ইটালির ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছে ও,

একটা চোখ রেখেছে রিয়ার ভিউ মিররে, অপেক্ষা করছে পিছনের রাস্তায় কখন দেখা যাবে জিনাকে।

ট্রাক ভর্তি শুয়োর নিয়ে এক ঘণ্টা হলো সীমান্ত পেরিয়েছে রানা, অথচ এখনও ফোক্সওয়াগেনের কোন দেখা নেই। গাড়ি মোটেও জোরে চালাচ্ছে না ও, এতক্ষণে ওকে ধরে ফেলা উচিত ছিল জিনার।

সন্দেহ নেই, সীমান্তে আটকানো হয়েছে ওদের।

আপন মনে হাসল রানা। ব্যাপারটা প্ল্যান মতই ঘটছে। জিনাকে নিয়ে ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে সে। মার্কিন দূতাবাস ওদেরকে আইডেনটিফাই করবে। জিনার সাথের লোকটা আসলেও টিমোথি উইলিয়ামস্–সেন্ট লুইস, মিশৌরির লোক। সি. আই.এ-তে চাকরি করে সে। বাচ্চাটা, টনি উইলিয়ামস, তারই সন্তান। অভিনয় যা শুধু খানিকটা জিনাকেই করতে হবে। রানার ধারণা, ভালই উতরে যাবে সে।

ট্রাকের গতি বাড়িয়ে দিল রানা। দেখতে ঝক্কড়মার্কা হলেও, ইঞ্জিনটা প্রায় নতুন, শক্তিশালী। এবার অন্ধ সময়ে অনেক দূর চলে যেতে পারবে ও।

ভেনিসের দক্ষিণে পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে আঁকাবাঁকা মেটো পথে নামল ট্রাক, মাঠ আর খেতের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলল। সামনে পাহাড় দেখা গেল, কাছেই একটা ঢালে খামারটা। খামারের সামনে সদ্য চষা জমি, বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা খামার, কিন্তু নির্জন।

গাড়ি নিয়ে গোলায় ঢুকে মাথা থেকে ক্যাপ আর পরচুলা খুলে ফেলল রানা। মুখে লাগানো পাতলা রাবারের আবরণ বয়সটা ত্রিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, টেনে টেনে সেগুলো খুলল ও। জোঁক স্বভাবের অ্যাডহেসিভ সরাতে খানিকটা তুলো আর এক বোতল

অ্যালকোহলের সাহায্য নিতে হলো। আয়নায় নিজের দিকে তাকাল ও–আগের চেহারার অন্য এক সংস্করণ–ইটালিয়ান কৃষকই আছে ও, তবে যৌবন ফিরে পেয়েছে। পিঠ সিধে, স্যাম গ্রেসনের মত কালো চুল।

সীট থেকে নেমে লুকানো একটা বোতামে চাপ দিল রানা। কফিন যেভাবে উন্মুক্ত হয়, খুলে গেল সীট।

ভেতরে লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমাচ্ছে টিউলিপ। মাথার চুল কোঁকড়ানো নয়, ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকানো। কুণ্ডলে ঢাকা পড়েনি কান আর কপাল। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে এখন ছেলের মত দেখাচ্ছে। পরনে রানার মতই চাষার পোশাক, মাথায় কালো চুল।

আপন মনে মাথা ঝাঁকাল রানা। টিউলিপকে যারা দেখেছে তাদের বোকা বানানো যাবে না। তবে ওকে যদি ট্রাক থেকে বের করতে হত, অচেনা কেউ দেখে টের পেত না আসলে ও ছেলে নয়, মেয়ে।

টিউলিপের শ্বাস-প্রশ্বাস আর পালস চেক করল রানা, তারপর বন্ধ করে দিল সীটের ঢাকনি। পনেরো মিনিট পর ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে এল গোলা থেকে। ট্রাকে নতুন লাইসেন্স প্লেট। পকেটে নতুন কাগজ-পত্র। এবার আর শুয়োরগুলো সঙ্গী হলো না। ওরা এখন মুক্ত স্বাধীন।

বার্লিনে যা ঘটেছে, প্রেসিডেন্টকে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন জেফ রিকার্ড। শুনতে শুনতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এল প্রেসিডেন্টের চোখ। ডেস্কের পিছনে চেয়ারে বসে আছেন তিনি, কোন নড়াচড়া নেই। উঁচু হয়ে আছে কাঁধ জোড়া, চোয়াল শক্ত, ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে আছে। সি.আই.এ. চীফ, থামলেন। চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ড্যাম ইট!' এক সময়

বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'এ তুমি কি ধরনের অপারেশন চালাচ্ছ? আমার মেয়ে আজ ছ'দিন নিখোঁজ! এই অফিসের সমস্ত ক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, বিনিময়ে কি করতে পেরেছ? কিছুই না!' দ্রুত আধ পাক ঘুরলেন তিনি। 'অথচ তোমার এক পাল লোকের সামনে টপ-সিক্রেট, ডীপ-কাভার একজন এজেন্ট খুন হয়ে গেল!' হাত দুটো মুঠো করে ঝাঁকালেন তিনি, ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করলেন। 'মাই গড! গুড-ফর নাথিং-এর দল ঘিরে আছে আমাকে! সবাই সব কিছু লেজে-গোবরে করে ছাড়ছে। প্রথমে সিক্রেট সার্ভিস, তারপর তুমি। তুমি, জেফ, এত থাকতে তুমি! ভেবেছিলাম অন্তত তোমার ওপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি!'

চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকলেন রিকার্ড। 'তুমি জানো আমার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়।'

প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে থাকলেন, চোখে আগুন ঝরছে। তারপর, ধীরে ধীরে, নরম হলো তাঁর দৃষ্টি, ঝুলে পড়ল চিবুক, ক্লান্ত ভঙ্গিতে শরীরের দু'পাশে নেমে গেল হাত জোড়া। ডেস্কের পিছনে গিয়ে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। 'কি চায় ওরা বলে না কেন! অ্যারো? বেশ তো, তাকে ওরা বাগে পেয়ে সরিয়ে দিয়েছে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন সি.আই.এ. চীফ। 'উঁহু, অ্যারো মোটিভ হতে পারে না।'

'নয় কেন? তুমি বলেছ অ্যারো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ভাইটাল...'

'বলেছি। কথাও সত্যি। অ্যারোর আসল পরিচয় জানার জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে পারে রাশিয়ানরা–এমনকি টিউলিপকে কিডন্যাপ করার ঝুঁকিও। কিন্তু রাশিয়ানরা হলে গোল্ডেন বারে ওরা শুধু অ্যারোকে আইডেনটিফাই করত। অ্যারোকে তারা বার থেকে বেরোতে দিত, ঘরে ফিরতে দিত। তারপর গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে দযেরঝিনস্কি স্ট্রীটে,

কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেত–তাকে আর সেখান থেকে ইহজন্মে বেরুতে হত না। না, রিচার্ড, কাজটা রাশিয়ানদের নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, অ্যারোর মৃত্যু আর কারা চাইতে পারে। আরও একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না। অ্যারোকে সরাতে চাইলে আরও হাজারটা উপায় ছিল, তবু এ-ধরনের জমকালো আয়োজনের দরকার পড়ল কেন? এ-সবের কোন অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

প্রেসিডেন্টের ডেস্কে মৃদু শব্দে বেল বেজে উঠল। প্রেসিডেন্ট সামনের দিকে ঝুঁকলেন। 'ইয়েস?'

'সিক্রেট সার্ভিস ডিরেক্টর আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

তিনি মুখ তুললেন, জেফ রিকার্ডের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো। 'পাঠাও।'

নিজের পিছনে দরজা বন্ধ করলেন কীথ বিউমণ্ট, এক মুহূর্ত স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর কাঁধ দুটো ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে। ওখানে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি যেন দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখে নগ্ন হয়ে ফুটে আছে পরাজয়ের গ্লানি। হাতে করে একটা বাক্স নিয়ে এসেছেন তিনি। 'আজকের ডাকে এসেছে এটা,' ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বললেন। 'জোহ্যান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।' আস্তে করে ডেস্কের ওপর রাখলেন বাক্সটা।

রিচার্ড কনওয়ে বাক্সের ঢাকনি খুললেন। এক জোড়া পা'জামা। ছোট্ট।

'মিসেস কেনটারকি ওটা চিনতে পেরেছে,' বললেন বিউমণ্ট। 'কিডন্যাপড হওয়ার সময় ওটাই পরে ছিল টিউলিপ।'

মাথা নিচু করে আছেন প্রেসিডেন্ট। বাক্সের ভেতর থেকে পা'জামা জোড়া বের করলেন, হাতে নিয়ে ভাল করে দেখছেন।

তীক্ষ্ণ ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়।

ঝুঁকে, বাক্সের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আনলেন জেফ রিকার্ড। এক কোণ থেকে উঁকি দিচ্ছিল ওটা। কাগজের লেখাটা পড়ে আবার হেলান দিলেন চেয়ারে।

কাগজে এবার চারটে শব্দ টাইপ করা। 'এগম্যান। ওল্ড সাউথ চার্চ।'

সেই একই ঘটনা আবার নতুন করে!

কাগজটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সি.আই.এ. চীফ।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

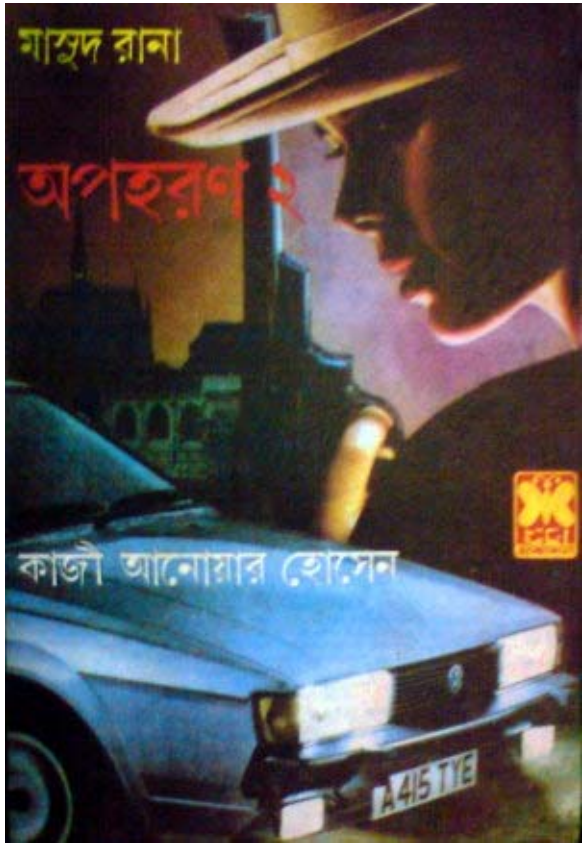

মাসুদ রানা

অপহরণ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৭

এক

পাহাড় ঘেরা বনভূমি, মাঝখান দিয়ে চওড়া পাকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। নির্জনতা-প্রিয় কিছু লোক ঘর-বাড়ি বানিয়ে বাস করে জঙ্গলে। বাড়িগুলো কাছাকাছি নয়, মাঝখানে এক-আধ মাইলের দূরত্ব।

রাস্তার পাশে বড় একটা ফাঁকা মাঠ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাঁকড়া মাথা অনেকগুলো প্রাচীন গাছ। গির্জাটা এক ধারে, দরজার মাথায় নগ্ন একটা বালব জ্বলছে।

রাস্তার এপারে, অন্ধকার জঙ্গলের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে হেনরি পিকেরিং। রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠে, একটা গাছের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে তার দৃষ্টি। গাছের পাশে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল সে। লোকটার গায়ের রঙ আর কাপড় আলাদা করে চেনার উপায় নেই। লোকটা একা, তাকিয়ে আছে গির্জার দিকে।

চোখে নাইট-গ্লাস তুলে লোকটার দিকে তাকাল পিকেরিং। গির্জার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে লোকটা, নগ্ন বালবের ম্লান আলোয় ভাল করে দেখা গেল না তাকে। তবু চিনতে পারল সে। এগম্যান-ই।

রবার্ট এগম্যান। প্রাক্তন বেসবল সুপারস্টার। সাংস্কৃতিক দল বিনিময় চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট দক্ষিণ

আফ্রিকায় পাঠিয়েছে তাকে, স্থানীয় কালোদের সংগঠন লিটল লীগ বল টীমের কোচ হিসেবে। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গদের অসন্তুষ্ট না করে কালোদের সাথে আমেরিকার একটা সুসম্পর্কের ভিত তৈরি করা। এর মধ্যে লুকোচুরির কিছু ছিল না, রাজনৈতিক কুটিলতা ততটা স্থান পায়নি।

যদিও, কেউ জানে না যে রবার্ট এগম্যান আসলে একজন সি.আই.এ. এজেন্ট। এখানে তার গোপন কাজটা হলো, চরমপন্থী নিগ্রো নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখা, আতঙ্কিত শ্বেতাঙ্গ সরকার যাদেরকে নজরবন্দী করে রেখেছে। নজরবন্দী নেতাদের সাথে বাইরের দুনিয়ার কোন যোগাযোগ থাকে না, কর্মহীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয় তাদের। ডিপ্লোম্যাটিক পাস থাকায় যেখানে খুশি যেতে পারে এগম্যান, যার সাথে খুশি দেখা করতে পারে। তাকে পেয়ে যেন চাঁদ হাতে পায় বন্দী নেতারা। মন খুলে কথা বলে। এভাবে চরমপন্থীদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত সব অনায়াসে জানতে পারে এগম্যান। এগম্যানের রিপোর্ট পেয়ে সি.আই.এ. দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে সু (?) পরামর্শ দিতে পারে। এগম্যান নিজে নিগ্রো হওয়ায় সহজেই আফ্রিকান নিগ্রোদের ভালবাসা আর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। সি.আই.এ-ও লাভবান হয়েছে, এগম্যানকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাবার পর থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের খবরাখবর আগের চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ হারে আসছে। হ্যাঁ, এজেন্ট হিসেবে এগম্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের মেয়ে টিউলিপ। বার্লিনে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেলেও, আবার ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। চোখে নাইট-গ্লাস তুলে পিকেরিং দেখল গাছটাকে পিছনে রেখে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এগম্যান। খানিক এগিয়ে থামল সে, ডানে-বাঁয়ে ভাল করে দেখে নিল। না, কাছেপিঠে কাউকে দেখল না। মাঠের ওপর

দিয়ে এবার হন হন করে এগোল সে। সোজা গিয়ে থামল গির্জার দরজার সামনে। হাত বাড়িয়ে কবাটে ঠেলা দিল এগম্যান।

খুলে গেল দরজা।

গির্জার ভেতর অন্ধকার আর অটুট নিস্তব্ধতা। দোরগোড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করল এগম্যান। ধীরে ধীরে মৃদু আলোর ক্ষীণ একটু আভা দেখা গেল এনট্রান্স হলে। সামনে বাড়ল সে, আলোর উৎস লক্ষ্য করে এগোল। গির্জা পবিত্র স্থান, তবু তার গা ছমছম করতে লাগল।

ওল্ড সাউথ একটা মেথোডিস্ট চার্চ। দেয়াল বা সিলিং থেকে ঝলমলে ঝালর বা রঙচঙে পর্দা নেমে আসেনি। শক্ত কাঠের মেঝে, সার সার গদিহীন আসন। সাধারণ একটা বেদি। বেদির ওপর সাদামাঠা ধরনের একটা সোনার ক্রুশ, একটা বাইবেল, একজোড়া মোমবাতি। দেয়ালগুলো খালি, সাদা রঙ করা। দু'দিকে লম্বা লম্বা জানালা, কিন্তু কোন জানালায় কাঁচ নেই।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করল এগম্যান। ব্যাক-আপ টীম থাকার কথা, কোথায় তারা? হেনরি পিকেরিঙের কথা মনে পড়ল তার। সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের ডেপুটি লোকটা, ডান হাত। সে-ই বা কোথায়? তাকে সে কথা দিয়েছে, শুধু গির্জার ভেতরটা নয়, বাইরেটাও কাভার দেয়া হবে। সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় সি. আই.এ-র ছয়জন এজেন্ট উপস্থিত ছিল, প্রার্থনা শেষে তারা আর বেরিয়ে যায়নি–অন্তত বেরিয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু কোথায় তারা? ঝুল-বারান্দায়? নাকি পিকেরিং তার কথা রাখেনি? হয়তো বেদির পিছনে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে, আড়াল থেকে লক্ষ রাখছে চারদিকে।

বার্লিনে যা ঘটে গেছে তারপর আর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। এ-ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছিল। কিন্তু পিকেরিং

ষোলো আনা নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, এগম্যান সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে, তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না কেউ। তাছাড়া, গির্জার ভেতর কোথাও বসে কিছু পান করতে হবে না এগম্যানকে। অ্যারোকে যেমন হয়েছিল।

পিছনের দেয়াল ঘেঁষে এগোল এগম্যান, তারপর অনেকগুলো সাইড প্যাসেজের একটা ধরে বেদির দিকে যাবার সময় জানালার সামনে মাথা নিচু করে রাখল। রাস্তা দিয়ে পুলিস প্যাট্রোল আসা-যাওয়া করে, তাদের চোখে ধরা পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই। এদিকে চরমপন্থী কালোদের তৎপরতা নতুন কোন সমস্যা নয়, প্রতি রাতেই কারফিউ জারি করা হয়। এই অসময়ে গির্জার ভেতর কালো কোন লোককে দেখলে হাতে হাতকড়া না পরিয়ে ছাড়বে না পুলিস। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকায় ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, কিন্তু পাসপোর্টের মর্যাদা বুঝতে সাধারণ পুলিসের সময় লাগবে কম করেও আটচল্লিশ ঘণ্টা।

সামনে কয়েকটা নিচু সেলফ দেখল এগম্যান, ধর্ম-সঙ্গীতের বই আর প্রসাদ রাখার জন্যে কয়েকটা পাত্র রয়েছে ওগুলোয়। এখান থেকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে বেদির দিকে। সিঁড়ির ধাপে একটা এনভেলাপ দেখল সে।

সাদা খাম। চিঠি আকারের। ভুলে কেউ ফেলে গেছে বলে মনে হলো না। ধাপের ঠিক মাঝখানে যত্ন করে রেখে যাওয়া হয়েছে। খোলা জায়গায়, সহজেই যাতে চোখে পড়ে।

সিঁড়ির দিকে এগোল এগম্যান। এনভেলাপটা তোলার জন্যে ঝুঁকল সে। সিধে হতে যাবে, একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। ওর ডানে, উঁচু কোথাও থেকে এল।

আওয়াজটা শুনেই ঘাড় ফেরাতে শুরু করল এগম্যান, জানে, এরই মধ্যে দেরি করে ফেলেছে সে। উঁচু জানালার দিকে তাকাবার সুযোগ হলো না, কড়াৎ করে একটা বিস্ফোরণের শব্দের

সাথে ধাক্কা খেল সে।

বুলেটটা ব্রেনে ঢুকে গেল, বিস্ফোরিত হলো এগম্যানের মাথা। একদিকে ঘুরে গেল শরীরটা, তারপর কাত হয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল একটা আসনের ওপর, সেখান থেকে গড়িয়ে নেমে গেল মেঝেতে। নগ্ন কাঠ, ভেসে গেল রক্তে।

গির্জার ভেতর কাঠের সিঁড়িগুলোয় ছুটোছুটির আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু এখন আর কারও কিছু করার নেই। যে যাবার সে চলে গেছে। সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠল গমগমে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ।

বাইরে, অন্ধকার মাঠের ওপর আকাশে কালো একটা সচল ছায়া। পাহাড়গুলোর আড়াল থেকে উড়ে এসেছে ওটা। কালো আকাশের গায়ে কালো রঙ করা একটা হেলিকপ্টার। গাছগুলো থেকে অনেকটা ওপর স্থির হলো যান্ত্রিক ফড়িং, সাপের মত কি যেন একটা এঁকেবেঁকে নেমে এল সবচেয়ে উঁচু গাছটার মগডালে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই আবার সচল হলো কপ্টার। দেখতে দেখতে পাহাড়গুলোর দিকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আবার।

জঙ্গল থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল পিকেরিং। অসহায় ভঙ্গিতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাতে পিস্তল। কপ্টারটা ফিরে যাচ্ছে দেখে চট করে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল। ঠিক মাঝরাত।

বিস্ফোরিত হলো গির্জার দরজা। তার দিকে কে যেন ছুটে আসছে। না, এগম্যান নয়। গিনিপিগ।

মেয়েটা কিছু বলার আগেই পিকেরিং বুঝে ফেলল কি ঘটে গেছে। রবার্ট এগম্যান বেঁচে নেই।

□

ব্রিন্দিসি থেকে রওনা হবার পর বিশ ঘণ্টা সাগরে রয়েছে ফেরি।

ফেরিতে ওঠার টিকেট কেটেছে মাসুদ রানা, কিন্তু কেবিন ভাড়া নেয়নি। পিক-আপ ট্রাক রয়েছে, ড্রাইভিং সীটে বসে কাটিয়ে দেবে বাকি সময়টা। রেস্তোরাঁতেও ঢোকার দরকার হবে না, সাথে খাবার আছে–রুটি আর মাখন, জেলি আর পনির, এক লিটার ইটালিয়ান ওয়াইন। একান্তই যদি ঘুমাতে চায়, সীটের নিচে ওর আরোহীর মত, ট্রাকেই ঘুমিয়ে নেবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ফেরির ডেকে সার সার দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের যানবাহন। আশপাশে সঙ্গী-সাথীর কোন অভাব নেই ওর। গরীব ইটালিয়ান আর গ্রীক ড্রাইভাররাও যার যার গাড়িতে বসে রাত কাটাচ্ছে। ওপরতলায় বিলাসবহুল কেবিনে যারা ভ্রমণ করছে তারা সবাই ভাগ্যবান ট্যুরিস্ট। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, আশপাশ থেকে নাক ডাকার আওয়াজ পেল রানা। ওর চোখে ঘুম নেই। সিগারেটে টান দিতে দিতে নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবছে ও।

পোলোপোনেসাস-এর উত্তর উপকূল প্যাট্রাস-এ ভিড়বে ফেরি। সেখান থেকে পুব দিকে ট্রাক ছাড়বে রানা, পেরিয়ে যাবে কোরিন্থ ক্যানাল। এথেন্সের বন্দর পিরিয়াস-এ পৌঁছে আরেকবার পরিচয়পত্র এবং বাহন পাল্টাবে। আবার ফেরিতে চড়ে দক্ষিণে যাবে, ক্রিট দ্বীপের হেরাক্লিয়ন-এ।

ক্রিট একটা দুর্গম দ্বীপ, ওখানকার মানুষগুলো কর্কশ, বড় বেশি স্বাধীনচেতা। ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কাউকে ওরা নাক গলাতে দেয় না, তেমনি কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দও করে না। আপনমনে হাসল রানা। শহর থেকে দূরে, শহরতলিতে থাকবে ও, ট্যুরিস্ট স্পটগুলোর ধারেকাছে ঘেঁষবে না। ওকে, বা ওর সাথে গ্রাম্য কাপড় পরা বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

টিউলিপের ছদ্মবেশ একেবারে নিখুঁত হয়েছে। কেউ দেখে

মেয়ে বলে চিনতে পারবে না, প্রেসিডেন্টের মেয়ে বলে চেনা তো দূরের কথা।

সিগারেট ফেলে দিয়ে খানিকটা ওয়াইন খেলো রানা। গন্তব্যে না পৌঁছে ঘুমাতে চায় না ও। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে টিউলিপকে নিয়ে। হঠাৎ যদি ওষুধের প্রভাব কেটে যায়, সচেতন হয়ে ওঠে মেয়েটা? যদি কান্না জুড়ে দেয়?

না, জেগে থাকাই ভাল।

রঙিন নকশা কাটা ডানা মেলে এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছে বাগিচায়। সুইমিং পুল ঘিরে থাকা সার সার ফুলগাছে বসন্তের ডাকে রঙচঙে ফুল ফুটেছে, মধু আহরণে মাতোয়ারা মৌমাছিদের গুঞ্জনে দেহ-মনে পুলক জাগে। কিন্তু প্রকৃতি অপরূপ সাজে সাজলেও, হোয়াইট হাউসের কারও মনে শান্তি নেই। সিক্রেট এজেন্ট থেকে শুরু করে কর্মচারী, চাকরবাকর, কর্মকর্তা, সবাই বিষণ্ন এবং গম্ভীর। দৈনন্দিন কাজকর্ম থেমে থাকার নয়, কিন্তু গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করলে টের পাওয়া যায় উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ।

সুইমিং পুল থেকে উঠে এলেন প্রেসিডেন্ট, গা থেকে পানি ঝরছে কংক্রিট অ্যাপ্রন-এ। হালকা নীল একটা আলখাল্লায় গা ঢাকলেন তিনি। পুলের পাশে একটা টেবিল সাজানো হয়েছে। ইঙ্গিতে তিনি সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডকে কাছে ডাকলেন।

তেতে উঠেছে রোদ, শার্ট আর টাই পরে ঘামছেন জেফ রিকার্ড। রুমাল দিয়ে ঘাড়টা মুছে টেবিলের আরেক দিকে, প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বসলেন তিনি। সুইমিং পুলে প্রায়ই আসেন ওঁরা, দ্রুত খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে লাঞ্চ সারেন, তারপর ফিরে যান যাঁর যাঁর নিজের কাজে। দু'জনে এক সঙ্গে শরীর শিথিল করে নেন, খানিক বিশ্রাম পেয়ে আবার তীক্ষ্ণ আর ঝরঝরে হয়ে

ওঠে মাথা।

কিন্তু আজ আর তা হবার নয়। রোদ তেতে উঠলেও, প্রেসিডেন্টের চেহারা যেন বরফের মুখোশ। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছেন তিনি। এই মুহূর্তে রানা যদি তাঁর সামনে থাকত, ওর মনে প্রশ্নটা নিশ্চয়ই জাগত: সত্যিই কি প্রেসিডেন্ট তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করার অনুমতি দিয়েছেন?

'তুমি আমার রিপোর্ট পড়েছ,' জেফ রিকার্ড বললেন।

'হ্যাঁ, পড়েছি,' শান্তভাবে জবাব দিলেন প্রেসিডেন্ট, যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না। 'আর তাই সেক্রেটারি অভ স্টেট থেকে শুরু করে কেউই সারাটা সকাল আমার সাথে দেখা করতে পারেনি।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড।

'বলো তো, জেফ, সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় আমরা যখন রবার্ট এগম্যানের মত কোন লোককে বিদেশে পাঠাই, আমরা তার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিই, নাকি দিই না?'

'রাষ্ট্র দেয়। আমি দিই না।'

'অবভিয়াসলি!' টেবিল থেকে মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, চোখে ঠাণ্ডা আগুন ঝরছে। 'আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়ম-নীতি ভেঙে কোথায় তুমি পৌঁছুতে চাও, জেফ?'

পাল্টা দৃষ্টি হেনে জেফ রিকার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'আর যদি জিজ্ঞেস করতাম?'

'নিশ্চয়ই অনুমতি দিতাম না। ব্যাপারটা বেআইনী।'

'ঠিক তাই,' এমন সুরে কথাটা বললেন রিকার্ড যেন একজন উকিল তার পয়েন্ট সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করল। 'আর বেআইনী বলেই অনুমতির ধার ধারিনি আমি। সুযোগ পেলে সেটাকে আমার কাজে লাগাতে হয়, কারণ ছলে-বলে কৌশলে

তথ্য সংগ্রহ করা আমার দায়িত্ব। তুমিও জানো দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন আগেও আমাদের ইন্টেলিজেন্স অ্যাকটিভিটি কোন ফল দিচ্ছিল না।'

'জানি। কিন্তু আমরাও, তুমি আর আমি, আইনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, সে-কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?'

জেফ রিকার্ড চুপ করে থাকলেন। এই মুহূর্তে রানা এখানে উপস্থিত থাকলে আরও একটা প্রশ্ন জাগত ওর মনে, সত্যিই কি সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ড কে.জি.বি.-র চর?

'কি যে এক বিপদের মধ্যে ফেললে!' রেগেমেগে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, আন্দাজ করতে পারো কি ঘটবে? শুধু যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে জবাবদিহি করতে হবে তাই নয়, মিত্র সবগুলো দেশ আমাদের অবিশ্বাস করবে। তারপর আছে কংগ্রেস। ক্রাইস্ট! ওরা টের পেলে স্রেফ ক্রুশে চড়াবে–তোমাকে শুধু একা নয়, আমাকেও। অথচ লাভ কি হলো?' তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, আরও একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। 'কে আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে? কেন? কি চায় ওরা? এবং···,' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি, 'আমার টিউলিপ কোথায়?'

জেফ রিকার্ডের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এত বছরের পুরানো বন্ধুত্ব, অনেক বার অনেক বিষয়েই মতের মিল হয়নি তাঁদের। কিন্তু এবারকার মত পরিস্থিতি কখনও দেখা দেয়নি। ইনি রিচার্ড কনওয়ে নন, প্রেসিডেন্ট। রেগে আগুন হয়ে আছেন। রিকার্ড জানেন, রাগার তাঁর সঙ্গত কারণও আছে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বলপয়েন্ট পেন বের করলেন সি.আই.এ. চীফ। নার্ভাস ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করছেন ওটা। প্রথম দিকে কেন কে জানে তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়ে কিডন্যাপ হওয়ায় রিচার্ড কনওয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন নন। যাকে বলে দুশ্চিন্তায় কাতর

হয়ে পড়া, সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। এমনকি বন্ধুর রাগ দেখেও তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল, ভান নয় তো? মনের এ সব সন্দেহ কাহিল করে তুলেছিল তাঁকে।

পরে অবশ্য সন্দেহগুলো দূর হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, মেয়ের জন্যে সত্যিই অস্থির হয়ে আছেন পিতা। কিন্তু আজ আবার সন্দেহটা ফিরে এল মনে। রিচার্ড কনওয়ের প্রশ্নের ধরন বা শব্দচয়ন তাঁর ঠিক পছন্দ হলো না। 'আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে···কোথায় তুমি পৌঁছুতে চাও, জেফ?' প্রেসিডেন্ট যেন আভাসে জানতে চাইলেন, তুমি কি আমার জায়গায় উঠে আসতে চাও?

'আমি জানি না,' প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের উত্তরে বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'কে বা কারা কিডন্যাপ করেছে, কেন করেছে, কি চায় তারা, কোথায় আছে টিউলিপ–কিছুই আমি জানি না। কিন্তু,' বলে দম নিলেন তিনি, 'আমার মাথায় কিছু কিছু আইডিয়া আসছে।'

'আইডিয়া! গডড্যাম ইট! মাল্টিবিলিয়ন-ডলার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মাথায় বসে রয়েছ তুমি। কে তোমার কাছে থেকে আইডিয়া পেতে চায়? আমার ফ্যাক্টস দরকার!'

চুপ করে থাকলেন রিকার্ড, তাঁর কিছু বলার মুখ নেই। ফেডারেল গভর্নমেন্টের সমস্ত ক্ষমতা সাময়িকভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, অথচ এখন পর্যন্ত কোন তথ্য তিনি যোগাড় করতে পারেননি। একটাই বাস্তবতা, সেটাকে বদলাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্টের মেয়ে নিখোঁজ, এবং কোন সূত্র নেই যার সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করা যায়।

গোটা ব্যাপারটা অর্থহীন বলে মনে হয়। শুধু তাঁর ব্যর্থতা বাদে।

আরও কিছুক্ষণ বন্ধুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন

প্রেসিডেন্ট, তারপর হেলান দিলেন চেয়ারে। 'ঠিক আছে, বলো, শোনা যাক তোমার আইডিয়াগুলো।'

ক্ষীণ একটু স্বস্তিবোধ করলেন জেফ রিকার্ড। ফ্যাক্টের যেখানে অভাব, সেখানে কাজ চালাতে হবে আইডিয়া দিয়ে। 'প্রসঙ্গ দুটো,' বললেন তিনি। 'প্রথমে, মোটিভ। একজোড়া অমূল্য রত্ন হারিয়েছি আমরা, অ্যারো আর এগম্যান। কিডন্যাপাররা শুধু যদি ওদের দু'জনকে চেয়ে থাকে, এখনও বলি আমি, ওদেরকে পাবার আরও অনেক সহজ উপায় ছিল তাদের।'

কোন মন্তব্য না করে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট।

'কাজেই ধরে নিতে হয়,' রিকার্ড বললেন, 'শুধু অ্যারো বা এগম্যানকে নয়, আরও কাউকে বা আরও কিছু চায় ওরা। আরও কেউ মানে ওদের মত অন্য কোন এজেন্ট নয়। আরও বড় কিছু, আরও অনেক বড় ধরনের কিছু টার্গেট করেছে ওরা।' একটু থেমে নাটকীয়ভাবে আবার তিনি বললেন, 'আমার ধারণা, রিচার্ড, ওরা আমাকে চায়। আমিই ওদের টার্গেট।'

'তুমি? তোমাকে?' প্রেসিডেন্টের কপাল কুঁচকে উঠল।

'আমাকে ঠিক ব্যক্তিগতভাবে নয়,' তাড়াতাড়ি বললেন রিকার্ড। 'মনে করো, সি.আই.এ ডিরেক্টরকে। কিংবা হয়তো আরও বড় কোন টার্গেট আছে ওদের। হয়তো ওরা তোমাকে চায়।'

বরফ গলল, মুখোশ সরে গিয়ে বেরিয়ে এল আসল চেহারা, তিক্ত একটু হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের মুখে। আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

'জানি না কেন, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে আমার,' ব্যাখ্যা করলেন জেফ রিকার্ড। 'কেউ যেন ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে আমাকে। এবং আমার মাধ্যমে, তোমাকেও। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হলো, সচরাচর যে-সব সাবধানতা অবল'ন করা হয়

সেগুলো বাদ দিয়েই অসম্ভব সব ঝুঁকি নিতে বাধ্য হলাম আমরা। ঠেলে বাইরে বের করে দিলাম অ্যারো আর এগম্যানকে। উপায় ছিল না, কিডন্যাপাররা কোন উপায় রাখেনি। ওরা দু'জনেই খুন হলো, বলতে গেলে ওদের আমরা বলি দিলাম। খুন হলো, অথচ কারা খুন করল জানতে পারলাম না। আরও আশ্চর্য, টিউলিপ সম্পর্কে কোন সূত্রও আমাদের হাতে এল না। এটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগছে। কম সময় পেরোয়নি, এরমধ্যে কিছু না কিছু জানার কথা আমার। কেউ বলতে পারবে না হাত-পা গুটিয়ে আমি বসে আছি।'

প্রেসিডেন্ট চিন্তিত, কিন্তু তিনি কোন প্রশ্ন করলেন না। মনে মনে খুশি হলো জেফ রিকার্ড, আর কিছু না হোক, বন্ধুর মনোযোগ ধরে রাখা গেছে। আশা করা যায় খানিকটা সময়ও দেয়া হবে তাঁকে। আরেকবার চেষ্টা করে দেখবেন।

'কাজেই ওটা প্রথম,' বললেন তিনি, 'মোটিভ। 'উঁহুঁ, মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করবে, তা নয়। হয় আমাকে চায়, নয়তো তোমাকে। অথবা সি.আই.এ-কে পকেটে ভরতে চাইলেও আমি আশ্চর্য হব না। কে জানে, হয়তো এ-সব কিছুই নয়, ওরা আসলে সরকারের পতন চাইছে। মোটকথা, ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়, রিচার্ড।'

'তোমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ?'

'কিডন্যাপারদের একজন ইনফরমার আছে,' সাথে সাথে জবাব দিলেন রিকার্ড। 'আমাদের ভেতর কেউ একজন।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'গুড গড!'

'প্রথম আমার সন্দেহ হয় অ্যারো মারা যাবার পর,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'তারপর একই ঘটনা আবার ঘটল। ভেবে দেখো না, অ্যারো আর এগম্যানের সাথে যোগাযোগ করতে কি রকম সময় নেব আমরা, তা কি কিডন্যাপারদের জানার কথা?

বিশেষ করে অ্যারোর সাথে? তার বেলায় নিয়ম ছিল, আমরা সঙ্কেত পাঠাব, সে তার সময় এবং সুযোগ মত আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। যোগাযোগ করতে কতটা সময় লাগবে, আমরা কেউ জানতাম না। দু'ঘণ্টা? দু'দিন? অ্যারো যোগাযোগ করার পর প্রথম আমরা জানলাম, কখন গোল্ডেন বারে থাকতে পারবে সে। অথচ নির্দিষ্ট দিনে ঠিকই ওখানে ওয়েটার লোকটা ছিল! নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে–আগে নয়।

'এগম্যানের সময়ও ঠিক তাই ঘটল,' বলে চললেন জেফ রিকার্ড। 'গির্জার বাইরে, একটা গাছের মাথা থেকে গুলি করা হলো তাকে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে গাছে চড়ে অপেক্ষা করছিল খুনী, এটা সম্ভব, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। এখানেও সেই একই ব্যাপার, নির্দিষ্ট সময়ে হাজির ছিল খুনী।' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'কোইন্সিডেন্স? একবার, হ্যাঁ; কিন্তু দু'বার হয় কি করে?'

প্রেসিডেন্টের চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব। 'অবিশ্বাস্য, জেফ।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা কঠিন।'

'কে সে, তোমার কোন ধারণা আছে?'

মাথা নাড়লেন জেফ রিকার্ড। 'কাউকে আমি সন্দেহ করি না। একজন না-ও হতে পারে, হয়তো কয়েকজন মিলে সর্বনাশটা করছে। তবে যে বা যারাই হোক, এর পরের বার ঠিকই আমি ধরে ফেলব।'

তাঁর দিকে দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর তাঁর মুখের পেশীতে একটু ঢিল পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। দূরে, ওয়েস্ট উইং-এর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। একটা হাত তুলে কাকে যেন কি ইশারা করল সে।

জেফ রিকার্ডের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'তাহলে বলি, শুনে হয়তো তুমি খুশি হবে, পরের বার ঘটনাটা এখানে ঘটতে যাচ্ছে।'

ওয়েস্ট উইং-এর দরজা পেরিয়ে একজন এইড বেরিয়ে এল। এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের হাতে একটা এনভেলাপ দিল সে। অপেক্ষা না করে, দ্রুত ফিরে গেল লোকটা। প্রেসিডেন্ট কিছু ব্যাখ্যা করলেন না, শুধু এনভেলাপটা সি.আই.এ. চীফের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

এনভেলাপের ওপর পোস্টমার্কটা লক্ষ করলেন জেফ রিকার্ড। ওয়াশিংটন, ডিসি। মুখ তুলে একবার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। তারপর এনভেলাপের ভেতর থেকে বের করলেন কাগজটা।

ছোট্ট একটা চিরকুট। চারটে মাত্র শব্দ টাইপ করা।

'মেরিলিন শার্প। রোটাণ্ডা ক্লাব।'

এবার কোন বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল না। জেফ রিকার্ড যেন পাথর হয়ে গেছেন। মেরিলিন শার্প–সি.আই.এ-র আরও একজন ডীপ কাভার এজেন্ট।

'মেরিলিন শার্প,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জানি, তিনি একজন কংগ্রেস সদস্য। তাঁর সম্পর্কে আর কি জানি আমি, জেফ?'

'কংগ্রেসে আমার এজেন্ট,' বিড়বিড় করে বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'তার এই পরিচয় খুব কম লোকই জানে। তোমাকে পর্যন্ত বলিনি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'তারমানে তোমার সন্দেহই ঠিক। আমাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের মধ্যে একজন দু'মুখো সাপ আছে। গড, ওহ্ গড!'

দুই

ইলেকট্রনিক বোর্ডে সংখ্যাগুলো জ্বলে উঠছে, সেদিকে তাকিয়ে ভোটের হিসেব কষছে মেরিলিন শার্প। হাউস ফ্লোরের ওপর, গ্যালারি রেইলের মাথায় বোর্ডটা, বোর্ডের উজ্জ্বল আলোর আভায় উল্লাসিত হয়ে আছে তার মুখ। মিটি মিটি হাসি ফুটল কমনীয় চেহারায়। অনেক ভোটের ব্যবধানে জিতছে তারা।

সামনে চেম্বারের পিছনের দেয়াল, প্যাসেজের শেষ সারির একটা আসনে বসে আছে সে। তার আশপাশে দাঁড়িয়ে আছে দলীয় কংগ্রেস সদস্যরা, গভীর রাত পর্যন্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সবাই খুব ক্লান্ত, বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করছে। গলা একটু চড়িয়ে ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট সাবকমিটি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা খাড়া করে চার্চিলের বিখ্যাত বিজয় সঙ্কেত দেখাল।

জটিল কোন ইস্যু নয়, কৃষি বিল। কৃষি খাতে মোটা টাকা বরাদ্দ করা হবে, সবারই তা জানা। দীর্ঘ আলোচনা হলো, তবে কারও তরফ থেকে তেমন কোন জোরাল আপত্তি বা প্রতিবাদ উঠল না। ভাগ্যিস ভোটাররাও অনেকে জানে না, বরাদ্দ টাকার মোটা একটা অংশ মোটেও কৃষি খাতে ব্যয় করা হবে না। ওই টাকা দিয়ে কেনা হবে ট্রেনিং প্লেন, বেতন দেয়া হবে গোপন সৈনিকদের, সি.আই.এ. এজেন্ট বললে যাদের সহজেই চেনা

যায়।

হাত নেড়ে বিজয় সঙ্কেতের জবাব দিলেন চেয়ারম্যান। ইন্টেলিজেন্স কর্মকাণ্ড বজায় রাখার স্বার্থে অনেক সময়ই গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে কাঁচকলা দেখাতে হয়। কংগ্রেস যে-সব সিদ্ধান্ত নেয় জনসাধারণ ইচ্ছে করলেই সেগুলো কি জেনে নিতে পারে, জেনে নিতে পারে বিদেশী ইন্টেলিজেন্সগুলোও। কাজেই শত্রুপক্ষের কাছে কিছু গোপন করতে হলে তার কোন রেকর্ড না রাখাই উচিত।

মেরিলিন শার্প ইশারায় জানতে চাইল, চেয়ারম্যান কি চান আরও কিছুক্ষণ থাকুক সে? মাথা নাড়লেন তিনি। ইতোমধ্যে নিজের হ্যাঁ-সূচক ভোটটা দেয়া হয়ে গেছে তার, নামের পাশে ইলেকট্রনিক বোর্ডে নাম্বারটা জ্বলে উঠেছে। প্রচুর ভোটে এগিয়ে আছে সরকারি দল, ভোট দিতে যারা বাকি আছে তারা সবাই বিরোধিতা করলেও বিলটা পাস হয়ে যাবে। বিলের ত্রুটি নিয়ে যারা সমালোচনা করেছে তাদের প্রভাবিত করার এখন আর কোন দরকার নেই।

মেরিলিন শার্পের বয়স চল্লিশ পুরো হয়নি এখনও। তরুণ মেধাবীদের নতুন যে দলটা হাউসে ঠাঁই করে নিয়েছে, সে তাদেরই একজন।

আজ রাতের মত কাজ শেষ হলেও, বাড়ি ফেরার উপায় নেই। কাঁধে আরেকটা দায়িত্ব রয়েছে, রোটাণ্ডায় যেতে হবে তাকে। হেনরি পিকেরিং যোগাযোগ করেছিল।

কোট নেয়ার জন্যে ক্লোকরুমে একবার থামল সে, পুব দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে। এখানে কোন মেটাল ডিটেকটর নেই, শুধু ওপরতলার গ্যালারি দরজাগুলোয় আছে। ছোট্ট এই একটা ত্রুটি রয়ে গেছে ক্যাপিটল দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়–হঠাৎ কোন কংগ্রেস সদস্য উন্মাদ হয়ে গেলে তাকে

ঠেকাবার কোন আয়োজন রাখা হয়নি। অবশ্য এখন পর্যন্ত সে-ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি, কংগ্রেস সদস্যদের উন্মাদনা হাউসে বিতর্কের ঝড় তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

গার্ডদের পাশ কাটাবার সময় হাসল মেরিলিন, ওরা সবাই তাকে চেনে। দরজার সামনে লবিইস্টদের ভিড়, ভিড়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এলিভেটরগুলোর দিকে এগোল সে। অধিবেশন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই, লোকজন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে। চট্ করে একবার হাতঘড়ির দিকে চোখ বুলাল সে, সোয়া এগারোটা। তার জন্যে মাত্র শুরু হলো রাত। এর আগে যতবার রোটাণ্ডায় হেনরি পিকেরিঙের সাথে দেখা করেছে সে, আলোচনা শেষ হতে ভোর হয়ে গেছে। জরুরী কোন ব্যাপার ছাড়া রোটাণ্ডায় তাকে তলব করে না ডেপুটি ডিরেক্টর।

আশপাশে আর কেউ নেই, এলিভেটরের জন্যে একা দাঁড়িয়ে আছে মেরিলিন। রোটাণ্ডা বলতে আসলে দুটো জায়গার কথা বোঝায়–গুঁজ আকৃতির মাথা নিয়ে ক্যাপিটলের হলরুম, অথবা আইভি স্ট্রীটের প্রাইভেট পলিটিকাল ক্লাব। নির্দিষ্টভাবে ক্লাবটাতেই যেতে বলে দিয়েছে হেনরি পিকেরিং। মেরিলিন ক্যাপিটলে কাজ করে, রোজই যায় সেখানে। ক্লাবেরও সদস্য সে, তবে ঘন ঘন যায় না।

হেনরি পিকেরিং বারবার সতর্ক করে দিয়েছে তাকে, আমাদের দেখা হবে কেউ যেন না জানে, আর, খুব সাবধানে থেকো।

আপনমনে হাসল মেরিলিন। ডেপুটি ডিরেক্টর তাকে সাবধান না করলেও পারত। সি.আই.এ. ট্রেনিং স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নেয়া আছে তার। মাঠ-কর্মী হিসেবে পাঁচ বছর কাজ করার পর সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে অফিসার পদ নিয়ে ডেস্কে বসে। ওখানে কাজের কিছু কিছু পদ্ধতি অসন্তুষ্ট করে তোলে

তাকে। তার অভিযোগ ফেডারেল ইন্টেলিজেন্স বোর্ডকে জানায় সে, শুনানির জন্যে কংগ্রেস একটা কমিটি গঠন করে। ইন্টেলিজেন্স সাব-কমিটির সামনে মেরিলিন যে বক্তব্য রাখে, রাজনৈতিক মহলে ছোটখাট একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে সেটাও, প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়ে সে। দু'বছর পর নিজেই কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়ায়, এবং বিজয়ী হয়। ইন্টেলিজেন্স কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে তার আগ্রহ থাকায় ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট কমিটিতে জায়গা পেতেও তার কোন অসুবিধে হয়নি।

কেউ যদি সি.আই.এ-র সমালোচনা করে, তাকে সি.আই.এ-র এজেন্ট নিয়োগ করা সবচেয়ে নিরাপদ। গোটা ব্যাপারটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত, প্রমাণ ইত্যাদি সহ লিখিত অভিযোগগুলো মেরিলিনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। ইন্টেলিজেন্স সাব-কমিটি যে শুনানির ব্যবস্থা করে তার মধ্যে কোন বানোয়াট ব্যাপার ছিল না, কিন্তু মেরিলিন যে বক্তব্য রাখে সেটা তৈরি করে দেয় সি.আই.এ-র অভিজ্ঞ গবেষকরা। গোপন সরকারি ফাণ্ড থেকে টাকা পেয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায় মেরিলিন। আসলে সি.আই.এ-র কাজ কখনও ছাড়েনি সে, আগাগোড়া করে যাচ্ছে।

এলিভেটরের একটা দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল মেরিলিন। দরজা বন্ধ হতে শুরু করল। হঠাৎ একটা লোমশ হাত ঢুকল ভেতরে, সচল দরজাটাকে মুহূর্তের জন্যে থামিয়ে দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক।

চওড়া কাঁধ লোকটার, শক্ত ঘাড়। মাথায় ধূসর রঙের চুল, ম্লান নীল চোখ। মুখের বাঁ দিকে কাটা দাগ, চোখের নিচ থেকে জুলফি পর্যন্ত।

'ডানিয়েল! এখানে কি করছ তুমি?'

'তোমার সাথে কথা আছে,' শান্ত সুরে বলল ডানিয়েল। হাত

তুলে ফার্স্ট ফ্লোরের বোতামে চাপ দিল সে। 'আমার পিছু পিছু আসবে, কিন্তু মনে রেখো, আমরা একসাথে নই।'

মাথা ঝাঁকাল মেরিলিন, কোন প্রশ্ন করল না। ডানিয়েলকে চেনে সে, জানে সি.আই.এ-তে কাজ করে। ভাবল, নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।

দোতলায় থামল এলিভেটর। খুলে গেল দরজা। মেরিলিনকে পিছনে রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল ডানিয়েল। সামনে কয়েকজন গার্ডকে দেখে ঝট করে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, তারপর হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে গেল হলরুম থেকে।

গার্ডদের একজন চিনতে পারল মেরিলিনকে। বাউ করে পথ থেকে দ্রুত সরে দাঁড়াল, বলল, 'আজ অনেক রাত হয়ে গেল।'

'সবারই,' বলে মৃদু হাসল মেরিলিন, হলরুম পেরিয়ে এল করিডরে। সামনে, বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে ডানিয়েল। মেরিলিন ভাবল, প্রেস কার্ড, নাকি কংগ্রেশনাল আই.ডি., গার্ডদের কী কার্ড দেখাল ডানিয়েল? ল্যাংলিতে এ-ধরনের কার্ড তৈরি করা থাকে, দরকার হলেই পাওয়া যায়। দুটোর যে-কোন একটা সাথে থাকলে ক্যাপিটলে অবাধে ঘোরাফেরা করা যায়, রাত যত গভীরই হোক, লোকজন থাকুক বা না থাকুক।

বাঁক নিয়ে চওড়া একটা করিডরে চলে এল ডানিয়েল, দালানটার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে লম্বা হয়ে আছে। পিছু পিছু আসছে মেরিলিন, মোজাইক করা মেঝেতে তার পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল। হাউস চেম্বার থেকে একতলা নিচে রয়েছে ওরা। আশপাশে কোথাও কোন লোকজন নেই, আছে শুধু মার্বেল পাথর আর ব্রোঞ্জে তৈরি বিশাল আকারের অসংখ্য মূর্তি। মেরিলিন আন্দাজ করতে পারল, কোথায় যাচ্ছে ডানিয়েল। দালানের গভীর তলায়, ছোট একটা চেম্বারে। ক্রিপ্ট বললে সবাই

চিনবে জায়গাটা। জর্জ ওয়াশিংটনের সমাধি হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছিল ওটার। এত রাতে ক্রিপ্টে কোন গার্ড থাকবে না।

বাঁক নিয়ে একটা দরজার সামনে থামল ডানিয়েল। দরজার ভেতর প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি শ্যাফট ঘেঁষে নেমে গেছে নিচের সেলারে। নিজের মনে মাথা দোলাল মেরিলিন, ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে। এর আগেও ক্রিপ্টে নেমেছে সে, ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে গোপনে দেখা করেছে। এমন কি লোহার গেটের একটা চাবিও আছে তার রিঙে।

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে একটা করিডরে নেমে এল মেরিলিন, করিডরের দু'পাশে মসৃণ পাথুরে দেয়াল। এই করিডর ধরে দালানের মাঝখানে পৌঁছানো যায়। দেয়াল ঘেঁষে মোটা পাইপ, ঢাকনি মোড়া আণ্ডারড্রেন চলে গেছে সামনের দিকে। করিডরের শেষ মাথায় লোহার গেটটা।

গেটে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ডানিয়েল। গেটের ওপর সাদা রঙ করা দেয়াল খিলান আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরটা ক্যাথেড্রালের মত দেখতে। খিলানের নিচে লম্বা কালো একটা বাক্স, ভেলভেটে মোড়া। লিংকন ক্যাটাফ্যালক, রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেই রাখা হয় ওটা।

গেটের দিকে পিছন ফিরল মেরিলিন, ডানিয়েলের দিকে মুখ তুলল। 'কি ঘটেছে?'

মুচকি একটু হাসল ডানিয়েল। শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন। 'কিছু না।'

'কিছু না মানে?' মেরিলিনের দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে উঠল।

জবাব দিল না ডানিয়েল, যেন প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। জ্যাকেটের পকেটে হাত দুটো ভরে ঘুরে দাঁড়াল সে। মেরিলিনকে পিছনে রেখে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে। শান্ত ভঙ্গি, হাঁটার মধ্যে কোন

রকম আড়ষ্ট ভাব নেই। অবাক হয়ে তার মাথার পিছনে তাকিয়ে থাকল মেরিলিন। তারপর হঠাৎ, দ্রুত আধপাক ঘুরল ডানিয়েল।

হাসল সে, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা, কিন্তু নীলচে চোখ পর্যন্ত পৌঁছুল না। মাথার ওপর থেকে আলো পড়ায় মুখের কুৎসিত দাগটাকে মনে হলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। হাতের ছোট্ট অটোমেটিকটাকেও কদর্য লাগল।

আতঙ্কে আর অবিশ্বাসে পাথর হয়ে গেল মেরিলিন। 'ডানিয়েল! এ কি? কি করছ?'

হাসিটুকু স্থির হয়ে থাকল মুখে, গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, 'নির্দেশ আছে তোমাকে আমার খুন করতে হবে।'

হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেরিলিন। জানে ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। কিন্তু ডানিয়েল! দু'জনেই ওরা সি.আই.এ. এজেন্ট!

মেরিলিনের হাত দুটো কোটের পকেটে আরও একটু ঢুকে গেল। 'হেনরি পিকেরিং তোমাকে পাঠায়নি।'

'কে পাঠিয়েছে সেটা বড় কথা নয়,' বলে সেফটি ক্যাচ নামাল ডানিয়েল, নিস্তব্ধ লম্বা করিডরে ক্লিক শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল। 'কেউ একজন তো নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে। বড় কথা হলো, তোমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। জানি না কেমন লাগছে তোমার, আমার কিন্তু খারাপই লাগছে। ক্যারিয়ারের শুরুটা তুমি ভালই করেছিলে, আরও অনেক ওপরে উঠতে পারতে। আমি দুঃখিত, বিলিভ মি। কিন্তু নিয়তিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না, বুঝলে। তবে তোমাকে আমি কয়েক সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, পাপ-টাপ করে থাকলে প্রার্থনা করার এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

প্রার্থনা নয়, দ্রুত কয়েকটা ঘটনার কথা স্মরণ করল মেরিলিন। অ্যারো নামে একজন লোক বার্লিনের গোল্ডেন বারে খুন হয়েছে। আরেকজন লোক, এগম্যান, মারা গেছে আফ্রিকার এক চার্চে। আজ তার পালা। এখানে, ক্যাপিটল রোটাণ্ডা থেকে

দো'তলা নিচে।

মৃদু হাসল মেরিলিন, ভান করল যেন ভয় পায়নি। 'তুমি যে একটা কী, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছ!' পকেট থেকে বাঁ হাতটা বের করে নাড়ল সে। 'খেলনাটা সরাও এবার, অনেক হয়েছে! হেনরি পিকেরিং যদি শোনে তুমি আমার সাথে এ-ধরনের রসিকতা করেছ...'

হো হো করে হেসে উঠল ডানিয়েল। 'হলিউডে যাওনি কেন?' হঠাৎ হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'সেখানেও তুমি প্রতিভার ছাপ রাখতে পারতে।'

এবার চোখ রাঙাল মেরিলিন। 'আমি কিন্তু চিৎকার করব, ডানিয়েল! এখনও বলছি, খেলনাটা সরাও!'

ডানিয়েলের চোখ কুঁচকে গেল, নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তোমাকে আর সময় দেয়া গেল না, মেরিলিন।' পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে দিল সে।

গুলি করল মেরিলিন।

কোটের পকেট থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল বুলেট, সোজা ঢুকে গেল ডানিয়েলের বুকে। পিস্তল পেঁচিয়ে থাকা আঙুলগুলোয় ঢিল পড়ল। মুখের ভাব বদলে গিয়ে হাস্যকর ভাঁড়ামির ভঙ্গি ফুটে উঠল। খটাখট আওয়াজ হলো মেঝেতে, অটোমেটিকটা অসাড় আঙুল থেকে খসে পড়েছে। টলছে ডানিয়েল, কিন্তু আশ্চর্য, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তারপর বাঁকা হতে শুরু করল তার হাঁটু।

দড়াম করে পড়ে গেল সে, এক পা পিছিয়ে এল মেরিলিন। পকেটের ভেতর খুদে পিস্তলটা এখনও ধরে আছে সে। মুখ তুলে তাকাল, নির্জন করিডর। কান পাতল, কোথাও কোন আওয়াজ নেই। ডানিয়েলের দিকে তাকাল আবার। মোজাইক করা মেঝেতে রক্তাক্ত একটা লাশ।

গুড গড! হেনরি পিকেরিংকে দরকার তার! এখুনি!

আইভি স্ট্রীটের পার্কিং লটে একটা গাড়িতে বসে রয়েছে ডেপুটি ডিরেক্টর হেনরি পিকেরিং। দেখল, ক্লাবের দরজার দিকে এগোচ্ছে মেরিলিন, চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব। জানালার কাঁচ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল সে, 'মেরিলিন।'

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরিলিন, ঘুরল, পিকেরিংকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল গাড়িটার দিকে। তার কোটের পকেটে একটা গর্ত রয়েছে, গর্তের মুখ গানপাউডারে পুড়ে গেছে। চোখ জোড়া বিস্ফারিত, সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে। গাড়ির দরজা খোলার সময়, পিকেরিং লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে তার। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, পিকেরিঙের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বসল সীটে।

'কি ব্যাপার, মেরিলিন?' জরুরী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল পিকেরিং।

'ডানিয়েল, মাই গড! এইমাত্র তাকে আমি খুন করেছি!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পিকেরিং, হতভ'। 'ডানিয়েল?'

'আমাদের ডানিয়েল,' চাপা গলায় বলল মেরিলিন, কান্নায় বুজে আসছে গলা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে হড়বড় করে সব ব্যাখ্যা করল সে। ক্যাপিটলে তাকে খুঁজে বের করে ডানিয়েল, ক্রিপ্টে নামিয়ে নিয়ে যায় তাকে, হঠাৎ তার দিকে রিভলভার ধরে। পিকেরিং তাকে সাবধানে থাকতে বলে দিয়েছিল, তাই না? সেজন্যেই সাথে পিস্তলটা রেখেছিল সে আজ। ভাগ্যিস! কি? হ্যাঁ, লাশটাকে ওখানেই রেখে এসেছে সে।

বিস্ময়ে বিহ্বল পিকেরিং কোন বাধা না দিয়ে শুনে গেল। মেরিলিন থামতে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে, 'ডানিয়েল! কি আশ্চর্য, এত থাকতে ডানিয়েল! দুনিয়াটার হলো কি!' মেরিলিনের দিকে ফিরল সে। 'কেন, মেরিলিন? কেন? তোমাকে কিছু বলেনি

সে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল মেরিলিন। 'দুঃখিত, স্যার। জানি ওর মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে···কিন্তু সময় পেলাম কোথায়! আর এক সেকেণ্ড দেরি করলে সে-ই আমাকে···'

'বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বলল পিকেরিং। 'শান্ত হও, মেরিলিন। যা করেছ ঠিক করেছ, সবচেয়ে আগে দরকার বেঁচে থাকাটা। বরং তুমি মারা গেলেই তোমার ওপর রাগ হত আমার। গুলির আওয়াজ?'

'কেউ শোনেনি···সেলারে কেউ থাকলে তো!'

'লাশটা তাহলে লোহার গেটের সামনেই পড়ে আছে?'

'না-না, গেট খুলে ভেতরে নিয়ে গেছি,' তাড়াতাড়ি বলল মেরিলিন। 'ক্যাটাফালকের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

ক্ষীণ একটু তিক্ত হাসি ফুটল পিকেরিঙের ঠোঁটে। 'ভাল জিনিসই হাতের কাছে পেয়ে গেছে। ওর পিস্তলটা?'

'আমার কাছে,' পকেট থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে দিল মেরিলিন।

'তোমারটাও,' বলল পিকেরিং। 'কেউ যদি আমাদের আগে লাশের কাছে হাজির হয়, বুলেট দেখে পিস্তলের খোঁজ পেয়ে যাবে। তোমার নামে নতুন একটা ইস্যু করতে হবে।'

নিজের পিস্তলটাও হাতছাড়া করল মেরিলিন। বিশেষ অ্যাসাইনমেণ্ট ছাড়া সে অবশ্য সাথে পিস্তল রাখে না। 'আপনি এখনও চান রোটাণ্ডায় যাই আমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পিকেরিং। তারপর বলল, 'এখন আর কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না, তবু একবার গিয়ে দেখা যেতে পারে। যাও, বলা তো যায় না। আমি এদিকে দেখি ফোনে জেফ রিকার্ডকে পাওয়া যায় কিনা।'

দরজার হাতলে হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল মেরিলিন।

'সাবধানে থেকো,' মেরিলিনের পিঠ চাপড়ে দিল পিকেরিং।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঝুঁকল মেরিলিন, পিকেরিংকে দেখল। অভয় দিয়ে হাসল পিকেরিং। বলল, 'কোন ভয় নেই। ওখানে আমাদের অনেক লোক আছে। কেউ তোমার গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না।'

দৃঢ়, ধীর পায়ে ক্লাবের দিকে এগোল মেরিলিন।

আসলে রোটাণ্ডার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই। ওই নামে এক সময় একটা প্রাইভেট রেস্তোরাঁ ছিল, সেটা উঠে যাবার পর জায়গাটা দখল করেছে ক্লাব। এটাও একটা প্রাইভেট ক্লাব, আলাদা একটা নামও আছে। কিন্তু ক্যাপিটল হিল-এ যারা কাজ করে, তারা রোটাণ্ডা নামটা ভুলতে পারেনি, ক্লাবটাকেও সেই পুরানো নামে ডাকে। জিজ্ঞেস করলে অনেকেই ক্লাবের আসল নাম বলতে পারবে না।

ভেতরটা অবশ্য অনেক বদলানো হয়েছে। বিশাল হলটাকে ভাগ করা হয়েছে কয়েক ভাগে। ঢোকার মুখে অস্বাভাবিক চওড়া সিঁড়ি, কারুকাজ করা কাঠের রেইলিং বসিয়ে কয়েক প্রস্থে ভাগ করা হয়েছে। দুই প্রস্থ সিঁড়ি দু'দিক থেকে উঠে গেছে প্রকাণ্ড এক ঝুল-বারান্দায়, প্রেসিডেনশিয়াল পোর্ট্রেট গ্যালারি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। কেনেডি, জনসন, নিক্সন, ট্রুম্যান, সব ক'জন প্রেসিডেণ্টের ছবিই আছে ওখানে।

ঢোকার মুখ থেকে তৃতীয় আরেক প্রস্থ সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। নিচে লিনেন মোড়া সার সার টেবিল, মৃদু আলো। ডিনার পর্ব শেষ হয়েছে, লোকজন যারা আছে তারা সবাই গলা ভেজাবার জন্যে আছে। বেশিরভাগই কংগ্রেশনাল স্টাফ, দীর্ঘ অধিবেশনের পর, বাড়ি ফেরার আগে, দু'এক ঢোক গিলে তাজা হয়ে নিতে চায়।

মেরিলিনকে দেখেই চিনতে পারল বারটেণ্ডার। 'হাই, মিস শার্প। বলুন কি দেব আপনাকে?'

গায়ের কোট আগেই খুলেছে মেরিলিন, ভাঁজ করে বুলেটের ফুটোটা লুকিয়ে রেখেছে। উঁচু একটা টুলে বসল সে। 'ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।'

'শিওর থিং।'

স্পীকার একটা গন্ধ শুনিয়েছিলেন, মনে পড়ে যেতে হাসি পেল মেরিলিনের। একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী শ্রমিকদের জন্যে একটা বারে পার্টির আয়োজন করেছেন। সবার জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিলেন তিনি। বারটেণ্ডার জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কি দেব, স্যার? প্রার্থী বললেন, স্কচ হুইস্কি। খুব স্বাভাবিক, নির্বাচনে হেরে যান ভদ্রলোক।

গ্লাস তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল মেরিলিন। অনুভব করল, টেনশন কেটে গেছে তার, ঢিল পড়েছে পেশীতে। ডানিয়েলের সাথে যা ঘটে গেছে, মনে হলো অনেকদিনের পুরানো ঘটনা, তার সাথে যেন কোন সম্পর্কই নেই। তারপর উপলব্ধি করল, ঢিল পড়েনি, স্রেফ অসাড় হয়ে গেছে পেশী। উত্তেজনা বোধ করছে না, কারণ ভোঁতা হয়ে গেছে স্নায়ুগুলো। অনেক বছর হলো এ-ধরনের ব্যাপারে জড়ায়নি সে। স্পীকারের বন্ধুর মত, আরেক ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে।

সান্ত্বনা এইটুকু যে এখানে আর নতুন করে কিছু ঘটবে না। এত লোকের ভিড়ে কি ঘটতে পারে? তাছাড়া, আশপাশে সি.আই.এ-র বেশ কিছু এজেন্টও আছে। নিশ্চয়ই তারা সবাই ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, তা না হলে দু'একজনকে অন্তত চিনতে পারত সে।

বারের আরেক প্রান্তে ছোটখাট একটা ভিড়, ভিড় থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল এক লোক। লোকটা হাসছে, তার

দিকে তাকিয়ে। চিনতে পারল মেরিলিন। একজন লবিইস্ট। বক বক করা অভ্যেস, তেল মাখানো স্বভাব।

গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে নিজেকে শক্ত করল মেরিলিন। অন্য এক ধরনের হামলার জন্যে তৈরি হলো মনে মনে।

রোটাণ্ডার সামনের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। মেম্বারশিপ কার্ড লাগে শুধু খাবার বা পানীয় কেনার সময়। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কর্নেল উইলিয়াম অবসন।

সিঁড়ির মাথা থেকে নিচের দিকে, বারের ভেতর তাকাল সে। তারপর বাঁদিকে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ঝুল-বারান্দায়। ঢিলেঢালা একটা রেনকোট পরে আছে সে, তাতে ঢাকা পড়েছে নিজের আকৃতি। জ্যাকেটের কলার তোলা, খাড়া হয়ে ঢেকে রেখেছে ঘাড়, হ্যাটের কিনারা প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

মেন'স রুমের দরজার দিকে এগোল সে, যেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যেই এখানে তার উঠে আসা। কিন্তু দরজাটার পাশ ঘেঁষে এগোল, ভেতরে ঢুকল না। কাউকে দেখতে পেলে হয়তো ঢুকত, কিন্তু সিঁড়িতে বা সামনের দরজায় কাউকে দেখা গেল না।

একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অবসন। টেলিফোনের আওয়াজ শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

□

'আপনার ফোন, মিস শার্প,' বলল বারটেণ্ডার। 'কোটরুমের পাশের রিসিভারটা তুলতে পারেন।'

তাড়াতাড়ি টুল থেকে নেমে পড়ল মেরিলিন। নিশ্চয়ই ডেপুটি ডিরেক্টর হেনরি পিকেরিং ফোন করেছে, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলবে। আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল এখানে রয়েছে সে, কিছুই ঘটেনি। লবিইস্ট লোকটা ছাড়া কেউ তার কাছে পর্যন্ত আসেনি।

লোকটা মূর্তিমান একটা আতঙ্ক। সাংবিধানিক বিধি-বিধান সম্পর্কে তার আগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। একটা মুদ্রাদোষ আছে, খানিক পর পর যন্ত্রচালিতের মত আওড়ায়, আপনি এত জানেন! লোকটাকে এড়াবার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দ্রুত ফোনের দিকে এগোল। ফোনটা সিঁড়ির পাশে।

'হ্যালো?'

'মিস শার্প?' পুরুষমানুষের গলা। কিন্তু হেনরি পিকেরিং নয়।

'ইয়েস?'

উত্তরটা এল ওপর দিক থেকে, তীক্ষ্ণ বাতাস কাটার আওয়াজ। মেরিলিনের মাথার পিছনে লাগল বুলেটটা। বেরিয়ে গেল হাঁ করা মুখ দিয়ে। দাঁত, ঠোঁট, জিভ, মাড়ি–কিছু থাকল না, ওগুলোর জায়গায় বড় একটা গর্ত দেখা গেল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত, লাল হয়ে গেল দেয়াল।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল একজন ওয়েট্রেসের গলা থেকে। বারে বসা লোকগুলো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আর্তনাদ থামার পর কোথাও কোন শব্দ নেই, নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। কেউ নড়ল না।

সবাই যখন হতভ', সিঁড়ি বেয়ে ঝুল-বারান্দা থেকে তীর বেগে নেমে গেল এক লোক। ঢিলেঢালা রেনকোট পরনে, হ্যাটটা নেমে এসে মুখ ঢেকেছে। বিস্ফোরিত হলো দরজা, বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল সে।

লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল কয়েকজন লোক, তাদের পিছু নিল লবিইস্ট আর বারটেণ্ডার। লোকগুলো দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, কিন্তু লবিইস্ট আর বারটেণ্ডার হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেরিলিনের দিকে। বাইরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

মেরিলিন মারা গেছে।

বাইরে অন্ধকার, লোকগুলো শুকনো মুখে ফিরে এল।

কর্নেল অবসন পালিয়েছে।

তিন

অ্যাসাইনমেণ্টের প্রথম ধাপটা সাফল্যের সাথে পেরিয়ে এসেছে, কাজেই পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। ডানিয়েলের কাছ থেকে বা ডানিয়েলের মাধ্যমে কর্নেল অবসনের কাছ থেকে কোন বিপদ সঙ্কেত আসেনি। তার মানে ফেউ হয়ে কেউ ওর পিছনে লেগে নেই।

মার্কিন প্রেসিডেণ্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করা অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর থেকে কৌশলে তাকে বের করে আনে রানা। প্রায় সাথে সাথেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়, সিক্রেট সার্ভিস ওকে ধাওয়া করতে শুরু করে। প্ল্যান-প্রোগ্রাম আগেই তৈরি করা ছিল, কাজেই সিক্রেট সার্ভিসকে সহজেই বোকা বানাতে পারে ও। তারপর শুধু মিশিগান থেকে নয়, টিউলিপকে নিয়ে আমেরিকা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে অস্ট্রিয়া, সেখান থেকে ইটালি, ইটালি থেকে গ্রীসের মূল ভূখণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ক্রিটে পৌঁচেছে ও। প্রতি পদে ধরা পড়ার ভয় ছিল, মার্কিন প্রশাসন সবগুলো মিত্র দেশের এসপিওনাজ জগৎ আর পুলিস বিভাগকে সতর্ক করে দিয়েছে। শুধু নিত্য-নতুন কৌশল অবল'ন করে একের পর এক বাধাগুলো পেরিয়ে আসতে পেরেছে রানা। ক্রিট ছোট একটা দ্বীপ, সারাটা বছর ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগে থাকে। এখানকার মানুষ যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কারও ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করে না। দ্বীপে আসার

সময় পিছনে কোন চিহ্ন রেখে আসেনি রানা, কাজেই এখানে তাকে কেউ খুঁজতে আসবে না।

গাঢ় নীল ক্রিটান সাগর কড়া রোদ মেখে পারদের মত ঝলমল করছে, আর জলপাই ঝোপগুলোয় যেন এই মাত্র সবুজ এক পোচ রঙ লাগানো হয়েছে। গাছগুলোর স্থূল কাণ্ডের ফাঁকে পাথুরে উপকূলরেখা দেখতে পেল রানা, ঢেউগুলো একের পর এক তীরে ভেঙে পড়ায় সাদা ফেনায় ধোয়া হয়ে যাচ্ছে বালুকাবেলা। ঢেউয়ের একঘেয়ে, চাপা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। রানার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে, সাঁতরে অনেক দূর চলে যায়, বন্ধুত্ব করে একটা ডলফিনের সাথে। কাছে এলেই সাগর ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আপাতত ঝোঁকটা সামলাতে হলো, কারণ এখুনি ওকে চেহারা বদলাবার জন্যে আয়নার সামনে বসতে হবে।

টিউলিপের ঘুম ভাঙার সময় হয়ে এসেছে। যে-কোন মুহূর্তে ওষুধের প্রভাব কেটে যাবে।

বারান্দা থেকে তবু নড়তে ইচ্ছে করল না। সকালের হিম বাতাস পুলক এনে দেয় শরীরে। বাতাসে লেবু আর জলপাইয়ের গন্ধ, মন ভরে যায়। কিন্তু রানা জানে, সবুজের এই সমারোহ বেশিদিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ হবে প্রকৃতি, সমস্ত রস আর রঙ শুকিয়ে যাবে।

আশা করা যায় ততদিন এখানে থাকবে না রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল ও। ছোট একটা দোতলা বাংলো, দেয়ালগুলো সাদা চুনকাম করা। সবগুলো জানালা চওড়া একটা পথের দিকে, পথের ওপারে জলপাই বাগান, তারপর সাগর। ফল তোলার সময় লোকজনের ভিড় লেগে থাকবে এই পথে। কিন্তু আপাতত বাড়ির চারপাশ অনেক দূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্জন। হেরাক্লিয়ন থেকে পুব দিকে চলে গেছে কোস্ট রোড,

সে-রাস্তা থেকে বাড়িটা অনেক দূরে।

নিচতলার একটা ঘরের আয়নার সামনে আধ ঘণ্টা বসল রানা। তারপর দোতলায় উঠে তালা খুলে টিউলিপের ঘরে ঢুকল। সাদা দেয়াল, টিউলিপের পরিচিত কিছু মানুষের ফটো আর পেইন্টিং ঝুলছে। বিছানায় শুয়ে রয়েছে মেয়েটা, একটুও নড়ছে না, গায়ে সাদা একটা চাদর। বিছানার কিনারায় বসে তার একটা হাত তুলে নিল রানা। পালস স্বাভাবিক, হার্টবিট স্বাভাবিক। বোধহয় স্পর্শ পেয়েই চোখের পাতা নড়ে উঠল টিউলিপের। বন্ধ পাতার ভেতর নড়াচড়া করছে মণি দুটো।

আরও পনেরো মিনিট পর চোখ মেলে তাকাল টিউলিপ। নড়ল না, শুধু চোখ ঘুরিয়ে কামরার চারদিকে তাকাল। তারপর পাশ ফিরল সে। বিছানায় বসা লোকটাকে চিনতে পেরে একটু উজ্জ্বল হলো চোখ দুটো।

স্যাম গ্রেসনের পরিচিত চেহারা।

মিষ্টি করে হাসল রানা, ওর চোখে স্নেহ আর আদর। 'হাই!'

টিউলিপের ম্লান চেহারায় আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটল হাসিটুকু। ছোট্ট করে বলল সে, 'হাই!'

কচি মেয়েটার মাথায় একটা হাত রাখল রানা। 'লালা-লা, লা-লালা-লা-লা···,' মিশিগানে, মামা বাড়িতে, এই সুরটা সারাক্ষণ লেগে থাকত টিউলিপের ঠোঁটে।

'লালা-লালা-লা-লালা,' শূন্যস্থান পূরণ করল টিউলিপ, তারপরই দেয়ালে বাবার ফটোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'মিসেস কেনটারকি কোথায়?' গভর্নেসের কথাই আগে মনে পড়ল, তার কাছেই মানুষ সে, প্রায় সারাটা দিন তার সাথেই কাটে।

'দিন কয়েকের জন্যে এক জায়গায় যেতে হয়েছে তাকে। বলে গেছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখব।'

'বাড়িটা তোমার?' মা-বাবার, পরিচিত আরও লোকজনের ছবি থাকলেও, মেয়েটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে ঘরটা তার অচেনা।

'হ্যাঁ, আপাতত।'

ব্যাখ্যা হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট। বড় বড় কোমল চোখে এতটুকু সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল না। অচেনা জায়গা আর অচেনা মানুষ দেখে অভ্যস্ত সে। মাত্র চার বছরে এত জায়গায় বেড়িয়েছে, বেশিরভাগ মানুষ সারা জীবনেও অত বেড়াবার সুযোগ পায় না। তাছাড়া, স্যাম গ্রেসন তার অপরিচিত কেউ নয়। মিসেস কেনটারকির বন্ধু। 'আমার সেই খেলনা ভাল্লুকটা?'

'নোড়ো না,' কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে চোখ রাঙাল রানা। তারপর খাটের তলা থেকে বড়সড় একটা খেলনা ভাল্লুক বের করে বিছানার ওপর রাখল। দুর্বল, তাই টিউলিপ বসতে গেলে বাধা দিল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভাল্লুকটাকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিল টিউলিপ। আনন্দে চিক চিক করছে চোখ দুটো। হঠাৎ মনে পড়তে, রানার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। পাকা গিন্নীর মত বলল, 'আমাদের কিছু গোপন কথা আছে, তুমি এখন যাও।'

মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে এরকম একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। দরজার কাছে চলে গেছে ও, পিছন থেকে ডাকল টিউলিপ, 'ফ্রেণ্ড?'

পিছন ফিরল রানা। 'ইয়েস?'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাতঘড়ি দেখল ও। ওয়াশিংটনে এখন রাত। হাসি মিলিয়ে গিয়ে ম্লান হয়ে গেল চেহারা। ভাবল, দিনকাল কেমন কাটছে প্রেসিডেন্ট আর ফার্স্ট লেডির?

বিছানায় পিঠ দিয়ে শুয়ে আছেন রিচার্ড কনওয়ে। প্রায় অন্ধকার ঘর। চোখ খোলা, বিছানার ওপর টাঙানো নেট ভেদ করে সিলিঙে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। তাঁর পাশেই শুয়ে রয়েছেন পামেলা কনওয়ে, অবশেষে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কান খাড়া করে স্ত্রীর নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ শুনলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। ঘুমের মধ্যেও ফার্স্ট লেডির চেহারা থেকে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যায়নি।

হায় ঈশ্বর, ভাবলেন প্রেসিডেন্ট, পামেলাকে আমি কি অশান্তির মধ্যেই না রেখেছি! আর টিউলিপ? আজ তার এই বিপদের জন্যে কি আমিই দায়ী নই?

বিছানা থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোলেন, থামলেন বাথরুমের সামনে এসে। ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার দেখে নিলেন স্ত্রীকে, পাশ ফিরে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন পামেলা। বাথরুমে ঢুকে বোতাম টিপলেন তিনি, চোখ ধাঁধিয়ে গেল আকস্মিক আলোয়। বাথটাবের চওড়া কিনারায় বসলেন, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর, তালুর ওপর মুখ।

হোয়াইট হাউসে এই একমাত্র জায়গা যেখানে সত্যি সত্যি নিজেকে একা অনুভব করতে পারেন প্রেসিডেন্ট–বাথরুম। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর বলা চলে। কিন্তু যে-কোন দরজা খুলে বাইরে পা দিলেই দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ছায়া হয়ে পিছু নেবে তাঁর, একা কোথাও যাওয়া হবে না।

এই মুহূর্তে একা হওয়া দরকার তাঁর, কিন্তু অন্ধকার বেডরুমে সমস্যাগুলো আরও যেন বিকট চেহারা নিয়ে গ্রাস করতে আসে তাঁকে।

চোখ বুজলেন তিনি, পুরানো দিনের কথা স্মরণ করলেন।

কংগ্রেস নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তখন। ভাড়া করা ছোট একটা কামরা থেকে মুষ্টিমেয় ভলাণ্টিয়ারের সাহায্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে অন্যতম ছিল পামেলা, জেফ রিকার্ড, আর মার্গারেট। সবাই তাঁর বিশ্বস্ত, পুরানো বন্ধু। ইলেকশনের রাত। বিজয়। কি আনন্দময় মুহূর্ত!

কিন্তু তখন যদি জানতেন নিয়তি কোথায় তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিন কি বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হতে পারতেন? ভাড়া করা ঘরে যা শুরু হয়েছিল, আজ এই তার পরিণতি। স্ত্রী ভয়ে সিটকে আছে। মেয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার শিকার। প্রিয় বন্ধুকে মনে হচ্ছে অপরিচিত লোক।

আর, তিনি নিজে?

ক্লান্ত একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, বাথটাবের কিনারায় বসে আছেন, একাকী, মনে তাঁর ভয় আর অপরাধবোধ, ভাবছেন ক্ষমতার লোভ করা উচিত হয়নি তাঁর, লোভ করাতেই আজ তাঁকে এত বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে।

'রিচার্ড···?' দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল।

চোখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। পামেলার ঘুম ভেঙে গেছে।

'তোমার খারাপ লাগছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফার্স্ট লেডি।

'না।' বাথটাব থেকে নেমে দরজা খুললেন প্রেসিডেন্ট। আলোর একটা ফালি বিছানার ওপর পড়ল। বিছানায় উঠে বসেছেন পামেলা, চেহারায় চিন্তার ছাপ। 'হ্যাঁ,' সত্যি কথা বললেন এবার, 'খুব খারাপ লাগছে।'

তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামতে গেলেন ফার্স্ট লেডি, কিন্তু তার আগেই বিছানার কাছে পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট। স্ত্রীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি, কাছে টানলেন–শুধু যে সান্ত্বনা আর সহানুভূতি পেতে চাইছেন তাই নয়, সম পরিমাণে

দিতেও চাইছেন।

'রিচার্ড।'

স্ত্রীর ঠোঁটে হালকা একটা আঙুল রাখলেন প্রেসিডেন্ট। 'প্লীজ কথা বোলো না, শুধু শুনে যাও।'

স্বামীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন পামেলা। তারপর মাথা ঝাঁকালেন।

'গোটা ব্যাপারটার জন্যে আমি দায়ী,' শান্তভাবে বললেন রিচার্ড কনওয়ে, পামেলা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে আবার তিনি হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন। 'ক'দিন ধরেই ভাবছি, একটা ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করছি। একটু আগে হঠাৎ আমার উপলব্ধি হলো। শোনো, তোমাকে তাহলে সব বলি···।'

গাড়ি চালিয়ে সরাসরি ল্যাংলিতে চলে এল হেনরি পিকেরিং, জানতে পারল জেফ রিকার্ড বাড়ি চলে গেছেন। সাথে সাথে ফোন করল সে, রিসিভার তুলল মার্গারেট। জেফ রিকার্ড এখনও বাড়ি ফেরেননি। নিশ্চয়ই ফেরার পথে রয়েছেন। 'ফিরলেই আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন,' ভারী গলায় বলল সে, নামিয়ে রাখল রিসিভার।

সময়ের দিকে অস্থির একটা চোখ রেখে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিকেরিং। ক্যাপিটল ক্রিপ্টে, লিংকন ক্যাটাফালকে লাশ রয়েছে ডানিয়েলের। সত্যি, অল্লুত একটা ব্যাপার! সি.আই.এ. হিরোরা মারা যাবার পর উপযুক্ত সম্মান প্রায় কখনোই পায় না। সি.আই.এ. ভিলেনদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

গোটা ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে শুধু অসন্তুষ্ট নয়, রাগে কেঁপে উঠল পিকেরিং। মৃত একজন এজেন্টের এক কানাকড়ি মূল্য নেই।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। হেডকোয়ার্টারের ভেতরই

দু'জায়গায় ফোন করল। ক্যাপিটলের মত পুরানো একটা বিল্ডিঙের মেরামতের কাজ সব সময় লেগে থাকে। এক দল রঙ মিস্ত্রীকে দেখে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না, সাথে যদি সরকারি জব অর্ডার আর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ভরা একটা ঠেলাগাড়ি থাকে। কেউ জানবে না ডানিয়েল ওখানে কখনও ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হবে কাজটা। একটা দিক সামলানো গেল।

ইতোমধ্যে ডানিয়েলের ফাইল পৌঁছুল ডেস্কে। সতর্কতার সাথে পড়ল পিকেরিং। ফাইলে এমন কিছু নেই যা মেরিলিন শার্প বা টিউলিপের সাথে ডানিয়েলকে জড়াতে পারে। ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সে, পায়চারি শুরু করল।

এখনও বাজছে না ফোন। জেফ রিকার্ড করছে কি? কোথায় গেল সে?

হঠাৎ নক হলো দরজায়। ঝট্ করে ঘুরল পিকেরিং। 'কাম ইন।'

নিচের তলা কমিউনিকেশন রুম থেকে একজন মেসেঞ্জার। সীল করা একটা এনভেলাপ দিয়ে চলে গেল সে। এনভেলাপটা নেড়েচেড়ে দেখল পিকেরিং। লাল এনভেলাপ, তারমানে আলট্রাআর্জেন্ট। লেখা আছে শুধু তার দেখার জন্যে। এনভেলাপ ছিঁড়ে ভেতরের টেলেক্সটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভার, আবার ফোন করল সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের বাড়িতে।

'দুঃখিত,' বলল মার্গারেট। 'এখনও ফেরেনি ও। বুঝতে পারছি না কেন এত দেরি করছে। কোথায় আছে তাও আমার জানা নেই···।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল পিকেরিং। হাতের টেলেক্সটা আরেকবার দেখল। তারপর টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত স্ক্র্যা'লারের সুইচ অন করল। 'শুনুন, মিসেস রিকার্ড, ওনাকে

বলবেন আমার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব হলো না। এথেন্স থেকে আমরা একটা টেলেক্স পেয়েছি। একজন মেয়ে এজেন্ট খবর দিয়েছে, সে নাকি টিউলিপকে দেখেছে।'

'টিউলিপকে দেখেছে! কোথায়? কখন?'

'সব কথা ব্যাখ্যা করার সময় নেই, দুঃখিত। ওনাকে বলবেন, টেলেক্সটা আমার সেফে থাকল। এখানে এসে ওটা পড়তে বলবেন। বলবেন, এথেন্স যাচ্ছি আমি।'

'আজ রাতে?'

'এখুনি। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে যদি তিনি বাড়িতে ফেরেন, এনড্রুতে গেলে আমার সাথে দেখা হবে। তা না হলে গ্রীস থেকে ফোনে কথা বলব আমি।'

'ঠিক আছে।'

'আরও একটা ব্যাপার,' বলল পিকেরিং। 'ওনাকে বলবেন, মেরিলিন শার্পকে রোটাণ্ডায় রেখে এসেছি আমি। অনেক কথা বলার আছে তার। স্ক্র্যা'লারেও সে-সব কথা আপনাকে বলা যাচ্ছে না। মি. রিকার্ডের সাথে আপনার দেখা হোক বা তিনি আপনাকে ফোন করুন, বলবেন এক মুহূর্ত দেরি না করে মেরিলিনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ওনার জন্য একটা ফাইল থাকল এখানে। টেলেক্সের সাথে সেফে রেখে গেলাম।'

'ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ,' শুভরাত্রি না জানিয়েই যোগাযোগ কেটে দিল পিকেরিং।

মেরিলিন শার্প সম্পর্কে কারও কাছ থেকে কিছু শোনার দরকার নেই জেফ রিকার্ডের। তার সম্পর্কে পিকেরিং মার্গারেটকে যা বলেছে, তিনি আরও অনেক বেশি জানেন। জানেন মেরিলিন বেঁচে নেই।

পুরানো রোটাণ্ডা থেকে বেশ খানিক দূরে নিজের গাড়িতে বসে আছেন তিনি। রোটাণ্ডায় এই মুহূর্তে গিজগিজ করছে পুলিস। পুলিস আর সাংবাদিক। ঘটনা তো আর সামান্য নয়—অভিজাত ক্লাবে কংগ্রেস সদস্যা খুন, সামনের দরজা দিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর পলায়ন—আলোড়ন তোলার জন্যে যথেষ্ট।

কিন্তু আরও আছে। কংগ্রেস সদস্যার কোটে বুলেটের একটা ফুটো, ফুটোর চারধারে গান পাউডার। বোঝাই যায়, কোটের ভেতর থেকে গুলি করা হয়েছিল। আজ রাতে। অথচ পিস্তল বা রিভলভার কিছুই পাওয়া যায়নি। বারের সামনে, একটা টুলের ওপর ভাঁজ করা অবস্থায় পাওয়া গেছে কোটটা। ওটা যে মেরিলিনের, অনেকেই সাক্ষী দিয়েছে।

প্রশ্ন ওঠে, ক্লাবে আসার আগে কোথায় ছিল মেরিলিন শার্প? পুলিস জানতে চাইবে।

তিনিও জানতে চান।

পাশের সীটে বসা লোকটার দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। এ সেই লবিইস্ট, ক্লাবে শেষবার যে কথা বলেছে মেরিলিনের সাথে। লোকটার স্ত্রী আছে, চার মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বয়স পঁচিশ। অথচ গোপনে ভালবাসে তেইশ বছরের এক যুবতীকে। আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছে তাকে। হপ্তার পাঁচটা দুপুর এই যুবতীর সাথে ঘুমায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এ-ধরনের দুর্বলতা সম্পর্কে খবর রাখতে হয় সি.আই.এ-কে। মাঝে মধ্যে এ-সব তথ্য কাজ দেয়, এই যেমন আজ রাতে। জেফ রিকার্ড উপলব্ধি করেছিলেন, রোটাণ্ডায় তাঁর নিজের একজন লোক থাকা দরকার, যে শুধু একা তাঁর কাছে রিপোর্ট করবে। গোপন তালিকায় চোখ বুলিয়ে লবিইস্ট লোকটাকে বেছে নেন তিনি। লোকটা জানে, সি.আই.এ. চীফ কোন নির্দেশ দিলে শুনতে হবে তাকে, তা না হলে তার গোপন অভিসারের কথা চাপা থাকবে

না।

'ক্লাবে আসার আগে কোথায় ছিল, আপনাকে বলেনি সে?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লবিইস্ট। 'এ-ব্যাপারে কথা হয়নি। সম্ভবত ফ্লোরে ছিলেন। অধিবেশন চলেছে এগারোটা পর্যন্ত।'

'এগারোটার পর আরও কিছুক্ষণ অধিবেশন চলে,' বললেন জেফ রিকার্ড। এরইমধ্যে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন তিনি। 'আপনি বললেন, প্রায় মাঝরাতের দিকে ক্লাবে আসে সে। মাঝখানের সময়টা কোথায় ছিল?'

'কি জানি। হয়তো তার অফিসে।' ঢোক গিলল লবিইস্ট।

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালেন সি.আই.এ. চীফ। লোকটা ভয়ে কুঁকড়ে আছে, মিথ্যে বলবে না। 'ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন।'

লবিইস্টের চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠল।

'কিন্তু আমাদের চুক্তির কথাটা ভুলবেন না যেন,' সাবধান করে দিলেন জেফ রিকার্ড, বলতে চাইলেন তাদের এই সাক্ষাৎকারের ঘটনা যেন প্রকাশ না পায়, পেলে গোপন অভিসারের কথা ফাঁস হয়ে যাবে।

'জ্বী, ভুলব না।'

'ভুললে নিজের পায়ে কুড়োল মারবেন। এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে তা যদি প্রকাশ পায়, আপনার ফাইল ডাকযোগে আপনার স্ত্রীর হাতে পৌঁছে যাবে। আপনি যাতে আর কাজ করতে না পারেন সেদিকটাও দেখব আমি।'

লবিইস্ট কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ি থেকে নেমে গেল। ক্যাপিটল হিলের দিকে, অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা। গাড়ি স্টার্ট দিলেন জেফ রিকার্ড।

উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি, নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। একা থাকা দরকার কিছুক্ষণ, কয়েকটা ব্যাপার গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

অ্যারো আর এগম্যানের মত, মেরিলিন শার্পও মারা গেল। এবারও কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে রোটাণ্ডায় উপস্থিত ছিল খুনী। মেরিলিন কখন রোটাণ্ডায় যাবে জানল কিভাবে? নিশ্চয়ই কেউ তাকে আগেভাগে জানিয়েছে। কে জানাতে পারে? এমন একজন, যে নিজে জানে। উঁচু পদের কোন লোক, ভাবলেন জেফ রিকার্ড, যারা আমার আশপাশে রয়েছে তাদের কেউ। মাই গড, সি.আই.এ-র ভেতর দু'মুখো সাপ!

চিন্তার খেই ধরে আবার তন্ময় হলেন জেফ রিকার্ড। মেরিলিন ক্লাবে যাচ্ছে, কে কে জানত? তিনি জানতেন। তিনি আর পিকেরিং প্ল্যানটা তৈরি করেন। হ্যাঁ, পিকেরিং জানত। আর জানতেন প্রেসিডেন্ট। জেফ রিকার্ড নিজে তাঁকে রিপোর্ট করেছিলেন।

মেরিলিনকে রোটাণ্ডায় পাঠাবার আগে সবরকম সাবধানতা অবল'ন করা হয়েছিল। জেফ রিকার্ডের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, সন্দেহের ঊর্ধ্বে তিনজন লোক ছাড়া কেউ জানবে না মেরিলিন কখন রোটাণ্ডায় যাচ্ছে।

অথচ খুনী ঠিকই জেনে ফেলে। সময়মত সেখানে উপস্থিত ছিল সে। ঠিক যখন তার থাকা দরকার।

সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের মাথা ঘুরে উঠল। উইণ্ডস্ক্রীনের সামনে আলোগুলো চোখের সামনে নাচছে। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত একটা চিন্তা বাড়ি খাচ্ছে খুলির ভেতর দিকের দেয়ালে। শুধু ওয়াশিংটনে নয়, পশ্চিম জার্মানী আর দক্ষিণ আফ্রিকাতেও খুনীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এবং দু'জনের একজন বেঈমান।

হয় পিকেরিং, নয়তো রিচার্ড কনওয়ে!

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন জেফ রিকার্ড। এ-ধরনের উল্লট চিন্তা মাথায় এল বলে নিজেকে তিনি ধিক্কার দিলেন না। এমন একটা পরিস্থিতি, ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে বাতিল করার উপায় নেই।

জোরে একটা ঝাঁকি খেয়েছেন জেফ রিকার্ড, হুইলের সাথে ঠুকে গিয়ে ফুলে উঠেছে কপাল। কিন্তু তিনি কোন ব্যথা অনুভব করলেন না। চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মাথার ভেতর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সাহায্য করছেন কিডন্যাপারদের? তারমানে কি নিজের মেয়েকে তিনিই কিডন্যাপ করার অনুমতি দিয়েছেন? অসম্ভব! কিন্তু পিকেরিং? তাই বা কিভাবে সম্ভব! সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার সাথে জড়িত? কাজটা কেন সে করতে যাবে? কাজটা করে কি তার লাভ? দু'জনের কারই বা কি লাভ?

ধীরে ধীরে আবার গাড়ি ছাড়লেন তিনি। মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পাঁজরের গায়ে হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। এ-ধরনের উন্মাদ-করা সমস্যায় আগে কখনও পড়েননি তিনি। সমস্যাটা ভীতিকর নয়, আর সব সমস্যার মত এটারও তিনি মীমাংসা করার যোগ্যতা রাখেন। ভীতিকর হলো সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলো।

গভীর একটা শ্বাস টানলেন তিনি। ঠিক আছে, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা যাক।

'রিচার্ড কনওয়ে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। নিখোঁজ টিউলিপের বাবা। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে কি···?'

কিসের যুক্তি? যুক্তির এখানে নেতিবাচক ভূমিকা হয় কি করে? না, রিচার্ড কনওয়ে বাদ। প্রেসিডেন্ট···অসম্ভব! তাহলে নিশ্চয়ই পিকেরিং।

লাল আলোর সামনে গাড়ি থামালেন জেফ রিকার্ড। কয়েক মুহূর্ত শুধু গাড়ি নয়, তাঁর মাথাও নিশ্চল হয়ে থাকল। ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

সবুজ বাতি জ্বলল। গাড়ির সাথে সাথে সচল হলো ব্রেন। বোধহয় কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম পেয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে মাথাটা। কিভাবে কি ঘটেছে তিনি যেন তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করল। সেই সাথে প্রশ্ন জাগল মনে, চীফ হয়ে সি.আই.এ-র কতটুকু তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন?

হ্যাঁ, তিনি ডিরেক্টর বটে, কিন্তু ভেতরের লোক বলতে যা বোঝায় তা নন। সি.আই.এ. ডিরেক্টরকে প্রেসিডেন্ট বাইরে থেকে নিয়োগ করেন। ঠিক সেভাবেই তাঁকেও নিয়োগ করা হয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, হোয়াইট হাউস তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত, তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। এবং, প্রেসিডেন্ট তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু যেহেতু তিনি ভেতরের লোক নন, ল্যাংলিতে কি ঘটছে না ঘটছে সব খবর তাঁকে জানানো হয় না। তিনি শুধু নীতি নির্ধারণ করে দেন, তাঁকে শুধু রিপোর্ট দেখতে দেয়া হয়। কাজের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে কিছুই তিনি জানেন না, কাজগুলো যারা করে তাদের খুব কম লোককেই তিনি চেনেন। কাগজে কলমে তিনি ডিরেক্টর, কিন্তু ভেতরের লোক তিনি হতে পারেননি।

আর পিকেরিং? না, সে বাইরের লোক নয়। সে একজন প্রফেশনাল, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে এসেছে। সংস্থাটাকে এমনভাবে চেনে সে, সেভাবে কোনদিনই জেফ রিকার্ডের পক্ষে চেনা সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট আসেন এবং যান, সেই সাথে আসে আর যায় তাঁদের নিয়োগ করা ডিরেক্টররা। কিন্তু পিকেরিঙের মত প্রফেশনালরা রাজনৈতিক পালাবদলের পরও যার যার জায়গায় থেকে যায়। সি.আই.এ-র অন্যান্য প্রফেশনালদের

কাছে পিকেরিং হলো সত্যিকার কর্তা, তাদের বিশ্বস্ততা একমাত্র পিকেরিং-ই অর্জন করতে পেরেছে।

পিকেরিং, হ্যাঁ, পিকেরিং। সে-ই সি.আই.এ-কে পরিচালনা করে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সাউথওয়েস্ট ফ্রিওয়ে-তে চলে এলেন জেফ রিকার্ড, ডান দিকের রাস্তায় থাকলেন। রাস্তায় আরও অনেক গাড়ি রয়েছে, চারপাশে শহরের ঝলমলে আলো। জেফারসন মেমোরিয়ালে এত রাতেও কিছু ট্যুরিস্টকে দেখা গেল। অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ একা, পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ মনে হলো তাঁর। লোকে জানে, তাঁর ক্ষমতার অন্ত নেই। একদিকে সি.আই.এ-র ডিরেক্টর, আরেক দিকে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের বন্ধু। কিন্তু ক্ষমতার দুটো উৎসই যেন কেড়ে নেয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। পিকেরিং কি করছে জানতে হবে তাঁকে, অথচ সাহায্যের জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার উপায় নেই তাঁর। অন্তত এখুনি নয়, যতক্ষণ না জানতে পারছেন রিচার্ড কনওয়ে ব্যাপারটার সাথে জড়িত নন। শুধু কি তাই, পিকেরিং বা প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ লোকজনদের কাছ থেকেও কোন সাহায্য তাঁর নেয়া চলে না।

উপায় তাহলে একটাই থাকল। বাইরে থেকে সাহায্য নিতে হবে তাঁর। পটোম্যাক পেরিয়ে এলেন তিনি। উত্তর দিকে যাচ্ছেন। কিছু চিন্তা না করেই ল্যাংলির দিকে গাড়ি ছোটালেন, যেখানে তাঁর এই মুহূর্তে যাওয়া চলে না।

পিকেরিঙের সাথে কথা বলবেন তিনি।

ক্রিস্টাল সিটিতে পৌঁছুলেন, ফিলিং স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশনের চারদিক ফ্লাডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আলোর পিছনে ফোন বুদ, এক কোণে।

সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন তিনি।

'দুঃখিত, স্যার,' ডিউটি অফিসার বলল। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট

আগে বেরিয়ে গেছেন ডেপুটি ডিরেক্টর। বলে গেছেন, আপনি এলে বা ফোন করলে আপনাকে বলতে বাড়িতে রিঙ করুন··· ।'

মার্গারেটের সাথে যোগাযোগ করতে হবে? কেন?

আবার ডায়াল করলেন জেফ রিকার্ড।

'জেফ, কোথায় তুমি?' অপরপ্রান্ত থেকে উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল মার্গারেট।

'কোথায় সে-কথা জানার দরকার নেই,' বললেন তিনি। 'পিকেরিং আমার জন্যে কোন মেসেজ রেখে গেছে?'

'লাইন কি নিরাপদ?'

'হ্যাঁ, আমি একটা ফোন বুদ থেকে বলছি। তবে ওদিকের স্ক্র্যা'লার অন করো।'

কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ হলো না। তারপর মার্গারেট যখন কথা বলল, ফাঁপা শোনাল তার কণ্ঠস্বর। স্ক্র্যা'লার কাজ করছে। তবে মার্গারেটের গলার উত্তেজনা ঠিকই টের পাওয়া গেল। 'তোমাদের একজন এজেন্ট টিউলিপকে এথেন্সে দেখেছে!' বলল সে। 'এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে পিকেরিং।'

'পিকেরিং রওনা হয়ে গেছে!'

'দু'বার তোমার খোঁজে ফোন করেছিল সে। আমাকে বলল, তার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব নয়। এথেন্স থেকে একটা টেলেক্স পেয়েছে সে, তার সেফে রেখে গেছে তোমার জন্যে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন জেফ রিকার্ড। মিলছে কি? মিলছে না কেন?

'কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, জেফ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন জেফ রিকার্ড। 'আর কি বলল পিকেরিং?'

'বলল, মেরিলিন শার্পের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তোমাকে—ইমিডিয়েটলি। পুরানো রোটাণ্ডায় পাওয়া যাবে তাকে।

নাম্বারটা খুঁজে দেব?'

শুকনো গলায় জেফ রিকার্ড বললেন, 'না, তার দরকার নেই।'

'কিছু একটা হয়েছে,' বলল মার্গারেট। 'তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ।'

'বলো, কিছু হতে বাকি নেই,' জবাব দিলেন জেফ রিকার্ড। 'জানি না কখন বাড়ি ফিরতে পারব, তবে চিন্তা কোরো না।'

'জেফ···?'

কিন্তু মার্গারেটের কথা জেফ রিকার্ড শুনতে পেলেন না, রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন। ফোন বুদে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। মনে মনে একটা প্ল্যান তৈরি করছেন। ভয়ঙ্কর একটা প্ল্যান।

একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। পিকেরিং যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কারও সাহায্য তিনি নেবেন না। তারমানে গোটা সি.আই.এ-কে এড়িয়ে চলতে হবে এখন।

কি নির্মম পরিহাস, সি.আই.এ-র ডিরেক্টর সি.আই.এ-কে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বিপজ্জনক একটা প্ল্যান তৈরি হলো, কিন্তু ঝুঁকিটা প্রকাণ্ড। তিনি উপলব্ধি করলেন, এ-ছাড়া তাঁর কোন উপায়ও নেই। রিসিভার তুলে আবার তিনি আরেক ন'রে ডায়াল করলেন।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল মিখাইল পোলোনভ। ওয়াশিংটন, সোভিয়েত দূতাবাসের ভাইস কনসালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সে। তার আরও একটা পরিচয়, আমেরিকায় কে.জি.বি-র সিনিয়র আবাসিক অফিসার।

চার

এথেন্স ফ্লাইট থেকে সবার আগে নামল হেনরি পিকেরিং। অফিশিয়াল পাসপোর্ট দেখিয়ে প্রায় সাথে সাথে কাস্টমস আর এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পেরিয়ে এল। টার্মিনাল ভবনের বাইরে তার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার সি.আই.এ. স্টেশন চীফ নয়, পদস্থ ল্যাংলি অফিসারের সাথে প্রকাশ্যে দেখা করবে না সে। একই কারণে যে মেয়ে-এজেন্ট টিউলিপকে দেখেছে তারও আসার কথা নয়।

কুইন সোফিয়া স্ট্রীটে মার্কিন দূতাবাস, গাড়ি দিয়ে সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে ড্রাইভারকে। নেহাতই ড্রাইভার, এসপিওনাজ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না। টার্মিনাল ভবনে, ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে পিকেরিঙের সাথে হাঁটতে শুরু করল সে। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, বলল, 'বাইরে গাড়ি আছে, স্যার।'

কালো একটা পন্টিয়াক, উজ্জ্বল রোদে ঝকঝক করছে। আশপাশে আরও কয়েকটা গাড়ি দেখল পিকেরিং। দুটো বাস, একটা লিমুসিন, তিনটে মাইক্রোবাস, ডজন দুয়েক প্রাইভেট কার। টার্মিনাল ভবন থেকে ভিড় করে বেরিয়ে আসছে লোকজন,

ঢুকছেও বহু লোক। হঠাৎ একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেল সে।

হাঁটার গতি শ্লথ হলো না, চোখে ফুটল না এতটুকু বিস্ময়। ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল, পিছনের সীটে চড়ল সে। ঘুরে সামনে চলে গেল ড্রাইভার, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। স্টার্ট নিল গাড়ি। টার্মিনাল চত্বর থেকে রাস্তায়, যানবাহনের সচল জটলায় বেরিয়ে এল। হেলান দিয়ে বসে থাকল পিকেরিং, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। তার দরকারও নেই, কারণ রিয়ার ভিউ মিররে ধূসর মার্সিডিজটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

এথেন্স ধূসর রঙের মার্সিডিজ মানেই ট্যাক্সি। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলোই ছিল। পিছু পিছু একটার আসার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আরোহী সেই পরিচিত লোকটা। শ্লাভিক অবয়ব, মুখের গড়ন অস্বাভাবিক চওড়া। লোকটা নিজেই ট্যাক্সি চালাচ্ছে।

সারটভ!

সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারের সাথে কথা বলল পিকেরিং। 'পিছনের ট্যাক্সিটাকে দেখছ?'

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল ড্রাইভার, তারপর আবার সামনের রাস্তায়। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে।

'ওটাকে খসাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল পিকেরিং।

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে দেরি কোরো না।'

অশুভ চেহারার কালো মেঘ আর হিম কুয়াশাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বসন্ত যেন হঠাৎ করে পিছিয়ে গেছে। বছরের এই সময়ে, দিনের বেলা, এমন অন্ধকার ভাব ওয়াশিংটনে কখনও দেখা যায় না।

হাতঘড়ি দেখলেন জেফ রিকার্ড। বিকেল পাঁচটা। ফুটব্রিজটা

মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি, ভার্জিনিয়া আর পেনিনসুলা টেডি রুজভেল্টকে এক করেছে। তিনি জানেন, সূর্যাস্তের সাথে সাথে পার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়–ইউ.এস. পার্ক সার্ভিসের নির্দেশ তো আছেই, পটোম্যাক নদীর জোয়ারও একটা কারণ। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, এখানে তাঁর রাত কাটাতে হবে না। দু'চার মিনিট আলাপ করে চলে যাবেন।

ব্রিজ পেরিয়ে এলেন সি.আই.এ. চীফ। দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড়, আর আকাশ ছোঁয়া গাছপালা, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। খানিকদূর সামনে ফাঁকা একটা জায়গা, ওল্ড রাফ রাইডারের বিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তি কালচে আকাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে, মূর্তির চারধারে চওড়া পাথুরে চাতাল। মূর্তিটাকে পাশ কাটিয়ে, চাতাল পেরিয়ে বনভূমির ভেতর ঢুকলেন জেফ রিকার্ড।

কারও সাথে তাঁর দেখা হলো না। এই রকম আবহাওয়ায় দেখা হওয়ার কথাও নয়। তবু পথটার দু'দিকেই একটা তীক্ষ্ণ চোখ রেখে ঘন ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর পিছন থেকে, ছোট্ট একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ হলো।

জেফ রিকার্ড ফিরলেন, হ্যাঁ, মিখাইল পোলোনভ। পরনে বিজনেস স্যুট, ওভারকোটের কলার তুলে ঘাড় ঢাকা দিয়ে রেখেছে। তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, কি ভাবছে বোঝার কোন উপায় নেই, তবে মুখের চেহারা থমথম করছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগোলেন জেফ রিকার্ড। 'বলুন?'

'সাধ্যমত করেছি আমি,' পোলোনভ বলল। 'ইউরি সারটভকে পিকেরিঙের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। ইউরোপে সারটভ আমাদের সেরা।'

'তারপর?'

পোলোনভ এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। 'আপনার পিকেরিং ঘাস খায় না। সারটভকে খসিয়ে দিয়েছে।'

'ইউরোপের সেরা, আপনাদের সারটভ?'

'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল পোলোনভ। 'কেউ কারও চেয়ে কম যায় না, দু'জনেই সমান চতুর।'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন, পিকেরিং মাঠ থেকে অনেক দিন হলো অবসর নিয়েছে। আপনার রিপোর্ট আমাকে হতাশ করল, কমরেড পোলোনভ।' জেফ রিকার্ড তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন। 'পিকেরিংকে আমার পেতেই হবে!'

আড়ষ্ট একটু হাসল পোলোনভ। 'ঠিক এই পর্যায়ে ব্যাপারটা একটু অযৌক্তিক দেখায় না?'

'আপনার কোন ধারণা নেই প্রয়োজনে কতটা অযৌক্তিক আমি হতে পারি,' কঠিন সুরে জবাব দিলেন জেফ রিকার্ড। হতাশায় পিছন ফিরলেন তিনি। সারটভ যদি ওদের সেরা এজেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে আর আশ্চর্য কি পিকেরিং তাকে দেখামাত্র চিনতে পারবে। পোলোনভের দিকে ফিরলেন তিনি। হঠাৎ করেই নতুন একটা চিন্তা তাঁকে রীতিমত ধাক্কা দিল। একটার পর আরেকটা। সবগুলো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, পোলোনভকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে দৃষ্টি।

এখন তিনি জানেন টিউলিপ কনওয়েকে কিডন্যাপ করার হুকুম কে দিয়েছিল। তাঁর মনে হলো, কারণটাও তাঁর জানা। শুধু তাই নয়, টিউলিপ কোথায় আছে তাও তিনি আন্দাজ করতে পারলেন।

টিনের কৌটা আর কাগজের প্যাকেট খুলে টিউলিপের প্রিয় খাবারগুলো এক এক করে বের করল রানা। ক্যাণ্ডি, পীনাট বাটার, আইসক্রীম, স্যাণ্ডউইচ, পাইনঅ্যাপল জুস, স্ট্রবেরি, পনির, আর দুধ। কোমরে হাত রেখে সব দেখল টিউলিপ, তারপর মন্তব্য করল, 'তুমি দেখছি আমাদের মার্কেটিং অফিসারের

চাকরিটা খাবে, মি. গ্রেসন। এত ভাল বাজার করতে পারো।'

বেদম হাসি পেল রানার। এত থাকতে টিউলিপ ওকে বাজার সরকার ভাবল। তবে মেয়েটাকে যতই দেখছে ও, ততই বিস্মিত হচ্ছে। কে বলবে মাত্র চার বছর বয়স, কথা শুনে মনে হবে পাকা বুড়ি। তবু তো মেয়েটার প্রাণচাঞ্চল্য এখনও পুরোপুরি ফিরে আসেনি।

শেষ প্যাকেটটা খুলল রানা। টিউলিপের চোখ কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছিল, প্যাকেট খোলা হতে প্রায় আঁতকে উঠল সে, এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ওমা, কি ওটা?'

হেসে উঠল রানা। 'অক্টোপাস। এক কামড় চলবে নাকি?'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল টিউলিপ। 'শুধু আব্বা খুব পছন্দ করেন, আর কেউ আমরা ছুঁয়েও দেখি না।'

'এসো, বসো,' প্যাকেটের ভেতর অক্টোপাস ভরে রেখে বলল রানা। 'তোমাকে খাইয়ে তারপর আমি খাব।'

'ইস, আমি যেন কারও হাতে খাই!' সগর্বে বলল টিউলিপ। 'সেই যখন থেকে হাঁটতে শিখেছি তখন থেকে নিজের হাতে খাই আমি।' এগিয়ে এসে চেয়ারটায় বসল সে। 'নাও, তুমি শুরু করো।'

মেয়েটাকে নিয়ে কোন ঝামেলাই হচ্ছে না রানার। অচেনা একটা বাড়িতে রানার সাথে একা আছে, আপনজনদের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তবু কোন প্রশ্ন বা কান্নাকাটি নেই। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এ-ধরনের অচেনা পরিবেশে প্রায়ই থাকতে হয় তাকে, এবং রানার আন্তরিক যত্ন তার মন জয় করে নিয়েছে।

একটা সময় বোধহয় সব পুরুষের জীবনেই আসে যখন সন্তানের পিতা হবার সাধ জাগে মনে। সাধ জাগলেও, সেটা পূরণ হবার সম্ভাবনা আপাতত রানার জীবনে নেই। ওর মনে হয় বটে,

সোহানাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভালবাসে ও, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই চারদিক থেকে কতরকম দ্বিধা, ভীতি, আশঙ্কা, সংশয়, সংকোচ, অনীহা, ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আসল সমস্যা, ওর এই পেশা। হঠাৎ যদি মারা যায় ও? যে-কোন মুহূর্তে যেতে পারে। খুব ভাল করেই জানা আছে, তারপর বাকিটা জীবন বিধবা হয়ে কাটিয়ে দেবে সোহানা, আর কোন পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না পর্যন্ত। সমস্যা আরও আছে। বাঁধনে জড়ালে এই স্বাধীন জীবন হারাতে হবে। অথচ হারাতে মন চায় না। তাছাড়া, পুরোদস্তুর সংসারী হওয়া যাকে বলে, তা কোনদিনই কি হতে পারবে ও? ওর প্রকৃতির মধ্যেই জিনিসটা নেই। প্রতিবার চিন্তা-ভাবনার শেষে সিদ্ধান্ত নেয় ও, এই তো বেশ আছি, –একা, স্বাধীন, লাগামহীন বুনো ঘোড়া। তবু দুর্বল মুহূর্তগুলোয় ঘর বাঁধার সাধ জাগে বৈকি, সন্তানের পিতা হতে ইচ্ছে করে। ফুলের মত ফুটফুটে শিশু দেখলেই কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে।

সেই আদর পেয়েই রানাকে আপনজন ভেবে নিয়েছে টিউলিপ।

নিজের হাতেই খেলো টিউলিপ, তবে এক এক করে রানা তার সামনে এগিয়ে দিল খাবারগুলো, বুঝিয়ে-শুনিয়ে সবগুলো থেকে একটু একটু করে খাওয়াল। সবশেষে দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে বসল টিউলিপ, তার কোলের ওপর খেলনা ভাল্লুকটা দিয়ে এল রানা।

'লুকোচুরি খেলা?' জিজ্ঞেস করল টিউলিপ।

'দশ মিনিট পর।'

'কানামাছি?'

'বিকেলে।'

'তারমানে দুপুরে তুমি আমাকে ঘুম না পাড়িয়ে ছাড়বে না,

এই তো?' মুখ টিপে হাসল টিউলিপ। 'আচ্ছা, একসাথে ক'টা চাকরি করবে তুমি, শুনি? শেষ পর্যন্ত মিসেস কেনটারকির চাকরিটাও খেতে চাও?'

জবাবে শুধু মিষ্টি একটু হাসল রানা। টেবিল পরিষ্কার করার সময় বারবার টিউলিপের দিকে তাকাল ও। দুধের গ্লাস শেষ করে ভাল্লুকটা নিয়ে খেলায় মগ্ন সে।

এক হ—া হলো আমেরিকা থেকে তাকে বের করে এনেছে রানা। হফ ভ্যানডেরবার্গের কফিনের নিচে, ফলস কমপার্টমেন্টে ভরে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ক্রীটে এনেছে আজ দু'দিন। উপাদেয় খাবারদাবার, আর মুক্ত নির্মল বায়ু টিউলিপের চোখের নিচে জমে ওঠা কালি মুছে দিয়েছে, মুখে ফিরে এসেছে লালচে আভা।

টেবিল পরিষ্কার করে খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। হেরাল্ড ট্রিবিউন-এ আন্তর্জাতিক খবরের অভাব নেই। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে ব্রিটেনে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্যে কে দায়ী তাই নিয়ে জার্মানীতে বিতর্কের ঝড়। ওয়াশিংটনে, ক্যাপিটলের কাছে, একজন কংগ্রেস সদস্য খুন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়ে কিডন্যাপ সম্পর্কে কোন খবর নেই। ভেতরের পাতা খুলল রানা।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন।

প্রায় চমকে উঠে মুখ তুলল রানা।

'দেখে হয়তো মিসেস কেনটারকি ফোন করেছেন,' জানালার কাছ থেকে বলল টিউলিপ। 'তোমার চাকরির মেয়াদ বুঝি ফুরোল!'

মিষ্টি হেসে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা, বলল, 'ফোনে কথা বলার সময় তুমি কিন্তু আমাকে ডাকবে না, কেমন?'

খিল খিল করে হেসে উঠল টিউলিপ। 'ও, তুমি বুঝি ভেবেছ একা থাকতে আমার ভয় করবে!'

'জোয়ান অভ আর্ক!' বলে পাশের কামরায় চলে এল রানা, রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?'

একটা মেয়ের গলা, 'অবশেষে ঝামেলা চুকল।' সাঙ্কেতিক মেসেজ, কর্নেল অবসনের তরফ থেকে এল।

'আমি বাঁচলাম,' পাল্টা সঙ্কেত দিল রানা। 'কেমন আছ?' কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার চিনতে পেরেছে ও।

'ব্যস্ত,' বলল জিনা। 'তোমার জন্যে উইলিয়াম অবসনের একটা মেসেজ আছে।'

'জানি। অবশেষে ঝামেলা চুকল। কখন?'

'আজ মাঝরাতে। নসোস-এ। গোলাপ কুঁড়ি বাড়ি ফিরছে।'

'আজ রাতে! কিন্তু অবসন আমাকে বলেছিলেন এখানে আমাকে দু'হ—া বা তারও বেশি থাকতে হবে। হঠাৎ তাড়াহুড়ো কেন, খারাপ কিছু ঘটেছে?' রানার মনে সন্দেহ।

'কি জানি, আমি তো কিছু জানি না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, প্ল্যানটা কি বলো।'

'সহজ। টিউলিপকে আপনি অবসনের হাতে তুলে দেবেন, অবসন তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

'তারপর কি ঘটবে?'

'তা তো জানি না। দেখা হলে অবসনকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।'

হ্যাঁ, ভাবল রানা, কর্নেল অবসনকে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করার আছে ওর। কিন্তু সে-সব পরে। 'নসোস-এ নাইট গার্ড আছে, তাই না?'

'মাত্র দু'জন—একজন গেটে, আরেকজন ভেতরে। অবসনের অনুরোধ, উনি পৌঁছুবার আগে ওদের একটা ব্যবস্থা করবেন আপনি।'

'পালা বদল হয় না?'

'হয়। রাত ন'টায় আসে গার্ড, দু'জন, সকাল পর্যন্ত থাকে। পালাবদল হয় সকাল সাতটার পর।'

প্ল্যানটা ঠিক পছন্দ হলো না রানার। জায়গাটা বড় বেশি নির্জন। তবে নসোসে মূল্যবান এমন কিছু নেই যে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। বেশিরভাগ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হেরাক্লিয়ন মিউজিয়ামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 'তুমিও কি থাকবে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সন্দেহ আছে।'

'খারাপ কথা।'

'এই ব্যাপারটা মিটে গেলে আবার আমাকে পাওয়া যাবে।'

অপরপ্রান্তে পরিচিত হাসিটা কন্ধনায় দেখতে পেল রানা। 'কথাটা মনে থাকবে,' বলল ও।

'গুড। তাহলে মাঝরাতে, কেমন?' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নড়ল না রানা, হাতে রিসিভার নিয়ে জানালা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জলপাই ঝোপের দিকে। জানে, স্বস্তিবোধ করা উচিত ওর। বিপদ প্রায় কেটে গেছে, কর্নেল অবসনের হাতে টিউলিপকে তুলে দিতে পারলে আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু উদ্বেগ আর সন্দেহের অনুভূতি ছাড়ছে না ওকে, বরং আরও বেড়ে গেল। সঙ্কেতটা বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছুল। মাত্র দু'দিন হলো ক্রীটে রয়েছে ওরা, অথচ থাকার কথা ছিল কমপক্ষে দু'হপ্তা। কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে?

কিচেনের দিকে পিছন ফিরল রানা।

'কার ফোন জানতে পারি?'

ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খবরের কাগজটা তুলে নিল রানা। টিউলিপের বেডরুমে এসে ঢুকল। 'মিসেস

কেনটারকির নয়। তবে তাকে তুমি খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে। তোমার বাবা-মাকেও।'

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কচি মুখটা। 'কখন?'

'কখন তা এখনই বলা যাচ্ছে না, তবে বেশি দেরি নেই।'

'বাবাকে বলব, তুমি আমার খুব যত্ন নিয়েছ,' বলে আবার আপনমনে খেলতে শুরু করল টিউলিপ।

খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় মন দিল রানা। কিন্তু টিউলিপ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়।

'কি মজা, কি মজা, জেফ কাকার ছবি ছাপা হয়েছে!'

কাগজটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল রানা। সত্যিই তাই, সি.আই.এ. চীফের ছবি ছাপা হয়েছে। তাঁর দু'পাশে দু'জন কূটনীতিককে দেখা যাচ্ছে। জেফ কাকা, হুহ্–ভাবল রানা। টিউলিপ হয়তো বিশ্বাসই করবে না তার এই জেফ কাকাকে হাতেনাতে ধরার জন্যেই···

টিউলিপের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর আবার মন দিল পড়ায়।

'জেফ কাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কবে?' জিজ্ঞেস করল টিউলিপ, খেলায় তার আর মন নেই।

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। পড়ার বারোটা বাজল। কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ারের উপর রাখল ও। টিউলিপের দিকে তাকাল। 'কে বলল তোমাকে জেফ রিকার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন?'

'কে আবার, বাবা!'

রানার একটা ভুরু কপালে উঠে গেল।

'আমাকে নয়, আম্মিকে–আমি শুনে ফেলেছি।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে রোদ ঝলমলে বাগানের দিকে তাকাল টিউলিপ। 'আমাকে ফাঁকি দিতে চাও, তাই না? কই, সাঁতারের

কথা ভুলেও তো মুখে আনোনি। বলো কখন যাবে!'

'ঘুম থেকে ওঠার পর,' বলল রানা। কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে টিউলিপের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'জেফ কাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন। তোমার বাবা বলেছেন—কবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিউলিপ। তার মনে নেই, বা আগ্রহ নেই। হয়তো জানেই না। 'তোমার সবটুকু কিন্তু ভাল না—এখনই সাঁতার কাটতে গেলে কি হয় শুনি!'

'এই গরমে? পানি থেকে ওঠার সাথে সাথে আবার আগুন হয়ে যাবে গা। বিকেলে রোদ পড়ে আসবে, তখন, কেমন?' কাগজটা আবার তুলে নিল চেয়ার থেকে।

'আগামী ইলেকশনের পরে।'

মুখ তুলল রানা। 'কি?'

'বাবা তাই বলেছেন। আগামী ইলেকশনের পর জেফ কাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন।' হঠাৎ টিউলিপের চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠল। 'আগামী ইলেকশন কবে বলো তো?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা, কিন্তু আগ্রহে ছটফট করে উঠল মন। 'তোমার বাবা তাই বললেন? তোমার ঠিক মনে আছে?'

'বলল, শুনলাম, মনে থাকবে না কেন?'

'কখন?'

'এই তো বললাম।'

'না, কখন তিনি কথাটা বলেন?'

'জানি না।'

কাগজটা আবার চেয়ারে রাখল রানা, উঠে জানালার পাশে, টিউলিপের সামনে দাঁড়াল। 'লক্ষ্মী সোনা, মনে করার চেষ্টা করো। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বুঝলে? চিন্তা করো, মনে পড়বে। ঠিক কখন তোমার বাবা-মা কথা বলছিলেন?'

কবে চোখের পাতা বন্ধ করল টিউলিপ। ঝাড়া এক মিনিট

পর খুলল আবার। 'আমি তখন একটা উপহারের প্যাকেট খুলছিলাম।'

'কি রকম উপহার?'

'একটা বই। বেড়াতে যাব, তাই...'

'মিশিগানে?'

মাথা ঝাঁকাল টিউলিপ।

'মিশিগানে বেড়াতে যাবার আগে—কোন্ দিন?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল টিউলিপ। তারপর হঠাৎ তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল হাসি। 'সেদিনই, যেদিন আমরা মিশিগানে বেড়াতে যাই।'

'তোমার ঠিক মনে আছে?' জরুরী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভাল করে মনে করে দেখো—সেদিনই, না অন্য কোন দিন?'

চেয়ার থেকে নেমে ভাল্লুকটা মেঝেতে রাখল টিউলিপ, কোমরে হাত রেখে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমাকে কি ভাবো তুমি, মি. গ্রেসন? অনেক কথা ভুলে যাই বটে, কিন্তু যেটা মনে পড়ে সেটা ঠিকভাবেই মনে পড়ে। আমি নিজের হাতে বইটা সুটকেসে রাখি, সেদিনই প্লেনে চড়ি আমরা।'

যেদিন মিশিগানের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল টিউলিপ। নিউ ইয়র্কে রানার সাথে কর্নেল অবসনের দেখা হওয়ার পুরো এক হপ্তা পরে।

স্থির পাথর হয়ে বসে থাকল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কচি মেয়েটার দিকে। বেচারি নিজের অজান্তেই এমন একটা তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল রানার। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড কনওয়ে যদি জানেন সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ড রাশিয়ার হয়ে কাজ করছেন, তাহলে কেন তিনি তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাইবেন?

তারমানেই দাঁড়ায়, কর্নেল অবসন ওকে মিথ্যে কথা বলেছে। প্রেসিডেন্ট টিউলিপকে কিডন্যাপ করার অনুমতি দেননি।

টেবিলের কাছে ফিরে এসে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল রানা। চমকে উঠে রানার দিকে তাকাল টিউলিপ। 'ফ্রেণ্ড, কি হলো তোমার? তুমি কি অসুস্থ?'

জোর করে হাসল রানা। 'আরে না। একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, তুমি খেলো।'

ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার কমাণ্ডার-ইন-চীফ-ও বটেন, তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে রানা। ওকে বলা হয়েছিল, এই কাজে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন আছে, এমনকি একটা অনুমতি-পত্রও দেয়া হয়েছিল ওকে।

জাল।

তারমানে টিউলিপ কিডন্যাপ হবার আগে এ-সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কিছু জানতেনই না। প্ল্যানটা তাহলে কর্নেল অবসনের একার, প্রেসিডেন্টের কোন ভূমিকা নেই।

মেয়েকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই পাগলপারা হয়ে আছেন। দুনিয়ার সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ তিনি, কিডন্যাপারকে কি শাস্তি দেয়ার কথা ভেবে রেখেছেন একমাত্র তিনিই জানেন।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। তারপর নিজের ওপর রাগ হলো। অবসনের মত একটা লোক তাকে এমন রাম বোকা বানিয়ে ছাড়ল!

কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হলো রানার। জীবনে বোধহয় এই প্রথম নিজের কাছে স্বীকার করল ও, ভয় করছে। খুলিতে কেউ রিভলভারের নল ঠেকালে যে-ধরনের ভয় জাগে মনে, এটা সেরকম নয়। জীবনের ভয় নয়, ভয় স্বাধীনতা হারাবার।

স্বাধীনতা মানেই তো জীবন। স্বাধীনতাহীন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

'মি. গ্রেসন?'

পাশে চলে এসেছে টিউলিপ, ওর শার্টের আস্তিন ধরে মৃদু টান দিল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, কেমন যেন দিশেহারা দৃষ্টি চোখে। 'কিছু বলবে?'

ঠোঁট ফুলে রয়েছে টিউলিপের, অভিমান হয়েছে। 'কি এমন সমস্যা যে তুমি আমার সাথে কথাও বলছ না···।'

আদর করে কচি মেয়েটাকে কাছে টেনে নিল রানা। বুকে জাপটে ধরে চুমো খেল তার কপালে। 'দুঃখিত, মাণিক। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এসো, এবার লুকোচুরি খেলি। যাও, আগে তুমি লুকাও।'

'বারে, তুমি আগে চোখ বন্ধ করো—ভেবেছ কোথায় লুকাব দেখে নেবে, না?'

চোখ বন্ধ করল রানা। এখন আর ভয় লাগছে না। রাগে কষকষ করছে শরীর। কর্নেল অবসনকে দেখে নেবে ও। ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধন। অবসন ওকে ব্যবহার করেছে। ঠেলে দিয়েছে ভয়ঙ্কর এক বিপদের মুখে। তাকে রানা ক্ষমা করবে না।

একটু পর রাগও আর থাকল না। ভাবাবেগে অন্ধ হবার সময় নয় এটা। গোটা ব্যাপারটা সাবধানে বিশ্লেষণ করতে হবে, গভীর চিন্তা-ভাবনার দরকার, নিখুঁত একটা প্ল্যান চাই। প্রেসিডেন্ট কিছু জানেন না, অবসন মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু সে কি জেফ রিকার্ড সম্পর্কেও মিথ্যে কথা বলেছে? তা যদি হয়, তাহলে টিউলিপকে কিডন্যাপ করাল কেন?

একটা ব্যাপারে রানা নিশ্চিত, রাত কাবার হবার আগেই অবসনকে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রতিটি ব্যাখ্যা

সন্তোষজনক হওয়া চাই। তা না হলে তার কপালে খারাবি আছে।

'এই যে আমি এখানে!' দরজার ওদিক থেকে টিউলিপের চিৎকার ভেসে এল। চোখ মেলল রানা। খোলা দরজার দিকে এগোল।

সাক্ষাতের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। আজ মাঝরাতে, নসোসে। গোলাপ কুঁড়ি বাড়ি যাচ্ছে।

সত্যি কি যাচ্ছে?

পাঁচ

সামনে যানবাহনের বেয়াড়া ভিড়, কিন্তু ফাঁক গলে তীরবেগে ছুটল জেফ রিকার্ডের গাড়ি। জানেন ট্রাফিক পুলিস আটকাতে পারে, তবু স্পীড লিমিট মানছেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোয়াইট হাউসে পৌঁছুতে হবে তাঁকে।

সরাসরি হোয়াইট হাউসে ঢুকল গাড়ি, গেট পেরোবার সময় হাত নাড়লেন গার্ডদের উদ্দেশে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামলেন ওয়েস্ট উইং এনট্রান্সের সামনে। ভেতরে ঢুকে একজন এইড-কে পাশ কাটালেন নিঃশব্দে, একটা দরজা খুলে স্টাফ অফিসে চলে এলেন।

'মি. ডিরেক্টর।' তাঁর পিছু পিছু এল এইড।

কিন্তু জেফ রিকার্ড তাকে দেখেও দেখলেন না। একটা আউটার অফিসে ঢুকলেন তিনি, কামরাটা ওভাল অফিসকে ঘিরে রেখেছে।

রিচার্ড কনওয়ের সেক্রেটারি, ঘুমহীন লাল চোখে রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে মুখ তুলল। অপর একজন লোক উত্তেজিতভাবে মেয়েটার ডেস্কের সামনে পায়চারি করছে। লোকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্টের গেট-কীপার বলা হয় তাকে। ঘরে ঢুকতেই সে-ও ঝট্ করে জেফ রিকার্ডের দিকে তাকাল। 'আপনি ছিলেন কোথায়, স্যার? এক ঘণ্টা ধরে কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি আমরা···।'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন জেফ রিকার্ড। 'প্রেসিডেন্টের সাথে এই মুহূর্তে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলে ভারী দরজাটার দিকে এগোলেন তিনি।

তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি। 'এখন কিভাবে সম্ভব, স্যার? তিনি ই.ও.বি.-তে যাবার জন্যে রওনা হয়ে গেছেন। প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন।'

'প্রেস কনফারেন্স?' আকাশ থেকে পড়লেন জেফ রিকার্ড।

'আপনি জানেন না? প্রেসিডেন্ট রিজাইন করতে যাচ্ছেন!'

হতভ' জেফ রিকার্ড লোকটার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। 'কিন্তু কেন?'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি শুধু উদ্বিগ্ন নয়, উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে রয়েছে। 'একমাত্র ঈশ্বর জানেন! কিভাবে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে, টিউলিপ কিডন্যাপ হওয়ার জন্যে একমাত্র তিনিই দায়ী। এবং তিনি যদি পদত্যাগ করেন, টিউলিপকে আটকে রাখার আর কোন কারণ থাকবে না কিডন্যাপারদের।'

চোখ ছোট করে জেফ রিকার্ড বললেন, 'তাকে তোমার থামাতে হবে।'

হতাশায় মুষড়ে পড়ার ভঙ্গি করে হাত নাড়ল সেক্রেটারি। 'চেষ্টার ত্রুটি করিনি, স্যার। সবাই আমরা ফেল করেছি। তিনি কারও কথা শুনবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে বলছি না, আমি বলছি তাকে থামাও!' স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গর্জে উঠলেন সি.আই.এ. চীফ। 'শোনো, ইউ বাস্টার্ড, প্রেসিডেন্ট মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে এখানে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে তোমার। তাঁকে বলো, পামেলা কনওয়ে মারা গেছে। যা খুশি বলো, শুধু ফিরিয়ে আনা চাই তাঁকে। সাবধান, আসার পথে কারও সাথে তাঁকে কথা বলতে দিয়ো না।'

গেট-কীপার এক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ডেস্কের পিছনে বসা মেয়েটার দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। চোখ লাল করে কোন লাভ হবে না। নিজেকে সামলাও, সারারাত ব্যস্ত থাকতে হবে। কোন রকম ইতস্তত না করে দরজা খুলে ওভাল অফিসে ঢুকলেন তিনি–একা।

নসোসে যাবার পথে, দু'পাশে সার সার গাছ। কিছু গাছ কেটে ফাঁকা একটা জায়গা বের করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে পাকা পার্কিং লট। এই মুহূর্তে দুটো গাড়ি রয়েছে ওখানে। লোহার চেইন দিয়ে তৈরি আধুনিক বেড়া ঘিরে আছে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। রাত প্রায় দশটা। দিনের আলো অনেক আগেই নিভে গেছে, সেই সাথে বিদায় নিয়েছে শেষ ট্যুরিস্ট লোকটাও।

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ কিছুই দেখা যায় না। জায়গাটাকে ঘিরে আছে মাথা উঁচু সার সার গাছ, আর ঝোপ-ঝাড়। তবে পাহাড়ের মাথা থেকে ফ্লাডলাইটের আলো আসছে নিচে, গেট হাউসটা পরিষ্কার দেখা গেল। স্যুভেনিরের দোকানটা বন্ধ, বন্ধ টিকেট কাউণ্টারও। কাউণ্টারের পাশের কামরাটাই গার্ডরুম, ওখান থেকে গেট পাহারা দেয় গার্ড।

বাতাসের সাথে ভেসে এল কফির গন্ধ, আর রেডিওর গান।

গাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা, কাঁকর ছড়ানো পথ এড়িয়ে নরম মাটিতে পা ফেলে এগোল ও। গেট হাউসের দিকে যাচ্ছে, পিছন থেকে। কাছাকাছি পৌঁচেছে, রেডিওর গান বন্ধ হয়ে গেল। অনুষ্ঠান ঘোষক গ্রীক ভাষায় সময় বলছে। তারপর শুরু হলো খবর।

মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শুনল রানা। কংক্রিটের মেঝেতে বুট জুতোর শব্দ হলো। খবর পাঠকের গলা মাঝপথে থেমে গেল, ডায়াল ঘোরাল কেউ। অন্য স্টেশন ধরা হলো, আবার গান শোনা গেল। ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল গার্ড।

গার্ড হাউসের দেয়াল ঘেঁষে এগোল রানা। বাঁক নিল। পরের দেয়ালের কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে তাকাল সামনে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে গার্ডরুমের দরজা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকল ও। তারপর ঝুঁকে এক মুঠো কাঁকর তুলে নিল, ছুঁড়ে দিল বেড়া লক্ষ্য করে।

লোহার ওপর পাথর বৃষ্টি হলো, বেশ জোরালই হলো আওয়াজটা। শুনতে পেয়ে রেডিও বন্ধ করল গার্ড, কান পাতল। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে নড়ল না।

আরও এক মুঠো কাঁকর তুলল রানা।

এবার নড়ে উঠল চেয়ার। ঘরের ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল দরজার দিকে। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মুখ খুলে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। নড়ে উঠল একটা হাত, দেখে নিল রিভলভারটা বেল্টে ঠিক মত আছে কিনা।

দরজা খোলার শব্দ।

চৌকাঠ পেরিয়ে আলো-অন্ধকারে বেরিয়ে এল গার্ড।

লোকটাকে ঘাড় ফেরাবার কোন সুযোগই দিল না রানা। এক

হাতের কিনারা দিয়ে ওর ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড এক কোপ মারল, অপর হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখ। তারপর দুই হাত দিয়ে অজ্ঞান দেহটাকে ধরে ফেলল মাটিতে পড়ার আগেই, নামিয়ে রাখল ধীরে ধীরে।

টেনে গার্ডরুমের ভেতরে আনা হলো লোকটাকে। পকেট থেকে প্লাস্টিক সিরিঞ্জ বের করল রানা। সারারাত ঘুমোবার জন্যে যথেষ্ট তরল ভ্যালিয়াম আছে সিরিঞ্জে।

চারদিকের দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। ফিউজ বক্সটা দরজার পিছনে। এক ঝটকায় খুলল সেটা, ভেতরের ওয়্যারিং পরীক্ষা করল, যা খুঁজছে পেয়ে গেল। মাস্টার সুইচ ধরে টান দিল জোরে, মাথার ওপর বালবটা নিভে যেতে অন্ধকার হয়ে গেল গার্ডরুম, একই সাথে নিভে গেল বাইরে পাহাড়ের মাথার ওপর ফ্লাডলাইট।

দরজার পিছনে আরও একটু সরে দাঁড়াল রানা। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

পাঁচ মিনিটও পেরোল না, খোঁজ নিতে এল দ্বিতীয় গার্ড। বাইরের চাঁদের আলোকে ম্লান করে দিয়ে জ্বলে উঠল তার টর্চ। গেটের ওদিক থেকে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ।

একটু পরই তার গলা শোনা গেল, 'রিকো?'

মেঝেতে পড়ে থাকা গার্ড একচুল নড়ল না।

'রিকো?' এবার আগের চেয়ে জোরে ডাকল।

গার্ডরুমে কোন শব্দ নেই।

টর্চের আলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে গার্ডরুমের দরজা থেকে সরে গেল, ভেতর থেকে গেটের তালা খুলছে দ্বিতীয় গার্ড। ঘড় ঘড় শব্দে খুলে গেল লোহার গেট, কাঁকর ছড়ানো পথে বুট জুতোর ভারী আওয়াজ এগিয়ে আসতে লাগল। গার্ডরুমের ভেতর আলো পড়ল টর্চের।

আলোর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল গার্ড। 'রিকো!' হাঁটু ভাঁজ করে সঙ্গীর পাশে বসল সে। লাফ দিয়ে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, হাতের কিনারা দিয়ে এ-লোকটার ঘাড়েও প্রচণ্ড এক রদ্দা মারল। সঙ্গীর পাশে ধরাশায়ী হলো লোকটা। পকেট থেকে আবার সিরিঞ্জটা বের করল রানা।

তারপর, সাবধানের মার নেই ভেবে, দু'জনের মুখেই টেপ লাগিয়ে দু'জোড়া হাত পিছমোড়া করে বাঁধল ও। সিধে হয়ে দাঁড়াল, পিছিয়ে গিয়ে কাজগুলো কেমন হয়েছে খুঁটিয়ে দেখল। হাত দু'জোড়া বাঁধার পরও বেশ খানিকটা রয়ে গেছে নাইলন কর্ড, সেটা দিয়ে পা দু'জোড়াও বাঁধল এবার।

গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে গেট পেরোল ও, উঠে এল পাহাড়ে। কাইরাটোস নদীর ওপর এখানে এককালে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল মিনোস প্রাসাদ। প্রাচীন বা আধুনিক যে-কোন মানের বিচারে প্রাসাদটা ছিল বিশাল। বহুতল প্রশস্ত কাঠামোর বিস্তার ছিল পাঁচ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে, সে-যুগে একসাথে আশি হাজার লোকের জায়গা সংকুলান হত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থাপত্য-বিস্ময়, সে-সময় এমনকি প্রাচীন গ্রীস সভ্যতারও সূচনা ঘটেনি।

আগাম কোন আভাস না দিয়ে মৃত্যু গ্রাস করে নসোসকে। নদীটা এখনও রয়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রাসাদটা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে, পাথরের স্তূপ ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত ভয়ঙ্কর কোন ভূমিকম্প ঘটেছিল, তাতেই চার হাজার বছর আগে মিনোয়ান সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটে যায়।

আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ, আর্কিওলজিস্টের শাবলের আঘাত খাবার জন্যে। একতলার কাঠামো দেখে মনে হয়, পুরোটাই ছিল পাথরের তৈরি–মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠান, চারদিকে মোটা ভিত, ভিতের পাথর কেটে তৈরি শয়ে শয়ে ঘর। ভাঙা, ফাটল ধরা

পাথরের ফাঁকে ঝোপ গজিয়েছে।

কিছু কিছু দেয়াল, দশ বিশটা ঘরের অংশবিশেষ, মেরামত করা পাঁচিল, থামের ওপর পাথুরে বারান্দা, ভাঙাচোরা খিলান, ইত্যাদি দেখে কল্পনা করে নিতে হয় গোটা ব্যাপারটা কি রকম ছিল। কাত হয়ে পড়া কিছু পিলার, টাওয়ার, আর পাঁচিল খাড়া করা হয়েছে, নতুন করে রঙ চড়ানো হয়েছে গায়ে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই রয়েছে বুল'স হর্ন–কারুকাজ করা পাথুরে বুল'স হর্ন, একেকটা মানুষ সমান উঁচু, এককালে প্রাসাদ পাঁচিলের মাথায় শোভা পেত, মধ্য যুগের কোন দুর্গের চারধারে টাওয়ারের মত।

পাহাড়ের গোড়া থেকে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, কান পেতে শুনল রানা। নদীর কলকল ছলছলও এখান থেকে পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। দূরে হেরাক্লিয়ন শহরের আলো জ্বলছে। তাছাড়া মানুষের তৈরি কোন আলো এই মুহূর্তে নেই এখানে। চার হাজার বছর আগে ধ্বংস হবার পর নসোস যেমন ছিল প্রায় তেমনি আছে। বড়, কালো একটা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ। ধ্বংসাবশেষের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে রানা ভাবল, প্রতিটি সভ্যতাই আসলে অভিশ¬, এক সময় না এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ সৃষ্টি করতে ভালবাসে, কিন্তু তার ধ্বংস-প্রবণতা আরও জোরাল। এই মানুষই তো পৃথিবীকে কয়েকশোবার ধ্বংস করার মত পারমাণবিক বোমা তৈরি করে রেখেছে। এবং তৈরি করাই হয়েছে ফাটাবার জন্যে। এত সাধের আধুনিক সভ্যতা, তাও বিলু¬ হয়ে যাবে, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। চিন্তার ডালপালা গজাল। সভ্যতা বটে, আধুনিকও বটে, কিন্তু কাদের জন্যে? গোণা-গুণতি কয়েকটা উন্নত দেশের কথা বাদ দিলে, বাকি দুনিয়ার কয়েকশো কোটি লোক মানবেতর জীবনযাপন

করছে। তাদের কাছে এই সভ্যতার কানাকড়ি দাম নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান প্রাণী হয়েও মানুষ এখনও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারেনি। মানুষ না খেয়ে মরছে, অথচ তারই পাশাপাশি বিপুল ব্যয়ে চলেছে অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা।

এ-সব চিন্তা মাথায় ঢুকলে নিজেকে বড় অসহায়, দুর্বল, আর অক্ষম মনে হয় রানার। বরাবরের মত আজও মাথা থেকে সব বের করে দিয়ে শান্ত হবার চেষ্টা করল ও। দুনিয়াটাকে উদ্ধার করা ওর কর্ম নয়, কাজেই সময়মত চিন্তা-ভাবনার লাগাম টেনে ধরা দরকার, তা না হলে পাগল হতে হবে।

মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিল চাঁদ। পাথুরে পথ ধরে এগোল রানা। এই পথ এক সময় তাজা রক্তে ভেসে গেছে। ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো ভিতের পাথর বেঢপ আকৃতির ছায়া ফেলেছে চারদিকে। কোথাও কোথাও গভীর খাদ দেখা গেল, এককালে ওগুলোয় তেল, মদ এই সব রাখা হত। কয়েকটার ভেতর উঁকি দিল রানা, অন্ধকার–তল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না।

ধ্বংসাবশেষের ওপর দিকে চোখ বুলাল রানা, প্রাসাদের যে ক'তলা আজও টিকে আছে। এত সব পাথরের নিচে, ওর পায়ের তলায় মাটির নিচে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্যাসেজ আছে, জানে রানা। একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা সমস্যা, গোলকধাঁধার মত। গাইড বা ম্যাপ ছাড়া ওখানে নামতে সাহস পায় না কেউ। কড়া নিষেধও আছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রানা। রাত বাড়ছে, অনেক কাজ বাকি।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে আছেন জেফ রিকার্ড, স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন ফোনের দিকে। দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ ফোন ওটা। আড়ি পাতা যন্ত্র আছে কিনা রোজ পরীক্ষা করা হয়, কোন

কোন সময় দিনে দু'বার। সেজন্যেই এখানে এসেছেন তিনি।

আসতে পেরেছেন সেজন্যে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রিচার্ড কনওয়েকে কোনভাবেই পদত্যাগ করতে দেয়া যায় না।

দরজা খোলার আওয়াজ। সি.আই.এ. ডিরেক্টর মুখ তুললেন। অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর চিবুক ঝুলে পড়েছে, চেহারা ম্লান। কিন্তু চোখ দুটো যেন দু'টুকরো অঙ্গার, জ্বলজ্বল করছে।

রাগ? ভাবলেন জেফ রিকার্ড। অসন্তোষ?

'কি বলার আছে তোমার, জেফ?' প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন, প্রাণপণ চেষ্টায় ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরায় কর্কশ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

চেয়ার ছেড়ে নড়লেন না জেফ রিকার্ড। কামরার অপরপ্রান্তে দাঁড়ানো পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কিভাবে কি ঘটেছে সব আমি বুঝতে পেরেছি।' এক মুহূর্ত থামলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'বিকট একটা সমস্যা, রিচার্ড!'

ওয়াশিংটন দূতাবাসে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। এইমাত্র হোয়াইট হাউস থেকে অল্লুত একটা অনুরোধ পেয়েছেন– শুধু অল্লুত নয়, ভীষণ জরুরী। ব্যাপারটা হজম করতে তিন সেকেণ্ড সময় লাগল তাঁর, তারপরই সামনের দিকে ঝুঁকে একটা বোতামে চাপ দিলেন। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইণ্টারকম।

'ইয়েস, স্যার?'

'ফরেন অফিসের সথে নিরাপদ একটা লাইন চাই,' অ্যামব্যাসাডর বললেন। 'এই মুহূর্তে।'

পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যে সেই একই অনুরোধ পেলেন আরও চারজন অ্যামব্যাসাডর। ইণ্টারন্যাশনাল অপারেটররা সারারাত ধরে ব্যস্ত থাকল–সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অসংখ্য বার্তা গেল আর এল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, এবং ইসরায়েলের কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্স তৎপর হয়ে উঠল অকস্মাৎ।

টানার মত সুতো যেখানে যা ছিল, সবগুলো টানলেন সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ড, শুধু একটা বাদে। ল্যাংলির সাথে তিনি কোন যোগাযোগ করলেন না। তাঁর নিজের এজেন্সি, সি.আই.এ-র সাহায্য তিনি নেবেন না।

□

রানার মতই কালো পোশাক পরা এক লোক মেরামত করা সাউথ গেট দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল। এখান থেকেই শুরু হয় ট্যুর। ভেতরে ঢুকে এক মুহূর্ত থামল সে, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে সামনে এগোল, খোলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বিশাল উঠানে। সিঁড়ির মাথায় আবার একবার থামল সে। চাঁদের আলো পড়ল তার মুখে।

কর্নেল উইলিয়াম অবসন।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'আপনি তো দেরি করার লোক নন,' বলল ও। বিশ মিনিট আগেই মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

'এর মানে কি, মি. রানা? এ-সব আপনি কি শুরু করেছেন?'

'শুরু করেছি!'

'করেননি? কি দরকার ছিল এই লুকোচুরি খেলার? এখন থেকে খুঁজছি আপনাকে? আপনার উচিত ছিল গেটের কাছে আমার সাথে দেখা করা।'

শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'ও, এই কথা,' সকৌতুকে বলল ও। 'কি করব বলুন, এই জায়গাটাই আমার পছন্দ হয়ে

গেল কিনা। তাছাড়া, আপনিও নিশ্চয় মানবেন, জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে।' সামনের প্রশস্ত দৃশ্যাবলীর ওপর চোখ বুলাল ও। ভাবল, ক্ষমতার আসন হিসেবে নসোস আদর্শ জায়গা, মিনোয়ান সম্রাটরা তা বুঝেছিলেন। প্রাচীন পাহাড়শ্রেণী চারদিক থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। নিচে জলপাই ঝোপ, সাইপ্রেস গাছ, গভীর জঙ্গল–জমাট অন্ধকারের সবটুকু দূর করতে পারেনি ম্লান চাঁদের আলো। নদীর ছলছল আর ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া রাতটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। 'তাছাড়া, মি. অবসন,' বলল রানা, 'আপনার সাথে আমার কথা আছে।'

'কথা আছে? কথা বলার সময় কোথায়! মেয়েটা কই?'

'টিউলিপ এখানেই আছে,' বলল রানা।

'ধেত্তেরি, এখানে কোথায়?'

'ওই নিচে।' সিঁড়ি ঢেকে রাখা একটা সমতল ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। পাশাপাশি পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি প্রাসাদের নিচের স্তরে নেমে গেছে। কোন কোন সিঁড়ি তিন-চার তলা পর্যন্ত নেমেছে, নিচে গলি-উপগলির গোলক ধাঁধা। 'ঠিক কোথায়, সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলে পারবেন আপনি। দিন দশেকের মধ্যে পেয়ে গেলে আপনাকে আমি ভাগ্যবান বলব।' কথা শেষ করে অবসনের দিকে ফিরল ও।

পাল্টা দৃষ্টি হানল কর্নেল। 'তারমানে? সাম কাইণ্ড অভ জোক?'

মাথা নাড়ল রানা। ওর ঠোঁটে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'তা বলতে পারেন। কি জানেন, কেউ আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আমিও তাকে নিয়ে ঠাট্টা করি–অভ্যেস।'

'কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।' রাগ সামলে রাখতে

হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে অবসন।

'তাহলে শুনুন। টিউলিপ আমার কাছে রয়েছে। আপনি তাকে চান। আপনি তাকে পেতেও পারেন। কিন্তু তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমার। মেয়াদ কমে গেল কেন? হঠাৎ এত তাড়াহুড়োর কারণ কি? আসলে কি ঘটছে?'

'মি. রানা!'

'নির্ভেজাল সত্য কাহিনী, মি. অবসন,' ভারী গলায় বলল রানা। 'নিন, শুরু করুন।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অবসন, চোখে আগুন ঝরছে। তারপর হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল সে। কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, 'বেশ। শুনবেনই যখন শুনুন। অন্ধ কথায় বলব। বসুন।'

রানা বসল না। হেলান দিল, পাথুরে বুল'স হর্নে কাঁধ ঠেকাল।

'আমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি, মি. রানা,' বলল অবসন। 'এবং বিপদের মধ্যে। মেয়াদ কমিয়ে আনার অনেক কারণের একটা হলো, ভুয়া সূত্র তৈরি করার জন্যে ডানিয়েলকে পাওয়া যাবে না।'

'সে মারা গেছে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল অবসন। 'আপনার জানার কথা নয়।'

'অনুমান।'

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

'আহা।'

'শুধু মারা যায়নি, খুন হয়েছে–জেফ রিকার্ডের এজেন্টরা খুন করেছে ডানিয়েলকে।'

'তাই?'

'জেফ রিকার্ড সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই,' বলে চলল অবসন। 'যা যা করবে বলে আশা করেছিলাম, সব করেছে সে,

বরং আরও বেশি করেছে। নিজের স্বার্থে পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে লোকটা। তার জন্যে আমাদের তিনজন কী এজেন্ট মারা গেছে। শুধু মারা যাওয়াই যথেষ্ট খারাপ। প্রত্যেকে ওরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট ছিল। কিন্তু বিপদ হলো প্রতিটি কেসে কেলেঙ্কারির বীজ আছে। কোন একটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, সি.আই.এ. ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।' রাগের সাথে মাথা নাড়ল অবসন। 'সঠিক জানি না কিভাবে সে এই সর্বনাশ করতে পারল, তবে আন্দাজ করতে পারি। আমার ধারণা প্রথম থেকেই জেফ রিকার্ডের হয়ে কাজ করছিল ডানিয়েল।'

রানার চিবুক ঝুলে পড়ল, বিস্ময় গোপন করার কোন চেষ্টাই করল না ও। 'ডানিয়েল জেফ রিকার্ডের হয়ে কাজ করছিল? তারমানে জেফ রিকার্ড জানে...?'

'হ্যাঁ। জেফ রিকার্ড আপনার সম্পর্কে জানে। আপনি কোথায় আছেন, তাও। তাড়াহুড়োর কারণ এবার পরিষ্কার হয়েছে, মি. রানা?' প্রশ্নটা অবসন একটু ব্যঙ্গের সুরে করল।

বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও যেন কাটিয়ে উঠতে পারেনি রানা।

'আরও আছে,' বলল অবসন। 'যেমন আশা করেছিলাম, জেফ রিকার্ড সত্যি সত্যি রাশিয়ানদের কাছে গেছে। ঈশ্বর জানেন কত জন কে.জি.বি. এজেন্ট আপনার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সে যাই হোক, আমরা আমাদের কেস প্রমাণ করেছি। আমি সন্তুষ্ট! এখন শুধু আমরা মেয়েটাকে হোয়াইট হাউসে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই...'

কথাটা অবসন শেষ করতে পারল না। বিদ্যুৎবেগে আধপাক ঘুরে দাঁড়াল সে। সন্ত্রস্ত।

অকস্মাৎ নসোসের ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠেছে।

চারদিকে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল। তারপরই শোনা গেল পিস্তলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, বাতাসে শিস

কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। একটা বুল'স হর্নের ডগা বিস্ফোরিত হলো, ধুলোর মেঘ দেখা গেল বাতাসে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ওদের পিছনের উঠানে কোথাও লাগল বুলেটটা।

কাছাকাছি ভিতের নিচু একটা কিনারায় আড়াল নিল অবসন। বেল্ট থেকে এক ঝটকায় রিভলভার বের করল রানা, বুল'স হর্নের নিরেট গোড়ায় গা ঢাকা দিল।

উঠানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভেসে এল কথাগুলো। ভারী একটা কণ্ঠস্বর। ভাষাটা ইংরেজি হলেও, উচ্চারণ ভঙ্গি রুশ। 'স্রেফ সাবধান করে দেয়ার জন্যে গুলি করা হলো, পিকেরিং। তুমি জানো, লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না আমাদের। মাথার ওপর হাত তুলে লক্ষ্মী ছেলের মত বেরিয়ে এসো।'

হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকাল অবসন, চোখে বিপন্ন বিস্ময়।

'আরও একটা ওয়ার্নিং শট, পিকেরিং।'

দ্বিতীয় বুলেটটা এল আরেক দিক থেকে, উঠানের উল্টো দিকের দেয়ালে লাগল।

পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল রানা, ক্রল করে ভিতের নিচু পাঁচিলের কাছে, অবসনের কাছাকাছি চলে এল। পকেট থেকে আগেই একটা পিস্তল বের করে নিয়েছে অবসন। ধীরে ধীরে খাড়া হলো সে, পাঁচিলের মাথার ওপর উঁকি দিল। গুলি হলো না, কারও গলাও শোনা গেল না। আবার নিচু হলো সে। বলল, 'কোথায় রয়েছে ওরা বুঝতে পারছি না।' ফিসফিস করে বলল, 'আসলে যে ব্যাপারটা কি তাও মাথায় ঢুকছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অথচ আপনি বললেন রাশিয়ানরা নাকি আমাকে খুঁজছে।'

'এটা ঠাট্টা করার সময় নয়, মি. রানা। ওরা আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে।' আবার সে উঁকি দিয়ে পাঁচিলের

ওদিকে তাকাল।

'আমাদেরকে?' শব্দ করে হেসে উঠল রানা। 'আমি যেন শুনলাম লোকটা শুধু আপনার নাম বলল–পিকেরিং!'

মুহূর্তের জন্যে নড়ল না অবসন। ধীরে ধীরে ঘুরল সে, রানার দিকে ফিরল। চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তাকিয়ে থাকল রানার হাতের দিকে। রিভলভারের নলটা তার কপালের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

যখন অ্যাকশনে ছিল, মাঠকর্মী থাকার সময়, হেনরি পিকেরিং কোডনেমটা ব্যবহার করত উইলিয়াম অবসন। ল্যাংলির কী এজেন্ট, যাদের সরাসরি পরিচালনা করত সে, তারা সবাই তাকে পিকেরিং হিসেবে চিনত। বিদেশী এজেন্টদের মধ্যে রানাই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যে উইলিয়ামের কোডনেমটা জানে। নাম দুটো হলেও, লোক একজন। তবে রানা তাকে কখনও পিকেরিং হিসেবে সম্বোধন করেনি। অর্থাৎ রানা যে জানে তা অবসন জানে না।

মুখে কোন নির্দেশ দিতে হলো না, হাতের পিস্তল ফেলে দিল অবসন। তার চেহারায় শুধু ভয় নয়, ঘৃণাও দেখতে পেল রানা। চোখ দুটো জ্বলছে, তবে দৃষ্টিতে এখনও যেন খানিকটা অনিশ্চিত ভাব। ব্যাপারটা এখনও সে বুঝছে না।

'এখনও সময় আছে, পিকেরিং, বেরিয়ে এসো। তোমাকে আমরা খুন করতে চাই না। আমরা তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

রানার মুখের ওপর স্থির হয়ে থাকল অবসনের দৃষ্টি। 'এসব কি ঘটছে?'

'ওদের কথা শুনলেই তো পারেন,' বলল রানা। 'ওরা আপনার বন্ধু, আমার নয়।'

'এ স্রেফ পাগলামি! আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি

না!'

'আপনি, মি. ডেপুটি ডিরেক্টর!' বলে হাসল রানা। 'গন্ধটা ভালই ফেঁদেছিলেন, কিন্তু একটু খুঁত থেকে গিয়েছিল। জেফ রিকার্ড নন, বেঈমান আসলে আপনি নিজে। প্রথম থেকে। সি.আই.এ-তে আপনিই সেই ফাটল–কে.জি.বি-র চর। এর সাথে আমাকে জড়িয়ে কাজটা আপনি ভাল করেননি, মি. পিকেরিং।'

প্রতিবাদ করতে গেল অবসন, কিন্তু কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, ধীরে ধীরে চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল রাগ, ঘৃণা, আর বিমূঢ় ভাবটুকু। তার চিবুক ঝুলে পড়ল। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো সে। ঠাণ্ডা হয়ে এল দৃষ্টি। তিক্ত একটু হাসল সে। 'ভুল হয়েছে, আপনাকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। আপনি অতি বড় ধড়িবাজ।'

'নিন্দার জন্যে ধন্যবাদ দেয়ার নিয়ম নেই,' বলল রানা। 'উচিত হয়নি, কিন্তু তবু বিশ্বাস করেছেন।'

'বাধ্য হয়েছিলাম। আর কেউ ছিল না যে কাজটা করতে পারত।'

শ্রাগ করল রানা। 'সত্যি, ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছিলেন। সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর আসলে কে.জি.বি-র একজন এজেন্ট–মাই গড! কি রকম চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে আপনাকে, আন্দাজ করতে পারি। মস্কো থেকে তাগাদা, ওয়াশিংটনের মন যোগানো–সত্যি ভারি কঠিন কাজ। ব্যাপারটা কত দিন থেকে চালাচ্ছেন?'

'বহু বছর।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। অবাক হয়নি ও। পিকেরিং যোগ্য লোক, সব সময় তাই ছিল। অসম্ভব কঠিন একটা কাজ এত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে করতে পারায় মনে মনে লোকটার প্রশংসা করল ও।

কিন্তু প্রশংসার সাথে দায়িত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

'এই কাজটায় আপনি হাত দিলেন কেন?' রানা কৌতূহলী হলো।

'আপনি যা বললেন–মস্কোর তাগাদা। এখন যে পদে আছি, মস্কো তাতে সন্তুষ্ট নয়। বলল, আরও একটু ওপরে উঠতে হবে আমাকে। জেফ রিকার্ডের পদটা পেতে হবে।'

তাহলে এই। জেফ রিকার্ডের পদ। হঠাৎ করে খাপে খাপে মিলে গেল সব। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করো, স্বভাবতই মেয়ের সন্ধান পাওয়ার জন্যে বন্ধু সি.আই.এ. চীফের ওপর নির্ভর করবেন তিনি। তারপর জেফ রিকার্ডকে ভুয়া সূত্র পাইয়ে দিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাও। এরকম বার কয়েক করলেই প্রেসিডেন্ট উপলব্ধি করবেন তার বন্ধু নিতান্তই অযোগ্য, তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। মেয়ে কিডন্যাপ হলে এমন একটা ইস্যু তৈরি হবে, কেউ ব্যর্থ হলে তাকে তিনি ক্ষমা করবেন না।

'আর আপনি হবেন উদ্ধারকর্তা,' বলল রানা, 'টিউলিপকে নিয়ে গিয়ে প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেবেন। প্রেসিডেন্ট বরখাস্ত করবেন জেফ রিকার্ডকে, আপনি হবেন তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং সি.আই.এ. চীফ।'

কথা না বলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অবসন। উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

'ব্রিলিয়্যান্ট,' বলল রানা। 'প্ল্যানটা সফল হতেও পারত।'

'এখনও পারে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'কেন? আপনি আমাকে খুন করবেন?'

'আরে না!' বলে সশব্দে হেসে উঠল রানা।

মাঝে মধ্যে এমন এক একটা পরিস্থিতির উল্লব হয়, কে.জি.বি. আর সি.আই.এ. দুই ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে সমতা

বিধান করা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় রানার। ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে যেটা ভাল মনে হয় সেটাই করতে হয় ওকে। চাপে পড়ে হোক বা অনুরোধে, আমেরিকার অনেক কাজ করে দিয়েছে রানা। আমেরিকানরা চেয়েছে রাশিয়ার ক্ষতি হোক, রানাও ভাব দেখিয়েছে তাতে তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, আমেরিকানদের ভুল বুঝিয়ে পার পেয়ে গেছে রানা, রাশিয়ানদের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে রাশিয়ানদের মেরিলিন চার্ট নিয়ে আসার কাজটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল সি.আই.এ.। চার্টটা ঠিকই আনা হয়, কিন্তু আমেরিকানরা পায় নকল চার্ট, আসলটা ফেরত যায় মস্কোয়।

না, ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে রাগের মাথায় অবসনকে রানা খুন করবে না। সমতা বিধানের একটা দায়িত্ব অনুভব করছে ও। এত বছর ধরে আমেরিকানদের গোপন তথ্য রাশিয়ায় পাচার করেছে অবসন, কি কি তথ্য পাচার করেছে তা আমেরিকানদের জানতে দেয়া উচিত। অর্থাৎ অবসনকে মরতে তো দেয়া যায়ই না, পালাতেও দেয়া যায় না। তাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেবে রানা, তারা ওকে নিয়ে যা খুশি করে করুক। অবসন এটাকে যদি শাস্তি বলে মনে করে, সে শাস্তি তার পাওনা হয়েছে।

তবে, অবসন যদি কথা না শোনে, তাকে মেরে না ফেলে রানার কোন উপায় থাকবে না।

পাঁচিলের উল্টোদিকের গায়ে আরেকটা বুলেট লাগল। তারমানে রাশিয়ানদের ক্রস-ফায়ারের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা। শুধু সময়ের ব্যাপার, এক সময় না এক সময় গায়ে গুলি লাগবেই।

রানা নিজের জায়গায় স্থির থাকল।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে অবসন।

'বুঝেছি! আপনি মারবেন না, কিন্তু ওদের দিয়ে আমাকে মারাবেন!'

'উঁহুঁ। যেখানে আছেন থাকুন, নড়বেন না।' উঠে দাঁড়াতে গেল রানা।

'ওটা ছিল আমাদের শেষ ওয়ার্নিং, পিকেরিং,' কর্কশ শোনাল অচেনা কণ্ঠস্বর। 'হয় এখুনি বেরিয়ে এসো, তা না হলে সরাসরি গুলি···।' রুশ কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তারপর একেবারে থেমে গেল। নেমে এল জমাট নিস্তব্ধতা। তারপরই অন্ধকার নামল। মাথার ওপর নিভে গেল ফ্লাডলাইট।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা। সত্যি অবাক হয়েছে এবার, ভান করছে না। আঙুলগুলো রিভলভারের বাঁটে শক্ত হলো আরও, অবসনের দিকে তাক করে ধরে আছে। চাঁদের আলোয় সামনেটা যত দূর দেখা যায় তীক্ষ্ণ চোখ বুলাল।

অবসনের দৃষ্টিও ঘুরে গেল। সে যা দেখছে রানা তা দেখছে না। ধীরে ধীরে তার চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠল।

অবসনের দিকে তাকাল রানা, তারপর ঘাড় ফেরাতে শুরু করল। কিন্তু পিছন থেকে নির্দেশ এল, 'রিভলভার ফেলে দাও, রানা।'

একসেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল রানা। তারপর ধীরে ধীরে আলগা করল মুঠো, হাত থেকে খসে পড়ল রিভলভার।

বুল'স হর্নের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনা, আলো আর ছায়া খেলা করছে তার মুখে। তার এক হাতে একটা অটোমেটিক। আরেক হাতে ছোট একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, টেপ ডেক, দুটো পিস্তল, আর অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে আলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিল রানা। পিস্তল দুটো এমনভাবে সেট করেছিল ও, একটা গুলিও ওদের গায়ে লাগার কথা নয়।

জিনার হাতের দিকে তাকিয়ে মাস্টার সুইচটা দেখল অবসন। সব বুঝল সে। রানার দিকে ফিরে ফেটে পড়ল রাগে। 'টেপ! ইউ বাস্টার্ড! আগেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আমার যা জানার ছিল আমি তা জেনেছি।'

'তারমানে সবটুকুই আপনার অনুমান?'

হাসল রানা। 'কিন্তু এখন আমি জানি। আপনি কে.জি.বি. এজেন্ট। জিনাও তাই।'

মিষ্টি করে হাসল জিনা। 'তোমার আশ্চর্য লাগছে?'

'কেন আশ্চর্য হব,' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কোন কোন সাপ দু'মুখো হয় না?'

জিনার হাসি নিভে গেল, দেখে তৃপ্তি বোধ করল রানা। পিকেরিঙের দিকে ফিরল ও। নিজের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছে সে। রানার বুকের দিকে তাক করে ধরে আছে। রানা তাকে খুন করত না, কিন্তু উল্টোটা সত্যি নয়। রানাকে খুন করা ছাড়া অবসনের কোন উপায় নেই।

'আর তো সময় নষ্ট করা চলে না,' বলল পিকেরিং। 'মেয়েটা কোথায়?'

পিস্তল থেকে চোখ তুলল রানা। আরেক পিস্তলের দিকে তাকাল। দু'জনেই ওরা সতর্ক, রানার প্রতিটি নড়াচড়া কড়া দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ও। তারপর ঝুলে পড়ল কাঁধ দুটো। নিষ্প্রভ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। চেহারায় পরাজয় মেনে নেয়ার সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠল পরিষ্কার। 'বেশ। আসুন। নিয়ে যান মেয়েটাকে।'

ছয়

'পোলোনভকে আমি ব্ল্যাকমেইল করেছি,' জেফ রিকার্ড বললেন।

ঝট্ করে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট। 'কি করেছ?'

'ভুল শোনোনি। অনেক দিন আগে পোলোনভ একটা মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সেটা তেমন কিছু না, কিন্তু মেয়েটা ছিল লাল চীনের এজেন্ট।' সি.আই.এ. চীফ হাসলেন। 'প্রথমে পোলোনভ জানত না, যখন জানল সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে–গোপন কিছু কাগজ-পত্র নিয়ে ভেগেছে মেয়েটা। মস্কোও ব্যাপারটা টের পায়নি, ডকুমেন্টগুলো হারিয়ে গেছে বলে তাদের বুঝ দেয় পোলোনভ। আমরা প্রথম থেকেই ব্যাপারটা জানতাম, দু'জনের অনেক ঘনিষ্ঠ ছবিও যোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল। কে.জি.বি-র হাতে ওগুলো পড়লে পোলোনভকে মস্কোয় ডেকে পাঠানো হবে। কাজেই পিকেরিং এথেন্সে চলে যাবার পর সাহায্যের জন্যে পোলোনভের কাছে যাই আমি।'

'সাহায্যের জন্যে তুমি রাশিয়ানদের কাছে গেলে?' ক্লান্ত চোখের ওপর একটা হাত বুলালেন প্রেসিডেন্ট। 'ভাগ্যিস যাবার সময় আমাকে বলোনি!'

'তোমাকে তো বললামই কেন আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, জানি। তোমার ধারণা হয়েছিল আমিই হয়তো

টিউলিপকে কিডন্যাপ করিয়েছি।'

'বিশ্বাস আমি ভুলেও করিনি, কিন্তু তবু আমার নিশ্চিতভাবে জানার দরকার ছিল।'

'পরিস্থিতির কথা ভেবে এ নিয়ে তর্কে যাব না। থাক ওসব কথা। পোলোনভ প্রসঙ্গ শেষ করো।'

'আমি ওদের সেরা এজেন্টকে পিকেরিঙের পিছনে লাগাতে বলি,' শুরু করলেন জেফ রিকার্ড। 'বলি, পিকেরিং যা যা করবে, সব রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। না বলার উপায় ছিল না তার। পিকেরিঙের পিছনে সারটভ নামে এক এজেন্টকে লাগায় সে। এবং সত্যি সত্যি পিকেরিঙের গতিবিধি রহস্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সারটভকে দেখে ফেলে সে, খসিয়েও ফেলে। কিন্তু আমার ধারণা, এ অসম্ভব।'

'কেন?'

'কারণ সারটভ এত ভাল যে যার পিছু নেবে তার চোখে কক্ষনো ধরা পড়বে না, যদি না স্বেচ্ছায় ধরা পড়তে চায়, যদি না তার ওপর নির্দেশ থাকে ধরা পড়ার। কাজেই, পিকেরিঙের চোখে সারটভ কেন ধরা পড়ল তার ব্যাখ্যা একটাই: পোলোনভ, কে.জি.বি-র পদস্থ অফিসার, চায়নি পিকেরিংকে অনুসরণ করা হোক।'

ভাগ্যের প্রহসন উপলব্ধি করে তিক্ত একটু হাসলেন জেফ রিকার্ড। সি.আই.এ-তে পিকেরিঙের নিজস্ব লোক আছে এই ভয়ে তিনি কে.জি.বি-র সাহায্য নিতে যান, জানা ছিল না কে.জি.বি-রই লোক পিকেরিং।

'কেন? জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে,' বলে চললেন তিনি। 'বলতে গেলে হঠাৎ করেই সব খাপে খাপে মিলে গেল। কে চাইতে পারে অ্যারোর মৃত্যু? রাশিয়ানরা। শুধুমাত্র রাশিয়ানরা। এ-ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রথম থেকেই সঠিক ছিল।

কিন্তু রাশিয়ানরা অ্যারোর পেট থেকে সমস্ত কথা আদায় না করে তাকে মারবে না। যদি না তাদের আগে থেকেই সব জানা থাকে, সি.আই.এ-র ভেতর নিজেদের এজেন্টের মাধ্যমে।'

'পিকেরিং।'

'হ্যাঁ, হেনরি পিকেরিং। সবচেয়ে জঘন্য জাতের বেঈমান। ঈশ্বর, তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।'

আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'তোমার ভুল হতে পারে?'

'পারে। কিন্তু হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু কেন সে টিউলিপকে কিডন্যাপ করবে? না হয় ধরে নিলাম রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছে সে, রাশিয়ানরা চাইছেটা কি? চাওয়া তো দূরের কথা, কি চাইবে তার আভাস পর্যন্ত ওরা আমাকে দিচ্ছে না। হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ?'

'আমার তিনজন কী এজেন্টকে সরানো, অবভিয়াসলি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই বলেছ, টিউলিপকে কিডন্যাপ না করেও ওদেরকে তারা সরাতে পারত।'

'ডাইভারসন,' জেফ রিকার্ড পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট তিনি খান না বললেই চলে, শুধু যখন ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে থাকেন তখন ধরান, কিন্তু দু'একটার বেশি টান দেন না। 'এসপিওনাজ জগতের সাধারণ নিয়ম হলো চোখের বদলে চোখ। তারা যদি আমাদের কোন এজেন্টকে খুন করে, দেরি না করে উপকারটা আমরাও ফিরিয়ে দিই। কিংবা উল্টোটা ঘটে, আমরা ওদের একজনকে সরালে ওরা আমাদের একজনকে সরায়। তাই, নতুন নতুন এজেন্টকে চাকরি দেয়ার ঝামেলা এড়াবার জন্যে দু'পক্ষের মধ্যে অলিখিত একটা চুক্তি আছে–একান্ত বাধ্য না হলে কেউ কোন পক্ষের লোককে মারি না।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'টিউলিপকে কিডন্যাপ করার

উদ্দেশ্য, আমরা যেন ভাবি খুন-খারাবিগুলো অন্য কোন শত্রু করছে। প্রথমে মারল অ্যারোকে। তারপর এগম্যানকে। তারপর মেরিলিনকে। আরও অনেক এজেন্টকে মারতে চাইবে ওরা, তালিকাটা নিশ্চয়ই ছোট নয়। কিন্তু চায় না আমরা পাল্টা প্রতিশোধ নিই। সেজন্যেই টিউলিপকে কিডন্যাপ করা দরকার মনে করেছে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। 'মাঝে মধ্যে চিন্তা হয় আমার, ওদের চেয়ে কোন দিক থেকে আমরা ভাল কিনা।'

'আমরা লড়ি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে,' স্বতস্ফূর্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন জেফ রিকার্ড।

'এবং ঈশ্বর আমাদের পক্ষে।' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে। টুং-টাং শব্দে একটা বেল বেজে উঠল তাঁর ডেস্কে। ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে একমুহূর্ত শুনলেন, তারপর নামিয়ে রাখলেন। 'ফ্রেঞ্চরা রাজি হয়েছে,' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। 'গুড। ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ, ওয়েস্ট জার্মানস, অ্যাণ্ড গ্রীকস। শুধু ইসরায়েলীদের জবাব পেতে বাকি থাকল।'

'ওরা বেনিয়ার জাত, ঠিকই সহযোগিতা করবে,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'জানে সহযোগিতা না করলে আমার সরকার একটা সেন্টও সাহায্য দেবে না–অন্তত যতক্ষণ মানিব্যাগ আমার জিম্মায় আছে।'

আপনমনে হাসল জেফ রিকার্ড। এ লোক তাঁর চেনা, একে তিনি পছন্দ করেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'পদত্যাগ করোনি বলে এখনও কি দুঃখিত?'

'কি জানি। এখনও করতে পারি।' বন্ধু জেফ রিকার্ড প্রতিবাদ করতে যাচ্ছেন দেখে একটা হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'হেনরি পিকেরিংকে সন্দেহ করি বলে কিছুই কিন্তু

বদলায়নি, জেফ,' বললেন তিনি। 'এ থেকে শুধু জানা গেছে কেন আমরা প্রতারিত হয়েছি, আর কেন কি ঘটেছে তার খানিকটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। তাছাড়া, পরিস্থিতি সেই আগের মতই আছে।'

জেফ রিকার্ড গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

'ভেবে দেখো না, আমি যদি প্রেসিডেন্ট না হতাম, টিউলিপ কি কিডন্যাপ হত? হত না। পামেলাকেও এত ভুগতে হত না। টিউলিপ, পামেলা, দু'জনেই ওরা আমার উচ্চাকা–ক্ষার খেসারত দিচ্ছে, তাই নয় কি? মূল্য আমাকেও কম দিতে হচ্ছে না। সব কিছুর পিছনেই তো একটা কারণ–আমি প্রেসিডেন্ট।' মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন তিনি। 'উত্তরটা আমার জানা নেই, জেফ। হয়তো এ-ব্যাপারটা মিটে গেলে পদত্যাগ করাই আমার উচিত হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। বন্ধুর বক্তব্য তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। বললেন, 'মিটে যাবে, এইটুকু গ্যারাণ্টি তোমাকে আমি দিতে পারি। খুব তাড়াতাড়িই মিটবে। এখন আর আমাদের হাত থেকে পালাবার কোন উপায় নেই পিকেরিঙের। দুনিয়ার অর্ধেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট খুঁজছে তাকে, তাই না?'

ওপরতলার চাতালে রয়ে গেল পিকেরিং। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা, কাছাকাছি পিছনে থাকল জিনা। জিনার হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল, নিচের গাঢ় অন্ধকারে আলো ফেলল সে।

পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। কাঠের বিমগুলো অসম্ভব মোটা, পিলারগুলো মিনোয়ান ধাঁচের, সবগুলো সিঁড়ি আর নিচের স্তরের কামরাগুলোকে ঠেক দিয়ে রেখেছে।

রঙচঙে পিলারের ফাঁক গলে ফালি ফালি চাঁদের আলো নিচেও কিছু কিছু জায়গায় নেমে এসেছে। চারদিকে ম্লান আলো, ঘন আর হালকা ছায়া, এবং গাঢ় অন্ধকার। একটা ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুল ওরা। ঘুরল। নামতে শুরু করল আরেক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে।

এর চেয়ে আরও দূরের বিপদ আঁচ করতে শিখেছে রানা। জিনার পিস্তল ওর পিঠে ঠেকে নেই বটে, কিন্তু ঠেকে থাকলে যতটুকু চাপ অনুভব করত প্রায় ততটুকুই অনুভব করছে ও। জানে, কোন রকম চালাকির চেষ্টা করতে দেখলে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে গুলি করবে ডাইনীটা। সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এল ও।

প্রাসাদের পশ্চিম শাখায় রয়েছে ওরা, এদিকের অ্যাপার্টমেন্টগুলোয় রাজ-পরিবারের লোকজন বসবাস করত। ট্যুরিস্টদের জন্যে বিরাট এক আকর্ষণ জায়গাটা। মসৃণ দেয়াল জুড়ে সার সার বাংলা 4 সংখ্যার আকৃতি নিয়ে জ্যামিতিক নকশা। ডান দিকে একটা দরজার ওদিকে লম্বা করিডর। এই করিডরের কোথাও বাস করতেন স্বয়ং সম্রাট। দরজা পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, দেয়ালের নকশাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যে থামল না, বা মূর্তিগুলোর পরিচয় সম্পর্কে লেকচার দিল না। লম্বা করিডর ধরে খানিকদূর এগোল ও।

'কোথায়?' পিছন থেকে কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'কে?' নিরীহ ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আমরা? নাকি টিউলিপ?'

'মানলাম তোমার খুব সাহস,' ব্যঙ্গের সুরে বলল জিনা। 'জীবনের ওপর কোন মায়া নেই। আমি জানতে চাইছি, আর কতদূর? কোথায় রেখেছ টিউলিপকে?'

'আর বেশি দূরে নয়, কাছেই,' বলল রানা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'সাবধান!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল জিনা।

রানার পিঠের পেশী কিলবিল করে উঠল, ওগুলোর যেন নিজস্ব প্রাণ আছে। 'বোকার মত গুলি কোরো না, তাহলে টিউলিপকে খুঁজে পাবে না। শোনো, তোমার সাথে আমার কথা আছে, জিনা। আমি ঘুরছি··· ।'

'না!'

ঘুরতে শুরু করেও স্থির হয়ে গেল রানা। জিনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে। ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না, মেয়েটা নির্ঘাত গুলি করে বসবে। 'শোনো, জিনা, আমার একটা প্রস্তাব আছে,' আবেদনের সুরে বলল রানা। 'এসো, আমরা একটা চুক্তি করি।'

'পাগল!'

'আহা, আগে শোনোই না!' ব্যস্ত সুরে বলল রানা। 'কাজটার জন্যে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার ফি পেয়েছি আমি। টাকাটা ব্যাংকে আছে। আমার প্রস্তাবে রাজি হও, অর্ধেক, মানে এক বিলিয়ন ডলার দেব তোমাকে।'

খিল খিল করে হেসে উঠল জিনা। রানার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে ভয় কেটে গেছে তার, কৌতুক বোধ করছে। সুর করে বলল, 'এ-ক-বি-লি-য়-ন ড-লা-র! ওমা, সে তো অনেক টাকা!'

'তোমার কোন ভয় নেই, জিনা,' এখনও রানা জিনার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। 'পিকেরিং কিছু বোঝার আগেই তাকে আমরা কাবু করে ফেলব। কে.জি.বি-কেও ফাঁকি দেয়া সম্ভব, প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে নেবে তুমি। সব ব্যবস্থা আমিই করে দেব। ইচ্ছে করলে রানা এজেন্সিতে কাজ করতে পারবে তুমি, কিংবা কাজ না করে সারাটা জীবন ভোগবিলাসে কাটিয়ে দিতে পারবে। সবচেয়ে খুশি হব তুমি যদি আমার সাথে থাকো, মানে তুমি আর আমি বাকি জীবন যদি

একসাথে কাটিয়ে দিই, মন্দ কি? ভেবে দেখো··· ।'

একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল জিনা, 'গবেট!'

'কেন, জিনা, কি হারাবে তুমি? ভেবে দেখেছ, কি বিপদে পড়তে যাচ্ছ? একদিন না একদিন পিকেরিং ধরা পড়বেই, তখন কি অবস্থা হবে তোমার? আমি তোমাকে জীবনের নিরাপত্তা দেব, প্রাচুর্য দেব,···'

'আর একটাও কথা নয়,' কঠিন সুরে বলল জিনা। 'এগোও!'

'কিন্তু কারণটা বলবে না?' ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'এরচেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি আশা করো তুমি?'

'তোমার কোন প্রস্তাবই আমাকে টলাতে পারবে না, মাসুদ রানা,' শান্ত গলায় বলল জিনা। 'কারণ হেনরি পিকেরিংকে আমি ভালবাসি।'

চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ও। তারমানে সি.আই.এ. চীফের বউ হবার স্বপ্ন দেখছ তুমি।'

'কেন, যদি প্রেসিডেন্টের বউ হই তোমার আপত্তি আছে?' শব্দ করে হাসল জিনা, লম্বা করিডরে প্রতিধ্বনি উঠল। 'কে বলতে পারে, হেনরি পিকেরিং একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে না?'

কাঁধ ঝুলে পড়ল রানার, হতাশ ভঙ্গি করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'চেষ্টা করে দেখলাম আর কি। আমার কপাল মন্দ।'

'টিউলিপকে পিকেরিঙের হাতে তুলে দিই, তারপর অনুরোধ করে দেখব ওকে, তোমার ওপর যদি একটু দয়া করে,' বলল জিনা। 'যদিও মনে হয় না যে তোমাকে ও বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে।' ছোট্ট একটু শব্দ করে রানার পিছনে হাসল সে, রানার কানে অশ্লীল আর কদর্য শোনাল। 'তাতে কিন্তু হিতে বিপরীতও ঘটতে পারে, রানা। ওকে তো তুমি চেনো না, আমি অনুরোধ

করলে ও হয়তো আমাকেই হুকুম করবে তোমার কনুই আর হাঁটুতে গুলি করার জন্যে। তারপর শেষ গুলিটা, বুকে বা মাথায়, ও নিজেই হয়তো করবে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার, কিন্তু জিনা তা দেখতে পেল না।

'চলো,' আদেশ করল জিনা।

এক মুহূর্ত পর পা বাড়াল রানা। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে আরেক লম্বা করিডরে চলে এল ওরা, এদিকে দু'পাশের ঘরগুলোর আকৃতি অন্য রকম।

এখানে চাঁদের আলো নেই, টর্চের পিছনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টর্চের আলোয় মাঝে মধ্যে সামনের দেয়াল দেখতে পেল রানা, মসৃণ বা রঙ করা নয়, কর্কশ পাথর। এবার ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, কখনও বাঁ দিকে কখনও ডান দিকে। প্রাসাদের কারখানা ছিল এগুলো, হাতের কাজ শেষ হয়নি এমন সময় ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। অসমাপ্ত কাজের পাশে পড়ে আছে যন্ত্রপাতি, আতঙ্কিত কারিগররা পালিয়েছে। ঘর থেকে সরু প্যাসেজে, আবার ঘরে, গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল রানা। ট্যুরিস্টদের যে-সব জায়গায় ঘুরতে দেয়া হয়, সে-সব জায়গা থেকে দূরে সরে এসেছে ও। এদিকের বাতাসে ভাপসা একটা গন্ধ। নিকষ কালো অন্ধকার।

আবার কথা বলে উঠল জিনা, যতটা না উদ্বিগ্ন তারচেয়ে বেশি রাগান্বিত। 'কি করছ শুনি? নিশ্চয়ই আরও শর্টকাট কোন পথ আছে।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'থাকলেও আমি চিনি না।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জিনা, তারপর আবার অনুসরণ করল রানাকে।

ঘুরে প্রাসাদের উল্টো দিকে চলে এসেছে ওরা। এদিকে শুধু

স্টোরেজ রুম, প্রত্যেকটা সরু আর লম্বা। বেশ কয়েকটা খালি নয়। মেঝেতে, একপাশে উঁচু হয়ে আছে মাটির পাহাড়। আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখা গেল, আর্কিওলজিস্টরা রেখে গেছে। হঠাৎ করে নয়, ধীরে ধীরে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। জিনা আগের মত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওর পিছনে থাকল। একটা দরজা পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরল ওরা, সামনে আরেকটা দরজা।

'দেখো, সাবধানে,' সতর্ক করে দিল রানা। 'মাথার ওপর দিকে ভারা বাঁধার খুঁটি আর তক্তা আছে।'

চৌকাঠের তলার কাঠ পেরোবার সময় মাথা নিচু করল রানা।

টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলল জিনা। লোহা, আর কাঠের খুঁটি, পিলার, ক্রস-বিম, ইত্যাদির সামনে রয়েছে রানা, তার ওপর একটা চোখ রাখল সে। রানা বলল আর সে বিশ্বাস করল, তেমন মেয়ে জিনা নয়। টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলে নিজের চোখে দেখে নিল—হ্যাঁ, সত্যি, মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে ভারা বাঁধার অসংখ্য খুঁটি আর তক্তা।

মাথার ওপর, নাগালের মধ্যে একটা বাঁশ দেখতে পেয়ে সেটা ধরল রানা, নিচে ওর পা আরেকটার ওপর পড়ল। চৌকাঠ পেরিয়ে এল জিনা।

শূন্যে।

খোলা একটা পাথুরে শ্যাফট। খাড়া টানেল, ওপরের দিকে উঠে সিলিঙে ঠেকেছে, চল্লিশ ফিট নিচে শেষ হয়েছে গিয়ে মেঝেতে। এখানে প্রাকৃতিক কোন আলো নেই, তবে শ্যাফটটা আগে এক বার এসে দেখে গিয়েছিল রানা। নিচের মেঝেতে বড় আকারের একটা সাদা পাথর আছে, তা থেকেই আন্দাজ করা যায় শ্যাফটটা কি কাজে ব্যবহার করা হত। পাতাল সমাধি, বলি দেয়া মানবসন্তানের শেষ আশ্রয়।

দরজার কিনারা থেকে খসে পড়ছে বুঝতে পেরে আহত পশুর

মত একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল জিনার গলা থেকে। পিস্তল আর টর্চ উড়ে গেল হাত থেকে, পাখির ডানার মত বাতাসে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল হাত দুটো, তাল সামলে নিয়ে চৌকাঠের ওপর থাকার ব্যর্থ চেষ্টা। টর্চের আলো সুনিপুণ বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ঘুরল। নিচে কোথাও থেকে উঠে আসা একটা খুঁটির মাথায়, আড়াআড়িভাবে বাঁধা মোটা বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। মুহূর্তের জন্যে এক হলো দু'জনের দৃষ্টি। জিনার চোখে নগ্ন আতঙ্ক, চরম উপলব্ধি, করুণ আবেদন, আর নিÒল আশা।

তাল হারিয়ে ফেলল জিনা, হাত দুটো রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। টর্চটা আধপাক ঘুরে নিচের দিকে মুখ করল, এবার পিস্তলটার মতই দ্রুত নামতে শুরু করল নিচের দিকে, আলোটা পড়ল নিচের মেঝেতে।

আলো-আঁধারের মধ্যে আর্তনাদ শোনা গেল। রানার সামনে দিয়ে একটা ছায়া সরে যেতে বাতাসের মৃদু স্পর্শ পেল ও। নিচে আলো, মাঝখানে পতনশীল জিনা, ওপরে রানা। প্রথম একটা ধাতব শব্দ উঠে এল, সাদা পাথরে পিস্তলটা পড়ল। দ্বিতীয় শব্দের সাথে নেমে এল গভীর অন্ধকার। তারপর পাথরে আছাড় খেলো মাংস আর হাড়। চিৎকার থেমে গেল। নেমে এল নিস্তব্ধতা।

তাজা রক্ত গড়াল প্রাচীন পাথরে।

লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরোল রানা। দরজার পাশে একটা গর্তে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার, আর একটা টর্চ বের করল। কাজে লাগবে জানত, তাই এখানে এগুলো লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

ফিরতি পথে ছুটল ও।

ধ্বংসাবশেষের গভীর তলদেশ থেকে ভেসে এল ভোঁতা আর্তনাদ, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল হেনরি পিকেরিঙের। অটল দাঁড়িয়ে

থাকল সে, বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কোন্ দিক থেকে এল আওয়াজটা। তারপর সিঁড়ির মাথার দিকে এগোল সে, যে-পথে রানাকে নিয়ে নেমে গেছে জিনা। পিস্তলটা শক্ত করে ধরল।

মেয়েলি গলা? নাকি পুরুষের? বলা অসম্ভব। এ-ও হয়তো রানার কোন চালাকি, খোলা জায়গা থেকে সরিয়ে নিচের অন্ধকারে নামাতে চায় তাকে।

জিনার কথা ভাবল সে। মেয়েটার প্রতি তার আস্থা আছে। যেমন সুন্দরী, তেমনি নিষ্ঠুর। শত্রু নিধনে ওর জুড়ি মেলা ভার। মিষ্টি হাসবে, লোভ দেখাবে, একটু একটু করে কাছে টানবে, প্রয়োজনে বিছানায় উঠবে–আহ্, বিছানায় জিনা তুলনাহীন–উজাড় করে দেবে নিজেকে, তারপর ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ধরে রেখে ছুরি চালাবে গলায়। ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট, রানা তাকে বিপদে ফেলতে পারবে না।

তারপর সে রানার কথা ভাবল। রানা আর টিউলিপ, তার প্ল্যানের গুরুত্বপূর্ণ দুটো উপাদান। টিউলিপ হলো ট্রাম্প কার্ড, ওটা দেখিয়েই খেলা জিতে নেবে সে। ওকে উদ্ধার করে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবে হোয়াইট হাউসে। রানার বুদ্ধি আছে, ঠিক ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। জেফ রিকার্ড যেখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, হেনরি পিকেরিং সেখানে সম্পূর্ণ সফল। এই সাফল্যের বদলে সামান্য একটা দাবি–ডিরেক্টরের পদ। প্রেসিডেন্ট আপত্তি করবেন না। কেন আপত্তি করবেন? সে কি তার মেয়েকে উদ্ধার করে আনেনি? জেফ রিকার্ড কি অযোগ্যতার প্রমাণ দেয়নি?

কিন্তু টিউলিপ ছাড়া পিকেরিঙের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে। জেফ রিকার্ডের মতই অযোগ্য বলা হবে তাকে। ওয়াশিংটনে সে নিন্দার পাত্র হবে। আরও ভয়ঙ্কর, মস্কোয় সে নিন্দার পাত্র হবে।

হ্যাঁ, টিউলিপকে তার দরকার। রানাকেও। সে-ই একমাত্র বাইরের লোক যে গোটা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। তাই

ওকে ফিরতে দেয়া হবে না। এখানে, এই নসোসেই থেকে যেতে হবে ওকে। খুব বড় একটা হুমকি, কাজেই বাঁচিয়ে রাখা চলে না।

ব্যাপারটা নিয়ে জিনার সাথে একটু তর্ক হয়েছে পিকেরিঙের। জিনার একটা শখ ছিল, পিকেরিং সেটা অগ্রাহ্য করেছে। রানাকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছে জিনা, তাই তার ইচ্ছে নিজের হাতে খুন করবে ওকে। মেয়েটার মধ্যে এই অদ্ভুত একটা বিকৃতি রয়েছে। কোন শত্রুকে তৃপ্তি দিলে নিজের হাতে তার প্রাণপ্রদীপও নিভিয়ে দিতে চায়। শুধু যে বিকৃত রুচি তা নয়, জিনার উদ্ভট কিছু আশাও আছে। তার ধারণা, সি.আই.এ. ডিরেক্টর হবার পর পিকেরিং তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

আপনমনে হাসল পিকেরিং। ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে জিনাকে মস্কোয় ফেরত পাঠাবে সে। কাছেপিঠে এরকম একটা পিশাচিনী থাকলে মন লাগিয়ে কাজ করা যায় নাকি?

উঠান পেরিয়ে এল পিকেরিং, লাফ দিয়ে একটা নিচু পাঁচিলে চড়ল। এখান থেকে ধ্বংসাবশেষের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। প্রাসাদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড অংশ থেকে ওপরে উঠে আসার অনেকগুলো পথ রয়েছে। বেশিরভাগই মেঝের গায়ে সাধারণ গর্ত। এই গর্ত থেকে একা রানার পক্ষে উঠে আসা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু হাতে বা কাঁধে টিউলিপ থাকলে তা পারবে না। কাজেই ওকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। সিঁড়ি রয়েছে দু'দিকে–এক দিকে পাশাপাশি পাঁচটা, আরেক দিকে একটা। যেদিক থেকেই উঠে আসুক রানা, টিউলিপকে নিয়ে বা একা, সাথে জিনা থাক বা না থাক, এখান থেকে তাকে ঠিকই দেখতে পাবে পিকেরিং। সে-ই প্রথম দেখতে পাবে।

উঠতে রানাকে হবেই। বেরুবার আর কোন পথ নেই।

পায়ের আওয়াজ! উঠানের উল্টো দিক থেকে! কেন?

কে যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে। দক্ষিণ গেটের ধাপ বেয়ে

উঠে আসছে কেউ। এক ঘণ্টা আগে ওই পথ দিয়ে পিকেরিং নিজেই এসেছে।

রানা? অসম্ভব। তবে কি রানার আরেকটা কৌশল?

কুঁজো হলো পিকেরিং, পিস্তল ধরা হাতটা তুলল, শক্ত করে অপর হাতে ধরল কব্জি।

হুইসেলের আওয়াজ। পাখির ডাক। বেরুল মানুষের গলা থেকে। নিশ্চয়ই একটা সঙ্কেত। পাহাড়ের গোড়ায় একটা সুইচ অন করা হলো। মাথার ওপর চোখ ধাঁধানো ফ্লাডলাইটের আলো জ্বলে উঠল। নর্থ পোর্চ, আর পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ির ওপর ব্যগ্র দৃষ্টি বুলাল পিকেরিং। ঝট্ করে তাকাল উঠানের দক্ষিণ সিঁড়ির দিকে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর।

'পুলিস! অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসুন। সব কটা বেরুবার পথ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।' ইংরেজি নয়, ভাষাটা এবার গ্রীক। মুখের সামনে বুলহর্ন নিয়ে কথা বলছে কেউ।

চিৎকার করে পিকেরিং বলল, 'তোমার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি, রানা!'

এবার গ্রীক নয়, ইংরেজিতে নির্দেশ এল, 'হেরাক্লিয়ন পুলিস! মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসুন!'

চুপ করে থাকল পিকেরিং। অপেক্ষা করছে।

'আপনাকে সাবধান করছি, মিস্টার, গুলি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছি আমরা।'

হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল–প্রথমে শুধু মাথা, তারপর কাঁধ। সাদা শার্ট, সোনালি আর কালো চাপরাস, কালো ক্যাপ। দু'হাতে ধরা একটা পুলিস রিভলভার।

পিকেরিং আর অপেক্ষা করল না। গুলি করল।

লোকটার শরীর শূন্যে উঠে গেল, এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকল সেখানে, তারপর পিছন দিকে হেলে পড়ল। সিঁড়ির নিচে, চোখের

আড়ালে হারিয়ে গেল দেহটা। হঠাৎ করে আরও দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল কুঁজো হয়ে, এদেরও সাদা শার্ট, আর কালো ক্যাপ। ছুটছে তারা, এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে সরে যাচ্ছে। তিনজন, চারজন।

পুরো এক ব্যাটালিয়ন পুলিস! সত্যি সত্যি পুলিস!

লাফ দিল পিকেরিং, নিচু পাঁচিল থেকে নেমে ছুটল। পাথরের গায়ে আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে পড়ল উঁচু আরেক পাঁচিলের মাথায়। এক, দুই, তিন, একের পর এক ছুটে এল বুলেট। পাঁচিলের মাথা থেকে আরেক দিকে লাফ দিয়ে পড়ল সে। বাঁ দিকে ঘুরে ছুটল, খোলা পেভমেন্টের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে, সামনের নিচু পাঁচিলগুলো টপকে যাচ্ছে লাফ দিয়ে। অনেকগুলো আড়াল পেলেও মাত্র দু'এক জায়গায় থামল সে। পুলিস খুন ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, তাও আবার বিদেশের মাটিতে। ধরা পড়লে নির্ঘাত··· পিকেরিঙের চিন্তা থমকে গেল। ধরা পড়লে মানে? ওরা কি তাকে ধরার চেষ্টা করছে?

জান নিয়ে পালাতে হবে। রুখে দাঁড়াবার সময় নয়। টিউলিপ কনওয়ের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রানার কথা, কিন্তু ওদের ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। সে শুধু এখন আশা করতে পারে, চিৎকারটা জিনার ছিল না, ছিল রানার। আশা করতে পারে, জিনার হাতে চলে এসেছে টিউলিপ। এবং জিনাও পালাবার একটা পথ পেয়ে যাবে।

বেড়া লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল পিকেরিং। বেড়াটা টপকাবার সময় পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনল সে। আহত পশুর মত দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে। অনেক দিন হলো ফিল্ড থেকে অবসর নিয়েছে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করা অভ্যেস নেই। হাপরের মত হাঁপাতে লাগল সে। বেড়ার মাথা থেকে আলুর বস্তার মত ঘাসের ওপর ধপাস করে পড়ল। মনে

হলো, অনেকগুলো হাড় ভাঙল। কিন্তু পরমুহূর্তে ক্যাঙারুর মত লাফ দিল সে, তীর বেগে ছুটল আবার।

সামনে মাঠ। পিছনে চিৎকার। চারদিকের মাটি বুলেট লেগে ছিটকাল। ভাগ্যই বলতে হবে, একটাও তার গায়ে লাগল না। রেঞ্জের বাইরে চলে এল সে। তারপর অকস্মাৎ তার সামনে যমদূতের মত উদয় হলো একজন পুলিস, পিস্তল ধরা হাত তুলে লক্ষ্য স্থির করল।

গুলি করল পিকেরিং। বন করে ঘুরে গেল লোকটা, দড়াম করে আছাড় খেল মাটিতে। লাফ দিয়ে তাকে টপকাল সে, ফাঁকা চাতালের দিকে ছুটল। রেখে যাওয়া গাড়িটা দেখতে পেল সে।

গাড়িতে উঠে ইগনিশনে চাবি ঢোকাল পিকেরিং, হাত দুটো কাঁপছে বলে মা-বাপ তুলে গাল দিল নিজেকে। চাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল গাড়ি, নতুন এক ঝাঁক বুলেট একটা টায়ারকেও ছুঁতে পারল না। স্পীড তুলল পিকেরিং, হেরাক্লিয়নের দিকে ছুটল গাড়ি।

মাইলখানেক এগিয়ে হঠাৎ মোড় ঘুরল পিকেরিং, কাঁচা পথ ধরে একটা ফার্মহাউসের দিকে এগোল। গোলাঘরের প্রকাণ্ড দরজা হা হা করছে। ভেতরে ঢুকে এঞ্জিন বন্ধ করল, তালা দিল গোলাঘরের দরজায়। জানালার নিচে এসে মাথা তুলল, উঁকি দিল বাইরে। রাস্তা দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল একজোড়া পুলিস কার।

মেঝেতে বসে পড়ল পিকেরিং, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে কাঁপছে সারা শরীর। ভাগ্যিস এই আস্তানার ব্যবস্থা আগেই করে রেখে গেছে জিনা! পিকেরিং তার কাপড়চোপড়, কাগজ-পত্র, অফিশিয়াল পাসপোর্ট, সব রেখে গিয়েছিল এখানে। আরেকটা গাড়ি আছে লুকানো। টেলিফোনও আছে।

বিপদ আপাতত কেটে গেছে, কিন্তু নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল বাজপড়া মাথা। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সে। ব্যথা

শুধু মাথাতেই নয়, গোটা পিঠও ধপ ধপ করছে। আর বুকের ভেতর ফুসফুসকে যেন খিঁচুনি রোগে ধরেছে। একটু বিশ্রাম নিই, ভাবল সে, তারপর ফোন করব। সতর্ক অবস্থায় নিজের লোকজন অপেক্ষা করছে, ডাক পেলেই ছুটে আসবে তারা।

টিউলিপ যদি জিনার হাতে থাকে, তাকে নিয়ে এখানে চলে আসবে সে। কিন্তু মিথ্যে স্বপ্ন না দেখে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া দরকার এখন। চিৎকারটা রানার ছিল না, ছিল জিনার, বিশ্বাস করতে না চাইলেও মনের ভেতরটা সে-কথাই গাইছে।

নসোস থেকে বেরিয়ে আসবে রানা। যেভাবে হোক, পালাবার একটা রাস্তা ঠিকই বের করে নেবে সে। তবে চার বছরের একটা বাচ্চাকে নিয়ে পায়ে হেঁটে কত দূর যেতে পারবে?

হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই গাড়ি আছে রানার। সম্ভবত তারই মত একটায় চড়ে এসেছে, আরেকটা কাছেপিঠে লুকানো আছে। আর গাড়ি মানেই রাস্তা।

এই রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা, নসোস থেকে বেরুবার এটাই একমাত্র পথ।

দু'হাতে মাথার চুল খামচে ব্যথাটা কমাবার চেষ্টা করল পিকেরিং। টলতে টলতে দাঁড়াল সে। দরজার দিকে পা বাড়াতেই একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে পিস্তলটা কোমর থেকে বের করে আনল।

'গুলি কোরো না!'

গোলাঘরের পিছন থেকে এগিয়ে আসছে এক লোক। চওড়া অবয়ব। চওড়া কাঁধ। স্লাভিক চেহারা।

'সারটভ?'

রুশ এজেন্ট ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

'এখানে তুমি কি করছ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল পিকেরিং।

'দেখতেই পাচ্ছ–তোমার সাথে যোগাযোগ।'

'এমন বোকামি করে কেউ! আরেকটু হলে তো তোমাকে আমি মেরেই ফেলতাম!'

'ঝুঁকি না নিয়ে উপায় ছিল? অন্ধকারে বুঝব কি করে লোকটা তুমি?'

'যোগাযোগ করার দরকার পড়ল কেন তাই বলো। আমার হাতে সময় নেই।'

'সময় তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে, কমরেড।'

রাগে ছোট হয়ে গেল পিকেরিঙের চোখ। 'কি?'

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে, সরে এসে সেই আলোয় দাঁড়াল সারটভ। 'বড় একটা সমস্যায় পড়েছি আমরা,' বলল সে। 'জেফ রিকার্ড তোমার পরিচয় জেনে ফেলেছে।'

কোথায় অদৃশ্য হলো রাগ, স্তম্ভিত বিস্ময়ে সারটভের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল পিকেরিং। মাথার ভেতর কিলবিল করে উঠল তীক্ষ্ণ মুখ কতগুলো প্রশ্ন। কিভাবে? কেন? কি ঘটেছে?

শুধু অভিজ্ঞ নয়, প্র্যাকটিক্যাল লোক, নিজেকে পিকেরিং দিশেহারা হতে দিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিল সে। প্রশ্নগুলোর উত্তর তাকে পেতেই হবে, উত্তরগুলোর ওপর নির্ভর করছে জীবন-মৃত্যু, কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া সাজে না। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'তারমানে প্ল্যান বদলাতে হবে। টিউলিপকে নিয়ে নসোসে রয়েছে রানা। ওকে পেতে হবে আমার।'

পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ির গোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় দপ্ করে জ্বলে উঠল আলো, সেই সাথে বুলহর্নে নির্দেশ শোনা গেল। পুলিস! পুলিস এল কোথা থেকে?

একটা ভাঁড়ার ঘরে গা ঢাকা দিল রানা, ওখানে আকাশের

দিকে মুখ খোলা সরু একটা শ্যাফট রয়েছে। লাফ দিল ও, কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল, তারপর পাথুরে দেয়ালে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল বাইরে।

গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে গোটা দৃশ্য পরিষ্কার দেখা গেল। বেড়া টপকে পালাচ্ছে পিকেরিং, তার পিছু পিছু ছুটছে পুলিস। তবে আরও পুলিস রয়েছে, ধ্বংসাবশেষের ভেতর তল্লাশি চালাচ্ছে তারা।

মেঝেতে নামল রানা। এক সেকেণ্ড চিন্তা করল। তারপর করিডর ধরে আবার ফিরে এল রাজকীয় অ্যাপার্টমেণ্টগুলোর কাছে। পিছন থেকে ভেসে এল ফিসফাস গলার আওয়াজ, বুট জুতোর ভোঁতা শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে পুলিস। গ্রীক ভাষায় নির্দেশ শোনা গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সশস্ত্র লোকজন। ছুটন্ত পায়ের শব্দ, এদিকেই আসছে।

কামরাটা ভাল করে দেখল রানা। খালি কামরা, নগ্ন চারটে দেয়াল, আর মসৃণ সিলিং–লুকোবার কোন জায়গা নেই। নিঃশব্দ পায়ে, দ্রুত, উল্টোদিকের দরজা দিয়ে ইংরেজি বর্ণমালার এল আকৃতির একটা করিডরে বেরিয়ে এল ও। করিডর থেকে আরেক চেম্বারে ঢুকল। আগেরটার চেয়ে ছোট এটা, দেয়ালে নীল ডলফিন আঁকা। নসোস-রাণী সখীদের নিয়ে খেলা করতেন এখানে। গোলকধাঁধার শেষ মাথা বলা চলে।

দরজা আরও একটা আছে, সরাসরি রাণীর কামরায় ঢোকা যায়। তারপর ছোট একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের মাথায় খুদে একটা ঘর–রাণীর বাথরুম।

বাথরুমে কোন আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি, ট্যুরিস্টরা শুধু দিনের বেলা আসতে পারে এখানে। মেঝেতে লম্বা হয়ে রয়েছে বড়সড় পাথরের তৈরি বাথটাব, আজও অটুট। ভাবতে আশ্চর্য লাগে শেষবার রাণী এখানে গোসল করার পর চার হাজার বছর

পেরিয়ে গেছে।

বাথটাবের পিছনে হাঁটু মুড়ে বসল রানা, তারপর শুয়ে পড়ল।

ওর পথ ধরেই এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। এল আকৃতির করিডরে পৌঁছে গেছে পুলিস। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ, তার মধ্যে একজোড়া রাণীর কামরায় ঢুকল। আরও কয়েক জোড়া পিছু পিছু ঢুকল। হঠাৎ সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আবার এগোল। ছোট্ট প্যাসেজে বেরিয়ে এল লোকগুলো। বাথরুমের দিকে আসছে।

রানার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল।

সবাই আসছে না, মাত্র দু'জন।

নিথর পড়ে থাকল রানা, এক চুল নড়ল না। অক্সিজেনের অভাবে বুক ফেটে যাবার অবস্থা হওয়ায় মাত্র দু'একবার শ্বাস নিল ও।

বাথরুমের দরজায় পৌঁছুল একজোড়া পা। পিছু পিছু এল আরেক জোড়া। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মাকড়সার জাল না কি যেন নাকে ঢুকল, হাঁচি আসতে চাইল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকগুলো, চলেও যাচ্ছে না, ভেতরেও ঢুকছে না। নাক আর মুখে হাত চাপা দিয়ে হাঁচি আটকে রাখল রানা।

টর্চের আলো পড়ল বাথরুমে।

আলোটা খুদে কামরার কোণগুলোয় ঘোরাঘুরি করল কিছুক্ষণ, বার কয়েক বাথটাবের কিনারা ছুঁয়ে গেল। রানা যেন জড়পদার্থ, নড়ছে না। হঠাৎ টর্চ ধরা হাতটা দ্রুত ঘুরে গেল, আলোটা মেঝের নির্দিষ্ট একটা জায়গার ওপর স্থির হলো।

'ওটা কি?'

এক মুহূর্ত কোন শব্দ হলো না। তারপর একজোড়া পা চৌকাঠ পেরিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল। বাথটাবের পাশে মেঝের ওপর হাত বুলাল সে। সিধে হলো। 'পয়সা। আমেরিকান।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল।

দোরগোড়া থেকে অপর লোকটা হেসে উঠল। 'তাতে কি? রোজ হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসছে, পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে না? দেখাই তো যাচ্ছে কেউ নেই এখানে–চলো!'

টর্চের আলো নিভে গেল। আবার শব্দ হলো পায়ের। দূরে সরে যাচ্ছে।

বসল রানা। উঁকি দিয়ে বাথটাবের ভেতর তাকাল। তলাটা গাঢ় রঙের চাদরে ঢাকা। চাদরটা সরাল ও।

নির্ভাবনায় আগের মতই ঘুমাচ্ছে টিউলিপ কনওয়ে। সারা মুখে নিবিড় প্রশান্তি, বন্ধ পাতার ভেতর চোখের মণি একটুও নড়ছে না। আবার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে রানা, বেচারি জানে না তার ওপর দিয়ে কি ধরনের বিপদ যাচ্ছে। এক অর্থে ঘুমের ওষুধই টিউলিপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। আরেকটা বাস্তব সত্য হলো, টিউলিপই এখন রানার একমাত্র রক্ষাকবচ। টিউলিপকে হারালে ওর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

টিউলিপের পালস পরীক্ষা করল রানা, স্বাভাবিক। তার গায়ে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে দিল, তারপর চাদর সহ তুলে নিল কাঁধে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

সেই খালি কামরাটার বাইরে, করিডরে, পাহারায় রয়েছে একজন পুলিস। পিছিয়ে এসে কামরাটা আরেকবার খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট দেয়াল। সিলিঙে কোথাও ফাঁক-ফোকর নেই। ওর পিছনে রাণীর কামরা, গোলকধাঁধার শেষ প্রান্ত। বেরুবার শুধু এই একটাই রাস্তা।

টিউলিপকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। দরজা দিয়ে উঁকি দিল আবার করিডরে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। হাত দুটো দু'পাশে ঝুলে আছে ঢিলেঢালা ভাবে। কিন্তু চোখ সতর্ক। ডান হাতে রিভলভার।

কোমরের বেল্ট থেকে নিজের রিভলভারটা বের করল রানা। দরজার আরেক পাশে সরে গিয়ে রিভলভারটা তুলল। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল ও। তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

আঁতকে উঠে লাফ দিল পুলিস। রিভলভার ধরা হাতটা তুলল, গুলি করার জন্যে তৈরি। লোকটা ঘুরেছে, তবে যেদিক থেকে গুলি হলো সেদিকে নয়, টার্গেটের দিকে। মাথার ওপরকার বালবটা বিস্ফোরিত হলো, গুঁড়ো কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল সে, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে রিভলভার, প্রায় অন্ধকার লম্বা করিডরের শেষ মাথার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ডান দিকের খোলা দরজাগুলো দিয়ে রাজকীয় অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া যায়, বাঁ দিকের দরজাগুলো দিয়ে যাওয়া যায় কারিগরদের কারখানায়। দু'পাশের যে-কোন দরজা দিয়ে ভাঁড়ার ঘর, পোশাক ঘর, খেলা ঘর, বসার ঘর, ইত্যাদি আরও অনেক ঘরে যাওয়া যায়। করিডরের শেষ মাথায় ছোট, খিলান আকৃতির একটা ভারী দরজা, তালা ঝুলছে।

গুলিটা কোত্থেকে হয়েছে বোঝার উপায় নেই।

এক পা সামনে বাড়ল লোকটা। কোথাও কোন শব্দ নেই। সাহস একটু বাড়ল। আরও এক পা এগোল সে।

প্রতিটি পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছে রানা। দরজার সামনে থেকে সরে এসেছে ও, পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দরদর করে ঘামছে। রিভলভারটা বেল্টে গুঁজে রেখেছে ও। হাত দুটো পিছনের দেয়ালে সেঁটে রয়েছে। সাবধানে, ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে লোকটা। দরজার দিকে।

দাঁড়াল।

দরজার ভেতর অন্ধকার। উঁকি দিল সে। স্যাঁৎ করে দোরগোড়ায় বেরিয়ে এল রানা, রিভলভার ধরা হাতে ঝাপটা মারল জোরে, খটাস করে মেঝেতে পড়ল সেটা। অপর হাত দিয়ে

লোকটাকে কাছে টানল রানা, নিজের বুকের ওপর। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছিল লোকটা, কিন্তু রানার কাঁধ তার মুখচাপা দিল। ধস্তাধস্তি শুরু করল লোকটা, তার পিঠ থেকে হাত সরিয়ে চোয়ালের পাশে গলায় জোরে মারল রানা। নার্ভ সেন্টারে তীব্র ব্যথা নিয়ে জ্ঞান হারাল পুলিস। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু।

ধীরে ধীরে তাকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। টিউলিপকে কাঁধে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ও। ছোট খিলান আকৃতির দরজার দিকে দ্রুত পা চালাল। পুরানো তালাটা আগেই সরিয়ে ফেলেছে রানা, যেটা ঝুলছে সেটা ওর নিজের তালা। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল সেটা। টিউলিপের পিঠে একটা হাত রেখে ভেতরে ঢুকল।

এটা ঠিক কোন কামরা নয়। এক কালে ছিল বটে, এক সময় আবার হয়তো বা হবে। স্রেফ একটা গুহা, মাটি আর খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতিতে ঠাসা–কোদাল, শাবল, চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি, মাটির তৈরি তৈজস-পত্রের ভাঙা অংশ, ইত্যাদি। বিধ্বস্ত একটা চেম্বার, ট্যুরিস্টদের দেখানোর জন্যে নয়। ম্যাপে এটার হদিশ পাওয়া যাবে না।

বৈদ্যুতিক আলোর কোন ব্যবস্থা নেই এখানে, সিলিং থেকে শুধু একটা ব্যাটারিচালিত ল্যাম্প ঝুলছে। আর রয়েছে নসোসের সর্বশেষ আবিষ্কার–একটা টানেল, ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত, প্রাসাদের আবাসিক এলাকার বাইরে।

পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা। শুধু যে ঢালু তাই নয়, বাঁকা হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে সুড়ঙ্গটা। তবে তাড়াহুড়ো করার এখন আর কোন দরকার নেই, টিউলিপকে নিয়ে পালাতে পেরেছে রানা।

টানেলের মুখ দেখা গেল। এক মিনিট পর খোলা বাতাসে বেরিয়ে এল ওরা।

রানার পিছনে, পাহাড়ের মাথায় ফ্লাডলাইট জ্বলছে। সামনে শুধু অন্ধকার–চাঁদ আছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘে ঢাকা পড়েছে। টানেলের মুখ থেকে বেশ কিছুদূর ভাল আড়াল পাওয়া গেল। প্রচুর মাটি অনেক দূর পর্যন্ত দশ পনেরো ফিট উঁচু হয়ে আছে। চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। নদীর কিনারা আড়াল করে আছে সাইপ্রেস গাছের সারি।

তীরে একটা বোট, ঢেউয়ের দোলায় একটু একটু দুলছে। সাধারণ একটা নৌকো, ইঞ্জিন নেই। রশি টেনে নৌকোটাকে কাছে আনল রানা। ঘাস থেকে দু'হাতে তুলল টিউলিপকে। নৌকার পাটাতনে শুইয়ে দিল তাকে।

নোঙর তুলল রানা। স্রোতের টানে খানিকদূর সরে এল নৌকো, তারপর পানিতে বৈঠা নামাল ও। আলো, পুলিস, আর হেনরি পিকেরিঙের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

বেশি দূরে নয়, রাস্তার পাশে জঙ্গলে রানার একটা গাড়ি লুকানো আছে।

সাত

পায়চারি করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীট পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠতে দেখছে পিকেরিং। তার পিছনের একটা টেবিলে রেডিও সেটটা রয়েছে, সারারাত কেটে গেল একবারও জ্যান্ত হয়ে ওঠেনি। রাস্তায়, নসোসের দু'পাশে, নিজের দু'জন এজেন্টকে

পাহারায় রেখেছে পিকেরিং, তারা কোন রিপোর্ট করেনি। রিপোর্ট করার কিছু থাকলে তো। পুলিস অবশ্য খুব ছুটোছুটি করেছে, তাও সারারাত নয়।

হতে পারে রানা হয়তো এখনও ধ্বংসাবশেষের ভেতর রয়ে গেছে, ভাবল পিকেরিং। রানা হয়তো প্ল্যান করেছে ঘণ্টা কয়েক পর ট্যুরিস্টদের জন্যে গেট খুলে দিলে তখন পালাবার চেষ্টা করবে। সম্ভব, কিন্তু মনে হয় না। রানার কাজের ধারা ওরকম নয়। সে জানবে, ট্যুরিস্টদের জন্যে গেট খোলার পরও পুলিস থাকবে। সাদা পোশাকে লক্ষ্য রাখবে তারা। উঁহুঁ, আরও নিরাপদ কোন পথ ব্যবহার করবে রানা।

হয়তো পথটা এরই মধ্যে পেয়ে গেছে সে। পিকেরিঙের কাঁধ ঝুলে পড়ল। জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু গাল দিচ্ছে অবিরাম–রানাকে নয়, নিজেকে। একটা দরজা খোলার আওয়াজ হওয়ায় তার মরা-বাপ এতক্ষণে রেহাই পেল।

সারটভ।

'ধরেই নিচ্ছি নতুন কিছু ঘটেনি?'

মাথা নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল পিকেরিং।

'তারমানে তুমি ফেল করেছ।'

ঝট্ করে ফিরল পিকেরিং। 'ফেল? বিচারটা কে করে?'

'আমি নই,' বলল সারটভ। একটা চেয়ারে বসল সে। 'এইমাত্র মস্কোর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম।'

বুকের ভেতর কিসের একটা মোচড় আর গড়াগড়ি অনুভব করল পিকেরিং, চিনতে পারল সে, ভয়ের অনুভূতি। মনের জোর খাটিয়ে ঝেড়ে ফেলল সেটা। 'আমি বলব এখুনি তার কোন দরকার ছিল না।'

'হয়তো।' কাঁধ ঝাঁকাল সারটভ। 'কিন্তু ওরা যে তোমার

ওপর খুব খুশি নয় সেটা পরিষ্কার জানা গেছে। ওদের দৃষ্টিতে তুমি এখন একটা···বোঝা। সুতো ওরা কেটে ফেলতে চাইছে।'

'তাই? স্রেফ চোখ উল্টে নেবে?'

মাথা ঝাঁকাল সারটভ। 'স্বীকার করি, সিদ্ধান্তটা রূঢ়।'

'রূঢ়? বলো, মৃত্যুদণ্ড! আশ্চর্য, আর কি চায় ওরা? ওদের আমি অ্যারো, এগম্যান, মেরিলিনকে পাইয়ে দিয়েছি। সম্ভবত রানাকেও, তাই না?'

'তা বটে,' বলল সারটভ। 'মস্কো সেজন্যে তোমার ওপর কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওরা তোমাকে যে অ্যাসাইনমেণ্ট দিয়েছিল সেটায় তুমি ব্যর্থ হয়েছ: সি.আই.এ-র ডিরেক্টর পদে কে.জি.বি.-র একজন এজেণ্ট। শুধু যে অ্যাসাইনমেণ্টে ব্যর্থ হয়েছ তাই নয়, নিজের বেলুনও তুমি ফাটিয়ে দিয়েছ, ফাঁস হয়ে গেছ তুমি। তোমার হাত খালি, মুঠোয় কিছুই নেই যে দর কষবে।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড রাশিয়ান লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল পিকেরিং। তারপর হঠাৎ গভীর হতাশায় মুষড়ে পড়ে দ্রুত, অস্থিরভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। 'সত্যি, ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছিলেন,' রানার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। 'মস্কো থেকে তাগাদা, ওয়াশিংটনের মন যোগানো–সত্যি ভারী কঠিন কাজ।' কঠিন বটে, কিন্তু এতদিন সুষ্ঠুভাবেই করে এসেছে সে।

বিপর্যয়টা উপলব্ধি করতে পারল পিকেরিং–একসাথে দু'পক্ষকে হতাশ করেছে সে। মস্কো তার ব্যর্থতায় অসন্তুষ্ট, ওয়াশিংটন তার বেঈমানীতে হতভ'। দু'পক্ষই এখন তার গর্দান নিতে চাইবে।

রাতে সারটভের কাছ থেকে সব শুনেছে পিকেরিং। গোটা ব্যাপারটা চমৎকারভাবে সাফল্যের দিকে এগোচ্ছিল। পিকেরিঙের প্ল্যান সফল হতে যাচ্ছে দেখে মস্কো উল্লাস বোধ করছিল। পিকেরিং কোণঠাসা করে ফেলেছিল জেফ রিকার্ডকে। সাহায্যের

জন্যে সত্যি সত্যি জেফ রিকার্ড রাশিয়ানদের কাছে গিয়েছিলেন–দূতাবাসের পোলোনভের কাছে। বলাই বাহুল্য, পোলোনভ ঘটনাটা মস্কোকে জানায়। জেফ রিকার্ড পিকেরিংকে সন্দেহ করছে, মস্কোর জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল।

মাথার চুলে ঘন ঘন আঙুল চালাল পিকেরিং। কে জানত এমনটি ঘটবে।

শেষরক্ষার নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় আছে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। মাথায় একটা আইডিয়া এল। আছে, উপায় আছে। প্ল্যান একই থাকবে, একটু শুধু রদবদল দরকার। সারটভের দিকে ফিরল সে। 'আবার যোগাযোগ করো মস্কোর সাথে,' বলল সে। 'ওদের বলো, অ্যাসাইনমেন্ট এখনও সফল করা যায়।'

'কিভাবে?'

'প্ল্যান একটু বদলে। মেয়েটাকে উদ্ধার করে তাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব। তবে সমস্ত দোষ চাপাব রানার ওপর।'

'রানার ওপর? কিন্তু জেফ রিকার্ডকে কি বলবে? তার সাথে তোমার দীর্ঘ সময় যোগাযোগ নেই। তার কি ব্যাখ্যা দেবে? তাকে তুমি কিভাবে সামলাবে?'

'টিউলিপকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে সে কিভাবে সামলাবে আমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল পিকেরিং। 'জেফ রিকার্ড আমাকে সন্দেহ করে, কিন্তু কিছুই সে পরিষ্কার জানে না। টিউলিপকে বাবা-মার হাতে তুলে দিয়ে আমি তার সন্দেহ দূর করব। অন্তত এতে করে, খানিকটা জটিলতা সৃষ্টি হবে। তারপর আমি তার সন্দেহ রানার দিকে ফেরাব।'

'আর রানা, স্বভাবতই, মারা যাবে।'

'অবশ্যই। যোগাযোগ না করার কারণ হিসেবে বলব, যখন জানতে পারলাম টিউলিপকে রানা কিডন্যাপ করেছে,

সি.আই.এ-র সাথে সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিই আমি, কারণ আমি আগে থেকেই জানতাম সি.আই.এ-তে রানার অনেক বন্ধু আছে। জেফ রিকার্ড তাদের মধ্যে একজন নয়, আমার জানা ছিল না। কি করতে হবে আমি বুঝতে পারিনি।'

এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল সারটভের ঠোঁটে। 'বলা যায় না, এতে কাজ হতে পারে।'

'কাজ হতেই হবে!' জোর দিয়ে বলল পিকেরিং।

'তবে, কাজ হবে কি হবে না নির্ভর করছে রানাকে তোমার খুঁজে পাবার ওপর।'

'ওরা যদি আমাকে সময় দেয়, রানাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। জানোই তো, এখনও সি.আই.এ-তে আমার লোকজন আছে। ওখানে ওদের আমি ঢুকিয়েছি। ওরা সবাই এখনও আমার প্রতি বিশ্বস্ত।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সারটভ। তারপর শ্রাগ করল সে। 'ঠিক আছে, দেখব ওরা কি বলে।'

মাথা ঝাঁকাল পিকেরিং। পরম স্বস্তিবোধ করল সে। এই প্রস্তাব মস্কোকে মেনে নিতে হবে। সারটভ কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, জানালার দিকে পিছন ফিরে তার চলে যাওয়া দেখল সে। এরই মধ্যে রানাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। কি করবে রানা, কি করতে পারে?

রানাকে তার পেতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। পেতে হবে টিউলিপ কনওয়েকে। এরও কোন বিকল্প নেই। চার বছরের একটা বাচ্চা, পিকেরিঙের শেষ আশা। বেঁচে থাকার একমাত্র অবল'ন।

এথেন্সে সকাল হলো, গ্রীক ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর এখনও তাঁর অফিসে বসে আছেন। সামনের চেয়ারে আরেকজন লোক

রয়েছে। দু'জনের মাঝখানে ডেস্কে, একটা রিপোর্ট।

রিপোর্ট থেকে চোখ তুলে এজেন্ট লোকটার দিকে তাকালেন ডিরেক্টর। দ্রুত, ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকালেন। তারপর ক্রেডল থেকে তুলে নিলেন রিসিভার।

মহাসাগর পেরিয়ে আরেক মহাদেশের সাথে যোগাযোগ হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সরাসরি হোয়াইট হাউসের লাইন পেলেন তিনি। আরও এক মিনিট লাগল অপরপ্রান্তে জেফ রিকার্ডকে পেতে।

'হেনরি পিকেরিঙের সন্ধান পাওয়া গেছে, মি. রিকার্ড,' গ্রীক ইন্টেলিজেন্স চীফ বললেন। সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

কাইরাটস নদীতে মাছ ধরছিল এক জেলে। নসোস ধ্বংসাবশেষে বারবার উজ্জ্বল আলো জ্বলতে নিভতে দেখে তার সন্দেহ হয়। তার মাছ ধরা শেষ হয়েছিল, ফেরার পথে পুলিসকে ব্যাপারটা জানায় সে। হেরাক্লিয়ন পুলিস সাথে সাথে সেখানে একটা পেট্রল কার পাঠায়।

নসোসে পৌঁছে পুলিস দেখে অজ্ঞান করে গার্ডদের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। পরে জানা যায়, ইঞ্জেকশন পুশ করে তাদের অজ্ঞান করা হয়েছিল। পুলিস অফিসার বড় ধরনের বিপদ আশঙ্কা করে আরও পুলিস চেয়ে রেডিও সিগন্যাল পাঠায় হেরাক্লিয়নে।

একজন লোক, আমেরিকান, দু'জন পুলিসকে খুন করে বেড়া টপকে পালিয়েছে। বেড়ার বাইরে তার গাড়ি ছিল। ধ্বংসাবশেষ সার্চ করে একটা লাশ পাওয়া গেছে–মেয়ের। সন্ধান নেয়া হয়েছে, কিন্তু তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এথেন্সে রেকর্ড করা নেই। নমুনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটনের পথে।

'কিন্তু,' গ্রীক ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর বললেন, 'ফটো দেখে লোকটাকে আমরা চিনতে পেরেছি। হেনরি পিকেরিং। না, কোন

সন্দেহ নেই। তবে দুঃখের বিষয়, আমরা জানি না তিনি এখন কোথায়।'

অপরপ্রান্ত থেকে জেফ রিকার্ড কথা বললেন।

তারপর আবার মুখ খুললেন গ্রীক চীফ, 'আরও একটা ব্যাপার। ধ্বংসাবশেষে আরেকজন লোককে দেখা গেছে। দেখা গেছে বললে ভুল হবে; সে একজন পুলিসকে আহত করে। লোকটা কে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তবে হেনরি পিকেরিং পালাবার আগে একটা নাম ধরে ডাকেন। আমার এজেন্টের মুখে শুনেছি, নামটা ছিল–রানা।'

ওয়াশিংটনে ভুরু কুঁচকে উঠল জেফ রিকার্ডের। রানা? তারপর, অকস্মাৎ, তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রানা?

হ্যাঁ, অবশ্যই! কিংবদন্তীর নায়ক মাসুদ রানা! ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে ঢুকে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার সাহস বা স্পর্ধা একমাত্র তারই থাকতে পারে। বিদ্যুৎ চমকের মত রানার অতীত রেকর্ডগুলো এক এক করে মনে পড়ে গেল তাঁর। এই তো সেই কাপু উ-সেনকে খুন করেছিল? এই তো সেই রানা, রাশিয়া থেকে মিগ-৩১ চুরি করে এনেছিল? মেরিলিন চার্ট এনে দিয়েছে–মাসুদ রানাই তো!

পিকেরিঙের সাথে যোগাযোগ ছিল রানার। মেরিলিন চার্ট সংগ্রহ করার কাজটা রানা নাকি নিতে চায়নি, বুঝিয়ে-শুনিয়ে পিকেরিংই তাকে রাজি করিয়েছিল। দু'জনের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক না থেকেই পারে না। পিকেরিংই তো অসলোয় গিয়েছিল, যেখানে রানা মারা গেছে বলে রটানো হয়েছিল। পিকেরিংই লাশটা সনাক্ত করার ব্যবস্থা করে।

রানা তাহলে মারা যায়নি!

ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। 'বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে,' থমথমে গলায় বললেন

তিনি, 'কিন্তু না বলেও পারছি না। বিকট একটা সমস্যায় পড়ে গেছি আমরা। তোমার মেয়ে কার কাছে আছে আমি জানি। বিদেশী এক ভয়ঙ্কর লোকের হাতে।'

'কে সে? কি চায় সে? কে তার বস্? কার হয়ে কাজ করছে ইডিয়েটটা?'

'তার নাম মাসুদ রানা,' জেফ রিকার্ড বললেন। 'সম্ভবত কারও হয়েই কাজ করছে না। মুশকিল হলো, সে যদি স্বেচ্ছায় ধরা না দেয়, তাকে ধরা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করি আমি। তার অতীত রেকর্ড জানি বলেই এ-কথা বলছি।'

'সি.আই.এ...'

প্রেসিডেন্টকে থামিয়ে দিয়ে সি.আই.এ. চীফ বললেন, 'সি. আই.এ. দিয়ে কাজ হবে না, রিচার্ড। তবে, একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, টিউলিপের কোন ক্ষতি মাসুদ রানা করবে না। সারা দুনিয়ায় এ-ই একমাত্র স্পাই, ফুল ছেঁড়া যার স্বভাব নয়।'

স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ডেভিড কপারের, তা প্রায় এক বছর হলো। নির্জনতা ভালবাসে, তাই হেরাক্লিয়ন শহরের একধারে আশ্রয় নিয়েছে সে। বাড়িটার সামনে, রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি থামিয়ে রানা ভাবল, হয়তো সুসানের সাথে বিয়েটা টিকল না বলেই সি.আই.এ. ছেড়ে চলে আসে কপার।

কিংবা তার ধারণা সি.আই.এ-র চেয়ে এয়ারফোর্সের চাকরিতে অনেক বেশি নিশ্চয়তা আছে।

ডিভোর্সের পর কপারের সাথে রানার আর দেখা হয়নি। তবে টেলিফোনে দু'একবার আলাপ হয়েছে, জানে হেরাক্লিয়ন ইউ.এস. এয়ারফোর্স বেসে ডিউটি করে সে, কিন্তু বাস করে বেসের বাইরে। পুরানো বন্ধু, দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও খবরাখবর রাখতে

হয়।

ওকে দেখে নিশ্চয়ই ভূত দেখার মত চমকে উঠবে কপার।

গাড়ি থেকে নামার আগে পিছনের সীটের নিচে ওর আরোহীকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করল রানা। নিচে নেমে তালা দিল দরজায়। লন পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। প্রথমে একবার, দশ সেকেণ্ড বাদে পরপর দু'বার চাপ দিল কলিং বেলের বোতামে।

বাড়ির ভেতর আলো জ্বলে উঠল। দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে কপার। এরপর আলোকিত হলো পোর্চ। খুলে গেল দরজা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড কপার। খালি পা, গায়ে পুরানো একটা বাথরোব। সেই আগের চেহারা, একটুও বদলায়নি। লম্বা কালো চুল, রানার সমান লম্বা, মায়াভরা চোখ। আর সেই অতি পরিচিত ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

কিছুই বলল না কপার, স্রেফ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চোখ জোড়া, ঝুলে পড়ল চোয়াল। 'শালা ঘাড় মটকাতে এসেছে।'

'সুযোগ দেয়ার জন্যে ঘরে ডাকো,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কিংবা পোর্চের আলোটা অন্তত নেভাও।'

'রানা!' উল্লাসে ফেটে পড়ল কপার। বিশাল পাখির মত উড়ে এল সে রানার গায়ে। সজোরে জাপটে ধরে পিষতে লাগল বন্ধুকে বুকের সাথে। 'আরে, এ যে দেখছি রক্তমাংসের মানুষ!' দ্রুত একবার রাস্তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে—অভ্যেস। মাসুদ রানা মানেই তো মূর্তিমান বিপদ।

জড়িয়ে ধরে রেখে রানাকে ভেতরে নিয়ে এল সে। বোকা নয় অথচ বোকার মত হাসছে। 'হায় ঈশ্বর, এরপরও কি করে বিশ্বাস করি, ইডিয়েটটা মরে গেছে!'

'বুঝতেই পারছ, যারা রটিয়েছে আর যারা বিশ্বাস করেছে তারাই ইডিয়েট।'

'গাল দাও, মারো, যা খুশি করো, কিন্তু মোরো না, ভাই!' রানাকে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল কপার, আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল রাস্তার ওপর। 'কিন্তু এই অসময়ে এখানে তুমি কি করছ বলো তো?'

'সে এক লম্বা কাহিনী। আগে এক কাপ কফি খাওয়াও দেখি,' বলল রানা।

'শুধু কফি? ঠিক আছে, আপাতত কফিই চলুক। সারারাতই তো পড়ে আছে, মদের মধ্যে গড়াগড়ি খাব দু'জনে। মৃত বন্ধুকে ফিরে পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে ঘটে—সেলিব্রেট করব না!'

মুচকি হেসে কপারের পিছু পিছু কিচেনে ঢুকল রানা।

হাতে কফির কাপ নিয়ে পুরানো দিনের গন্ধে মেতে উঠল দুই বন্ধু। কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে উঠল কপার, নিচু গলায় জানতে চাইল, 'সোহানার খবর কি?'

'আছে আর কি···।'

'নিশ্চয়ই ভাল নেই···'

চট্ করে তাকাল রানা। 'তোমার এ-কথার মানে?'

'এমন একজনকে ভালবাসে বেচারি যাকে বিয়ে করা যাবে না—ভাল থাকে কি করে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কপার। 'তুমি যে একটা কি! ঈর্ষা হয়, বুঝলে, ঈর্ষা হয়। ওরকম একটা মেয়ে আমাকে যদি ভালবাসত, তার জন্যে স্রেফ জান দিয়ে দিতাম।'

প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল রানা। 'হেনরি পিকেরিংকে ইদানীং দেখেছ নাকি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও।

'পিকেরিং? হেল, নো। ও-সব থেকে একেবারেই বেরিয়ে এসেছি আমি। বোধহয় এখনও সে ল্যাংলির ডেস্কে আঠার মত

আটকে আছে।'

'সব সময় নয়। মাঝে মধ্যে ফিল্ডেও তাকে দেখা যায়।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'যোগ্য লোক।'

'এসপিওনাজ জগতের সেরা,' বলল কপার। 'অবশ্য এখন ওকে বুড়োই বলা যায়।' রানা আর কপারের বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে কোন অসুবিধে হয়নি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। অত্যন্ত যোগ্য এজেন্ট ছিল কপার। পিকেরিঙের সাথে তার বয়সের ব্যবধান খুব বেশি নয়।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'মাঠে কাজ করার জন্যে তার বয়স একটু বেশি হয়ে গেছে। তাছাড়া, লোকটাকে আমার কোন দিনই খুব একটা পছন্দ হয়নি। আমি তাকে বিশ্বাস করি না।'

কপারের মুখের হাসি দপ্ করে নিভে গেল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। তারপর সে তার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলাল। 'কথাটা আরেকবার বলো।'

'ঠিকই শুনেছ,' আশ্বস্ত করল রানা।

'মাই গড! কি বলছ তুমি, রানা!'

'ঠিকই বলছি। হেনরি পিকেরিংকে আমি বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ হেসে উঠল কপার। 'ওহ্-হো! ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটা তো তোমার একটা বৈশিষ্ট্য। কাউকে বিশ্বাস না করা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।'

মুচকি হাসল কপার। 'অবশ্যই, যতক্ষণ তোমার চোখের সামনে থাকি! বাট ক্রিস্ট! পিকেরিং? সে ডেপুটি ডিরেক্টর!'

'জানি।'

যা জানার ছিল জেনে নিয়েছে রানা। কপারের সাথে যোগাযোগ নেই পিকেরিঙের। হাত নেড়ে বিরক্তিসূচক একটা ভঙ্গি

করল ও, যেন এ-প্রসঙ্গে তার আর কোন আগ্রহ নেই। কফির কাপে চুমুক দিল। 'সুসান কেমন আছে?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল লক্ষ করে থাকলেও কপালের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। 'সুসান, তাই না?' তিক্ত হাসল সে। 'ভরণপোষণের জন্যে মাসে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা গুনতে হচ্ছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলতে পারো।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, টেবিলে কনুই, দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দেরাজের ভেতর থেকে দুটো অ্যাসপিরিন বের করল। ট্যাবলেট খেয়ে টেবিলে ফিরে এল আবার। 'সুসানের নামটা শুনেই মাথা ধরে গেল। শেষ খবর জানি, পাঁচ ছেলের বাপ এক পেইন্টারের সাথে ঢলাঢলি করছে। প্রথমে পালা করে আমার সব ক'জন বন্ধুর সাথে শুয়েছে, তুমি বাদে। বাদ দাও ওর কথা। তবে একটা কথা জানি, ও আবার বিয়ে না করা পর্যন্ত আমার ধনী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।' কথা শেষ করে আবার চেয়ার ছাড়ল সে। টলতে লাগল।

দেখেও রানা কিছু বলল না।

'হলো কি আমার!'

'আবার বুঝি রাত জাগছ?'

চেষ্টা করে একটু হাসল কপার, যেন দুষ্টামি করে ধরা পড়ে গেছে। টেবিল থেকে দূরে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল সে।

'এয়ারফোর্স কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল। দু'বেলা দু'ঘণ্টা করে ডিউটি, বাকি সময় স্বাধীন। সামান্য উত্তেজনা। ভাল এই জন্যে যে কাছাকাছি সুসান আছে এই অনুভূতিটা নেই।'

'গুড।'

'জেসাস! কি ঘটতে চলেছে!'

তারপর হঠাৎ মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে

পারল। চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু খানিকটা উঠে আর পারল না। চোখের দৃষ্টি ভোঁতা হয়ে আসছে, যেন অনেক দূরে তাকিয়ে আছে। 'কফির সাথে, তাই না?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কি জিনিস?'

'স্থায়ী কিছু নয়,' বলল রানা। পকেটে হাত ভরে খুদে আকৃতির একটা পিল বের করে দেখাল কপারকে। ডিয়াটল, হেরাক্লিয়নের একটা ফার্মেসি থেকে চুরি করা। চুরি ধরা পড়লে ফার্মেসির মালিক থানায় রিপোর্ট করবে বলে মনে হয় না। দু'চারটে ট্যাবলেট চুরি হলে কে আবার থানা-পুলিস করতে যায়।

'ক'টা?' জানতে চাইল কপার।

'দু'দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। ঘুম ভাঙার পর দারুণ ভাল লাগবে তোমার। আমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে না। দু'দিনের মধ্যে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাব আমি।'

'ধন্যবাদ।' দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ছে কপার। ঘাড়ের ওপর মাথা সোজা রাখতে পারছে না। আর মাত্র একটা প্রশ্ন করল সে, 'কেন?'

'দুঃখিত, কপার, সব বলার মত সময় নেই হাতে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। খুব দরকার ছিল বলে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে আমাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...'

'আমারও তাই ধারণা,' কথাগুলো জড়িয়ে এল কপারের। 'গুরুত্বপূর্ণ না হলে...' এক ছুটে তার কাছে চলে এল রানা, চেয়ার থেকে কপার পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলল।

কাঁধে ফেলে অজ্ঞান দেহটাকে দোতলায় নিয়ে এল রানা। বেডরুমে ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দিল। কপারের চাবি নিয়ে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে এল ও। গ্যারেজটা পিছন দিকে, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। গাড়িটা ছোট একটা সাদা ফিয়াট। সেটা বের করে, গ্যারেজে নিজেরটা ঢুকিয়ে রাখল রানা। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল টিউলিপকে।

দু'ঘণ্টা পর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। 'ক্যাপটেন ডেভিড কপার বলছি। আজ যেতে পারব না বলে ফোন করছি। মনে হয় ফ্লু হয়েছে আমার।'

'শুনে দুঃখ পেলাম, স্যার,' অপরপ্রান্ত থেকে ডিউটি অফিসার বলল। 'আপনার সেকশনকে এখুনি আমি জানিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।' কাশতে কাশতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। টিউলিপকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, কপারের ফিয়াটে উঠে স্টার্ট দিল।

হেরাক্লিয়ন এয়ারপোর্ট টার্মিন্যালে ঢোকার মুখে ধূসর রঙের একটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে আছে, প্যাসেঞ্জার সীটে বসে রয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট। একই দরজার কাছে পিঠে আরও ছয়জন ব্রিটিশ এজেন্টের ডিউটি পড়েছে। বাকি তেরো জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিচ্ছে এয়ারপোর্ট ভবন, মেইন গেট, লাউঞ্জ, টিকেট কাউন্টার এবং ডিপারচার লাউঞ্জ।

ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এম-সিক্সটিন-এর এজেন্ট ওরা সবাই, হেরাক্লিয়ন আর চানিয়া এয়ারপোর্ট পাহারা দেয়ার দায়িত্ব বর্তেছে ওদের ওপর। অন্যান্য এজেন্সির লোকেরা বন্দর, রাস্তা, যানবাহন, হোটেল, কাস্টমস ইত্যাদি পাহারা দিচ্ছে। ক্রীট থেকে হাজার হাজার লোক বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের সবার মুখের ওপর চোখ বুলানো হচ্ছে। কিন্তু মাসুদ রানা এখনও কারও চোখে ধরা পড়েনি।

মাসুদ রানা। মার্সিডিজে বসে লোকটা ভাবল, কে এই মাসুদ

রানা? কি করেছে সে? নিশ্চয় সাংঘাতিক একটা কিছু হবে। প্রথমে বলা হলো, হেনরি পিকেরিংকে খোঁজো, এখন আবার নতুন একজন যোগ হলো–মাসুদ রানা। যতটুকু শুনেছে সে, পাহারা শুধু ক্রীটেই বসানো হয়নি। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে, ভয়ঙ্কর আর গোপনীয়। সরাসরি ফরেন অফিস থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের।

কিন্তু ফরেন অফিস নির্দেশ পেল কোত্থেকে? ডাউনিং স্ট্রীট? নাকি হোয়াইট হাউস থেকে? আয়োজনের বহর, আর জরুরী হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকেও এসে থাকতে পারে নির্দেশটা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার আলামত কিনা কে জানে!

তার গাড়ির ডান দিক ঘেঁষে একজন ইউ.এস. এয়ারফোর্স অফিসার হেঁটে গেল। হয়তো এই লোকটার ওপরও নজর রাখা হচ্ছে, ভাবল ব্রিটিশ এজেন্ট। কিংবা এই লোকটার ওপরও দায়িত্ব বর্তেছে সবার ওপর নজর রাখার। কে যে নজর রাখছে না, বলা কঠিন। এয়ারপোর্টে নাকি তারা শুধু একা নয়, গ্রীক ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরাও তৎপর। নিশ্চয়ই আমেরিকানরাও ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দু'জন ইসরায়েলী এজেন্টকে তো চিনতেই পেরেছে সে।

সবাই নজর রাখছে, কিন্তু মাসুদ রানার কোন পাত্তা নেই। না মাসুদ রানার, না হেনরি পিকেরিঙের। আচ্ছা, সি.আই.এ. কি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নাকি? তা না হলে হেনরি পিকেরিঙের মত লোককে···সেই তো সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর!

নাহ্, ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব গুরুতর।

এয়ারফোর্স অফিসার টার্মিনাল ভবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এই সময় মার্সিডিজ থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল সে। মুখের সামনে হাত তুলে লম্বা হাই তুলল। বসে থাকলে ঘুম পায়,

একটু হাঁটাহাঁটি করা যাক। এই মাত্র একটা এয়ারপোর্ট বাস এল, আরোহীদের নামিয়ে দিল টার্মিনাল ভবনের সামনে। আরও পঞ্চাশ জন লোক। পরীক্ষা আর প্রশ্ন করে দেখা যাবে, এরা কেউ নয়।

আবার এদের মধ্যেই থাকতে পারে মাসুদ রানা। এমন কি গর্ভবতী ওই মেয়েলোকটাও হতে পারে হেনরি পিকেরিং! কিন্তু পিকেরিং বা রানা সন্দেহ করে এদের সবাইকে ঘেরাও করতে পারে না তারা। সবাইকে যদি আলাদা করে জেরা আর পরীক্ষা করা হয়, দশ বছর সময় লাগবে।

আরেকটা হাই তুলে বাসটার দিকে পিছন ফিরল লোকটা। ডেভিড কপারের সেক্রেটারির বয়স মাত্র উনিশ, এয়ারফোর্সে নতুন ঢুকেছে। দুনিয়াটা ঘুরে দেখার বড় শখ তার, হেরাক্লিয়নে এসে তার ভালই লাগছে। তবে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, এখানে তাকে বেশিরভাগ সময় ডেস্কে বসে থাকতে হয়।

'আমি দুঃখিত, ক্যাপটেন ডেভিড কপার আজ অসুস্থ,' ফোনের অপরপ্রান্তের যুবতীকে বলল সে। 'কাল রাতে তিনি ন্যাটো রিপোর্ট বাড়িতে নিয়ে গেছেন, কিন্তু আজ তিনি আসছেন না।'

যুবতীও একজন সেক্রেটারি, কিন্তু উঁচু পদের। বেসের কমাণ্ডিং অফিসারের কাজ করে সে। 'তাহলে কাউকে তার বাড়িতে পাঠাতে হবে,' নির্দেশের সুরে বলল সে। 'ব্রাসেলস একটা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। রিপোর্টটা আজ সি.ও. সাহেবের না দেখলেই নয়।'

কাউকে। যুবক এয়ারম্যান জানে কাউকে বলতে কাকে বোঝানো হলো। 'ইয়েস, ম্যা'ম,' বলল সে, 'এখুনি যাচ্ছি আমি।'

টিকেট কাউণ্টারের পিছনে বসা সুন্দরী মেয়েটা মুগ্ধ চোখে

তাকিয়ে থাকল। এমন সুদর্শন পুরুষ সহজে চোখে পড়ে না। খেয়াল হতে লজ্জা পেল সে, লোকটা তার দিকে সবজান্তার হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। রাঙা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে, বলল, 'আপনি অলিম্পিক এয়ারলাইন্সে এসেছেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, ক্যাপটেন কপার।' মনে মনে আরেকবার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির প্রশংসা করল সে, সুন্দর দাড়ি সুন্দর মুখেই মানায়। 'এই নিন। আমাদের এথেন্স ফ্লাইট আর চল্লিশ মিনিট পর টেক-অফ করবে। রিটার্ন ডেটটা আমি খালি রেখেছি।'

'ধন্যবাদ।' হাসল রানা। ইচ্ছে করেই রিটার্ন টিকেট বুক করেছে ও। নগদ টাকা কোন সমস্যা নয়, সাথে এখনও এক লাখ ডলার রয়েছে। কিন্তু বাইরে কয়েকজন ব্রিটিশ আর ইসরায়েলী এজেন্টকে দেখে এসেছে ও। ভেতরেও নিশ্চয়ই আছে ওরা। তারমানে কিছুই ওরা চেক করতে বাকি রাখবে না–কেউ শুধু একদিনের টিকেট কাটছে কিনা তাও ওরা নির্ঘাত চেক করবে।

কপারের মানিব্যাগ বের করে টিকেটের দাম মেটাল রানা।

'সাত ন'র গেট,' বলল মেয়েটা। 'পৌঁছে দেয়ার জন্যে আপনার সাথে কোন লাগেজ আছে নাকি?'

হাতে ঝুলে থাকা গারমেন্ট ব্যাগটা দেখল রানা। 'না, ধন্যবাদ। এটা আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারব।'

অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট, কাস্টমস চেকিঙের কোন ঝামেলা নেই।

যুবক সেক্রেটারি আবার কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল। না, তবু কোন সাড়া নেই ভেতর থেকে। বেস থেকে বার কয়েক টেলিফোনও করেছে সে, কেউ রিসিভার তোলেনি। তাহলে? অসুস্থ ক্যাপটেন গেল কোথায়? দরজার সামনে, ধাপের ওপর খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে। তারমানে সত্যি ক্যাপটেন বাড়িতে নেই! রাতটা তিনি অন্য কোথাও কাটিয়েছেন।

অবাক কাণ্ড!

ঘুরে ধাপ ক'টা টপকাল সে, গাড়ির কাছে ফিরে যাচ্ছে। কি মনে করে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাপটেন না হয় বাড়ি নেই, কিন্তু ন্যাটো রিপোর্টটা? গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, নিশ্চয়ই বাড়িতেই রেখে গেছেন। সামনে থেকে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল সে।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করতেই কিচেনের একটা জানালা খোলা গেল।

ক্যাপটেনের কিছু বলার থাকবে না, কারণ মিথ্যে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়েছেন তিনি। ফ্লু হয়েছে, হাহ্! খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল এয়ারম্যান।

পশ্চিম জার্মানীর এজেন্টে গিজগিজ করছে এথেন্স এয়ারপোর্ট। তিনজনকে দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। হেরাক্লিয়নে ব্রিটিশ আর ইসরায়েলী, এখানে পশ্চিম জার্মানী—ওরে সর্বনাশ!

কারা পাঠিয়েছে ওদের? পিকেরিং?

না। পিকেরিং হলে কে.জি.বি. বা পূর্ব ইউরোপের এজেন্টদের পাঠাত। জেফ রিকার্ড? তাই হবে। জেফ রিকার্ড আর রিচার্ড কনওয়ে যুক্তি করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—যেভাবে হোক মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো। মিত্র সবগুলো দেশের ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নাও!

রানা ভাবল, কতক্ষণ ওদের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারবে সে? যেন মনে হচ্ছে গোটা দুনিয়াই ওর বিরুদ্ধে চলে গেছে।

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এল ও। কেউ ওর পথ আটকাল না। কেউ পিছু নেয়নি। ইউনিফর্মটা সত্যিই কাজের। রাস্তার মুখে এসে ট্যাক্সি নিল ও। ড্রাইভারকে বলল, 'ওমোনিয়া স্কয়ার।'

চৌরাস্তায় পৌঁছে ট্যাক্সি নিল রানা, বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে এগোল। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না, শুধু একই রাস্তা দু'বার পেরোল, সার সার দোকানের কাঁচ মোড়া শো-কেসে চোখ রেখে দেখে নিল কেউ ওর পিছু নেয়নি। আধ মাইল হেঁটে পৌঁছে গেল জেনোফোন গ্যালারিতে। মৃদু ঠেলা দিয়ে দরজা খোলার সময় ভেতরে কোথাও সুমধুর বেল বেজে উঠল।

ওকে ঢুকতে দেখে সামনে এগিয়ে এল রোগা-পাতলা এক মহিলা। কপালের ওপর চুলে পাক ধরেছে, চেহারায় অদ্ভুত এক আলিস্যির ভাব, যেন বাস্তব দুনিয়ার প্রতি তার কোন আগ্রহ বা মনোযোগ নেই। আসলে ঠিক উল্টোটা সত্যি, সমস্ত ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর আর মনোযোগ না থাকলে সি.আই.এ. এখানে তাকে দায়িত্ব দিত না। তার গলার সাথে চেইনে একজোড়া চশমা ঝুলছে। শিল্পীসুলভ সাদামাঠা কাপড় পরে আছে, ম্লান মুখ দেখে মনে হয় কত দিন যেন ভাল করে খাওয়াদাওয়া করেনি। রানা জানে, মহিলা সম্পর্কে বলা হয়, পিকাসোর পর আধুনিক আর্ট সম্পর্কে তার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে কিনা সন্দেহ।

'মে আই হেলপ ইউ?' জোর করে হাসল মহিলা, নির্লিপ্ত সুরে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি কেলীর সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'কেলী।' নামটা উচ্চারণ করে রানার আপাদমস্তক দেখল মহিলা। 'আসুন আমার সাথে, প্লীজ।'

কেলী হেওয়ার্থ গ্যালারির বুককীপার, বসে পিছনের একটা অফিসে। তার গোপন দায়িত্বটা হলো, সি.আই.এ. এথেন্স স্টেশনের আইডেনটিফিকেশন ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করা। কেলীর অনুমতি ছাড়া একটা চামচিকেরও সাধ্য নেই নিচের তলায় নামে।

পেশার খাতিরেই সি.আই.এ. এথেন্স স্টেশনে কে কোথায় কি কাজ করে খোঁজ-খবর রাখতে হয় রানাকে। যেমন ওই পেশার খাতিরেই সারা দুনিয়ায় এমন কিছু লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে রানা যারা হুবহু না হলেও, প্রায় ওর মতই দেখতে। প্রায় সমান লম্বা, চুলের রঙ এক, নাক-চোখ মেলে, চোখের রঙ মেলে, শারীরিক গড়নে তেমন গুরুতর কোন পার্থক্য নেই—এ-ধরনের বন্ধুদের মধ্যে ডেভিড কপারও ছিল একজন। রানা জানে, কেলী হেওয়ার্থ কপারকে চেনে, কিন্তু ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আছে কিনা ওর জানা নেই। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে চেহারা বদল করেছে ও, আয়নায় নিজেকে ডেভিড কপার বলেই মনে হয়েছে, কিন্তু কপারের ঘনিষ্ঠ কোন বান্ধবীর চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

'ডেভিড! এখানে তুমি কি করছ?'

প্রথম দর্শনে উত্তীর্ণ হলো রানা। মেটাল র‍্যাকে গারমেন্ট ব্যাগটা রাখল ও, এটায় অফিস স্টাফরা কোট রাখে। তারপর হ্যাট খুলে র‍্যাকের মাথায় রাখল। 'পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হ্যালো বলতে এলাম।'

'এ্যাদ্দিন পর! যাক, একেবারে যে ভুলে যাওনি সেটাই আমার ভাগ্য!' পরমুহূর্তে কেলীর চেহারায় কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। চেহারা থেকে ভাবটুকু দ্রুত মুছে ফেলে হাসল সে। 'দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে! এয়ারফোর্সে আছ কেমন?'

'আকাশে আকাশে থাকি, মাটির মানুষদের সাথে ঠিক মত যোগাযোগ রাখতে পারি না,' বলল রানা, ডেভিড কপার সম্ভবত ঠিক এ-ভাষাতেই কথা বলত। কিন্তু কেলী সুন্দরী মেয়ে, কাজেই তাকে খুশি করতে হয়। 'তবে তোমার কথা আমার সব সময় মনে থাকে। বিশ্বাস করো, তোমার নাকের পাশে ওই যে তিলটা, আমার বন্ধুরা সবাই ওটার কথা জানে।'

খুশি হলো কেলী, প্রশংসা শুনলে কোন্ মেয়েই বা না হয়!

কিন্তু কেলী শুধু সুন্দরী নয়, বুদ্ধিমতীও। হাসল বটে, হঠাৎ হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করতেও ছাড়ল না, 'তোমাকে কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। কেন বলো তো?' তার ভুরু কুঁচকে উঠল। তারপর আবার হাসল সে। 'পেয়েছি! তোমার চশমা!'

'ভাবছিলাম কখন তুমি লক্ষ করবে।'

'স্মার্ট ডেভিড কপার, একচুল বদলাওনি,' কটাক্ষ হানল কেলী। 'ইউনিফর্মের ওপর একটা কাপড় চাপা দাও, ইউরিপিডিস হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

কেলীর ডেস্কের এক কোণে বসল রানা। 'ইউরিপিডিস কি চশমা পরত?'

শ্রাগ করল কেলী। 'নিশ্চয়ই পরত। কুপি জ্বেলে এত লেখা লিখল কিভাবে? এথেন্সে দিন কয়েক থাকছ তো, না-কি?'

'নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

একটা ভুরু উঁচু হলো কেলীর।

'নির্ভর করছে ক'টা লাল ফিতে তুমি খুলতে পারো তার ওপর। তুমি হয়তো শুনেছ, আমাকে এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সে কেরামতি দেখাবার সুযোগ দেয়া হয়েছে?'

'না, শুনিনি; তবে আশ্চর্য হচ্ছি না। তোমার অভিজ্ঞতা ওরা কাজে লাগাতে চাইতেই পারে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা প্রায়োরিটি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে আমাকে।' গলা খাদে নামাল ও, 'টপ সিক্রেট। কনফিডেনশিয়াল।'

কথা না বলে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কেলী।

'টিউলিপ কনওয়ে,' আবার ফিসফিস করে বলল রানা।

কেলীর চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে অস্থির হয়ে উঠল! 'ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার, তাই না?'

'ভয়ঙ্কর কি বলছ,' কেলীর দিকে ঝুঁকে গলা আরও খানিক

খাদে নামাল রানা, 'বলো, ডিনামাইট! গত পাঁচ বছরে এরকম সঙ্কটে পড়িনি আমরা। ওকে যদি আমরা তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে না পারি–' কথা শেষ না করে হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করল রানা।

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল কেলী। 'পিকেরিং এথেন্সে এসেছে জানার পরই আমি বুঝতে পারি, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। তোমার সাথে দেখা হয়েছে?'

মাথা কাত করল রানা। 'হেরাক্লিয়নে। শোনো বলি, আমাকে একটা ফাইল দেখতে হবে। যদি বাধ্য হই, চ্যানেল ধরেই এগোব আমি। তবে আশা করছি তুমি আমাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চাইবে না।'

'কি ফাইল?'

'বলো কার।'

'কার?'

'পল রিজওয়ে।'

'নিশ্চই,' বলল কেলী। 'তার ফাইল তো এমন কি ক্লাসিফায়েডও নয়।'

রানা তা জানে, সেজন্যেই পল রিজওয়ের নামটা বলেছে ও।

'আর তাছাড়া,' আবার বলল কেলী, 'কোন্ সাহসে তোমাকে আমি না বলি? ভাল করেই জানি, ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে ডিনামাইট দিয়ে গোটা বিল্ডিংটা উড়িয়ে দিতে পারো তুমি।'

'তা পারি,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'যদি দিই, তোমার তখন ডিউটি থাকবে না।'

হেসে ফেলল কেলী। 'পটাতে শিখেছ ভালই। চলো, দেখিয়ে দিয়ে আসি।'

কপালের হ্যাটটা র‍্যাকের মাথা থেকে তুলে নিল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার এই উপকার আমার মনে থাকবে।'

গারমেন্ট ব্যাগটাও হাতে নিল ও। 'আশা করা যায়, প্রেসিডেন্টও ভুলে যাবেন না।'

আরও কিছু কাজ সারল রানা। দু'ঘণ্টা পর ডেভিড কপারের নাম লিখে হোটেল অ্যামব্যাসাডরে কামরা ভাড়া করল। এক রাতের টাকা অগ্রিম দিল।

অ্যামব্যাসাডর পরিষ্কার হোটেল, সার্ভিস চার্জও বেশি নয়। একা যতক্ষণ থাকবে, আশা করা যায় নিরাপদেই থাকবে টিউলিপ। আরেকটা সুবিধে হলো, হোটেলটার পিছন দিকে দরজা আছে, চুপিচুপি আসা-যাওয়া করতে পারবে রানা।

গারমেন্ট ব্যাগ থেকে বের করে বিছানায় শোয়াল টিউলিপকে। ভাঁজ খুলে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল চাদরে। নিজের স্বার্থেই টিউলিপকে এখন হারিয়ে ফেলা চলবে না রানার। একমাত্র টিউলিপই ওর বেঁচে থাকার গ্যারাণ্টি। কিন্তু আরেক অর্থে, টিউলিপ একটা বোঝাও বটে। তার চেহারা বদলানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রতি পদে ওকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে সে, মন্থর করে দিচ্ছে গতি। সাথে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ধরা পড়ার ভয়। সাথে না থাকলে অনায়াসে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে রানা। টিউলিপকে নিয়ে তা সম্ভব নয়।

মেঝেতে পায়চারি শুরু করল রানা। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। নিঃসঙ্গ, অসহায় হয়ে পড়েছে ও। বি.সি.আই. বা রানা এজেন্সির সাহায্য নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ জেফ রিকার্ড সব ক'জন এজেন্টের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে।

জীবনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল অ্যাসাইনমেন্টটা। কেঁচে গেছে। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার সাথে সাথে অ্যাসাইনমেন্টের ধরনটা বদলে গেছে সম্পূর্ণ। দু'ভাগ হয়ে গেছে শত্রুপক্ষ, দু'পক্ষই খুঁজছে ওকে। বাস্তব পরিস্থিতি হলো, গোটা

এসপিওনাজ জগৎটাকেই ওর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিজেকে রানা স্মরণ করিয়ে দিল, কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না।

পিকেরিঙের কথা ভাবল ও। কে.জি.বি. তো তাকে সাহায্য করছেই, সি.আই.এ-রও একটা অংশ তার অনুগত। টিউলিপ যতক্ষণ রানার কাছে থাকবে, পিকেরিং ওকে বাঁচতে দেবে না।

আরও বড় হুমকি জেফ রিকার্ড। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। রানাকে দেখামাত্র খুন করার নির্দেশ দিতে পারেন। জীবিত ধরা পড়লে বিচারের ব্যবস্থা করবেন।

কপালে কি আছে কে জানে! ইলেকট্রিক চেয়ার? নাকি যাবজ্জীবন? কারাগারে বেঁচে থাকার চেয়ে মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকতেই পছন্দ করবে ও।

নিজের জন্যে কোন্‌টা ভাল জানে রানা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে টিউলিপকে তুলে দিয়ে গায়েব হয়ে যাওয়া। অন্য আর সব কিছু বোকামি।

কিন্তু বাধা রয়েছে দুটো। কারও ওপর বিশ্বাস নেই ওর, কাজেই টিউলিপকে কারও হাতে তুলে দেয়া যায় না। আরেকটা বাধা হলো গর্ব। পেশাগত একটা গর্ব। সবারই থাকে। ওর বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, এক হাত না দেখিয়ে ছাড়বে না ও। পিকেরিংকে পরাজিত হতে দেখতে চায়। শেষ করতে চায় কাজটা। শেষ করতে চায় ন্যায্য ভাবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ে পিকেরিং অনেক বেশি শক্তিশালী, তাদের হাতে টিউলিপকে ছেড়ে দেয়া মানেই তাকে পিকেরিঙের হাতে তুলে দেয়া।

আরও একটা ব্যাপার রানার পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। টিউলিপের প্রতি দায়িত্ব। নিষ্পাপ মেয়েটা তো কোন দোষ করেনি। প্রেসিডেন্টের মেয়ে বলে নয়, টিউলিপ কোন মেথরের মেয়ে হলেও তার প্রতি এই দায়িত্ব পালন করত রানা। কোন

অবস্থাতেই তাকে পিকেরিঙের হাতে তুলে দিত না।

হ্যাঁ, বদলে গেছে অ্যাসাইনমেন্ট। এটা আরও কঠিন। শত্রুর কাছ থেকে পালানো চলবে না, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সরাসরি হোয়াইট হাউসে ঢুকতে হবে ওকে।

রানার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। বেশি সাহস দেখানো হয়ে যাবে? স্বেচ্ছায়, বোকার মত, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে ও?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা। প্রকাণ্ড ঝুঁকি, তা ঠিক। কিন্তু পুরস্কারও তো বিরাট। পিকেরিংকে পরাজিত করতে পারলে একটা অন্যায়ের অবসান ঘটবে। টিউলিপকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিতে পারলে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সাফল্য এলে উল্লাসের সাথে আসবে আত্মতৃপ্তি।

বাধা আর বিঘ্ন যাই থাক, টিউলিপকে বাড়ি নিয়ে যাবে রানা।

তারপর হেঁটে বেরিয়ে আসবে।

তারপর মাসুদ রানার কোন অস্তিত্ব না থাকে নাই থাকবে। মাসুদ রানা না থাকলে কাকে শাস্তি দেবে মার্কিন প্রশাসন? কাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবে? কিংবা কার স্বাধীনতা কেড়ে নেবে?

হাওয়া হয়ে যাবে সে বেমালুম।

আট

লাইনের সবাই মেয়েটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। গ্রীক মেয়েরা সুন্দরী এবং লম্বা-চওড়া হয় বটে, কিন্তু দুটোর এমন মহামিলন সহজে চোখে পড়ে না। শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরাও তাকিয়ে থাকল–তবে সম্ভবত মেয়েরাই শুধু ঈর্ষা বোধ করল।

প্যান অ্যামের টিকেট এজেন্ট তো মেয়েটাকে দেখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। দশ সেকেণ্ড হাঁ করে থাকল সে, আশপাশে মশা-মাছি থাকলে নির্ঘাত দু'একটা ঢুকে পড়ত। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে গদ গদ ভঙ্গিতে বলল, 'ইয়েস, ম্যাডাম?' ঘন ঘন হাত কচলাল সে। 'বলুন আপনার কি খেদমতে লাগতে পারি?'

মেয়েটা তার পার্স যত্ন করে রাখল কাউণ্টারের কিনারায়, দস্তানা পরা হাত দুটো ভাঁজ করল বুকের কাছে, মাথা একদিকে একটু কাত করে মিষ্টি হেসে তাকাল লোকটার দিকে। সে জানে সে সুন্দরী। পরনে হাতে সেলাই করা এক রাঙা স্যুট—শরীরের যে গড়ন তাতে খোলামেলা থাকার বা সূç পোশাক পরার কুমতি না থাকারই কথা। কণ্ঠস্বর গভীর, তবে কোমল এবং সুরেলা।

ভাষাটা, বলাই বাহুল্য, গ্রীক।

'ইণ্টারন্যাশনাল প্লেসমেণ্ট সোসাইটির সেক্রেটারি আমি,' বলল মেয়েটা। 'সোফিয়া ডালিক্লিয়স। এতিম একটা শিশুকে লণ্ডনে পাঠাতে চাই।'

দ্রুত মাথা কাত করল টিকেট এজেণ্ট, 'শিশুটি কি একা যাবে, ম্যাডাম?'

মেয়েটা হাসল। দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝকে। 'হ্যাঁ। ওর্কশায়ারে এক পরিবার তার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এই মুহূর্তে এমন কেউ নেই যাকে ওর সাথে পাঠানো যায়। তবে হিথ্রো এয়ারপোর্টে আমাদের প্রতিনিধি থাকবে, সে-ই ওর দায়িত্ব নেবে।'

একটা ফর্ম বের করল লোকটা। 'শিশুর বয়স, ম্যাডাম?'

'চার।'

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। ইতস্তত করতে লাগল সে, 'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, ম্যাডাম, ফ্লাইটের শেষ মাথায় আমরা ওর দায়িত্ব নিতে পারব না।'

'হ্যাঁ, জানি—বললামই তো, ওখানে আমাদের লোক থাকবে।'

আবার মাথা কাত করল লোকটা। 'কবে তাকে পাঠাতে চান আপনি, ম্যাডাম?'

'যদি সম্ভব হয় কালই।'

কাউণ্টারে রাখা কমপিউটর সেটটা চেক করল এজেণ্ট। তারপর মুখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকাল। 'কাল সকাল দশটায় একটা ফ্লাইট আছে, সীটও আছে মাত্র একটা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মিষ্টি হাসল মেয়েটা। পার্স তুলে নগদ টাকা বের করল সে। টিকেটের দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। উপস্থিত সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার চলে যাওয়া।

এথেন্স বন্দর, পিরিয়াস। ওশেনিয়া লাইনস-এর যাত্রীবাহী জাহাজগুলো শুধু বসফরাস নয়, দ্বীপগুলোতেও নিয়মিত আসা-যাওয়া করে।

টিকেট এজেণ্ট সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যতটুকু পারি আপনার জন্যে করব আমরা, ম্যাডাম সসেলা। বলুন তো, ক'টা রিজার্ভেশন দরকার আপনার?'

'সাতাশ জন মানুষ, আর ষোলোটা জানোয়ার,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটা।

ঝট্ করে মুখ তুলল লোকটা, বিস্মিত হয়েছে। 'জানোয়ার?'

'আমরা সার্কাস পার্টি, মিস্টার,' মেয়েটা সগর্বে জবাব দিল।

'ও, আচ্ছা, বুঝলাম···।'

দস্তানা পরা একটা হাত তুলে আশ্বস্ত করল মেয়েটা। 'হিংস্রগুলো খাঁচায় থাকবে, বুঝতেই পারছেন। বাকি সব ক'টা পোষ মানানো। স্বভাবতই আমরা চাইব কার্গো হিসেবে দেখা হবে ওগুলোকে। আর হ্যাঁ, সাথে ট্রেনার থাকছে। আপনাদের চিন্তার

কোন কারণই নেই··· ।'

'ভেরি গুড ।' লোকটা খুঁটিয়ে দেখল–সার্কাসের মেয়ে, তাই তো বলি! এরকম সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে থাকায় সার্কাসের মালিক নিশ্চয়ই দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে । সন্দেহ নেই, মোটা টাকা অ্যাডভান্স পেয়ে ইস্তাঁলে যাচ্ছে পার্টি । জিজ্ঞেস করল, 'কোয়ারানটাইন পেপারস ঠিকঠাক আছে তো, ম্যাডাম?'

'দু'মাস আগে সুইজারল্যাণ্ড ছাড়ার পর আটটা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়েছি আমরা,' বলল মেয়েটা । 'কোয়ারানটাইন পেপারস ঠিক থাকবে না মানে?'

'কবে আপনারা যেতে চান?'

'যদি সম্ভব হয় কালই ।'

'কাল? সাতাশজন লোক, ষোলোটা জানোয়ার, আর আপনি কিনা বলছেন কালই যেতে চান?'

ভুবনভোলানো হাসি দেখা গেল মেয়েটার কমলাকোয়া ঠোঁটে । 'শিডিউল, মিস্টার, শিডিউল । দিন তারিখ ঠিক রাখতে পারি বলেই আমাদের পার্টির এত সুনাম ।'

সুন্দর অবয়বের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা । 'ঠি-ই-ক আ-ছে । দেখি কি করা যায় ।' খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল সে । 'আরও একটা ব্যাপার । চেক বা অন্য কিছু নেব না কিন্তু আমরা । ভাড়া আপনাকে নগদ মেটাতে হবে ।'

'আমি তৈরি হয়েই এসেছি,' বলে পার্সটা চওড়া কোলের ওপর থেকে তুলে খুলল মেয়েটা । 'হিসেব করে বলুন, কত দিতে হবে । সবার জন্যেই ডেক প্যাসেজ বুক করব আমি, শুধু একজনের জন্যে একটা কেবিন দরকার হবে । বড় কেবিন, মানে ডাবল । দু'জন ধরা যায় না, তবু দু'জনের জন্যে বড় একটা কেবিনই দরকার । একটা বাচ্চা আর তার বাবা ।'

ছোটখাট একটা চার্টার এয়ারলাইন । নাম, গ্লাইফাদা । ডেস্কের পিছনে বসা প্রৌঢ় মহিলা মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেই নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে পড়ল । নিঃশ্বাস আটকে গেছে তার । কোন মেয়ে এত সুন্দরীও হয়! 'ইয়েস, ম্যাডাম?'

নরম সুরে কথা বলল মেয়েটা । অভিজাত ঘরের সুন্দরী বউ, অথচ এতটুকু গর্ব বা দেমাক নেই । 'আমার ছেলে,' ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি নিয়ে বলল সে । 'দেখুন না কি ভাগ্য, এখানে বেড়াতে এসে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছে । এখন মোটামুটি সুস্থ, হাসপাতাল থেকে ওরা বলে দিয়েছে বাড়ি ফিরতে পারবে । এখন দেখুন আপনারা আমাদের অর্লিয়ান্সে নিয়ে যেতে পারেন কিনা ।'

'কেন পারব না!' মিষ্টি হাসল প্রৌঢ়া । 'কবে যেতে চান আপনারা?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল মেয়েটা । 'যদি সম্ভব হয় কালই । আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না ।'

এথেন্সের সবগুলো এয়ারপোর্ট আর বন্দরে অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন চেক করছে গ্রীক ইন্টেলিজেন্স । শুধু এয়ারপোর্টেই বারোজন এজেন্টকে লাগানো হয়েছে, কমপিউটর লিস্ট পরীক্ষা করে দেখবে তারা, বয়স এবং বর্ণনা মেলে এমন কোন বাচ্চার জন্যে সীট রিজার্ভ করা হয়ে থাকলে তদন্ত চালাবে । একঘেয়ে, কঠিন কাজ–তালিকায় চোখ বুলাও আর টিক চিহ্ন দিয়ে বাতিল করো । শয়ে শয়ে নাম পড়া হলো, তদন্তও হলো কয়েকটা কেস, কিন্তু বর্ণনার সাথে কোন বাচ্চাকেই মেলানো গেল না ।

তবে একজন এজেন্টের ভাগ্য সুপ্রসন্ন । সে তার তালিকার পরবর্তী নামটা দেখল । বহুগুণ বেড়ে গেল আগ্রহ । স্তূপ করা ডুপ্লিকেট টিকেট ফর্মগুলো নিল সে, পেয়ে গেল রিজার্ভেশনের সাথে যেটা মেলে । দ্রুত হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল

সে। অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর দিল এক মহিলা কণ্ঠ, 'ইণ্টারন্যাশনাল প্লেসমেণ্ট সোসাইটি।'

'ম্যাডাম সোফিয়া ডালিক্লিয়স, প্লীজ।'

'দুঃখিত, তিনি এখানে নেই।'

'কবে ফিরবেন?'

'এক হ—ার আগে নয়।'

'এক হ—া···।'

'ম্যাডাম সোফিয়া দেশের বাইরে গেছেন, দশ দিনের ট্যুরে, তিন দিন আগে।'

এজেণ্ট লোকটা জরুরী ভঙ্গিতে কামরার আরেক দিকে বসা অফিসারের উদ্দেশে হাতছানি দিল। 'আপনি ঠিক জানেন তো?' ফোনে জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না মানে? আপনাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারে?'

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম, যথেষ্ট সাহায্য আপনি ইতিমধ্যেই করেছেন,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল এজেণ্ট।

ক্যাপটেন ডেভিড কপার প্রসঙ্গ জেভ রিকার্ডের কানে এল ডিফেন্স ইণ্টেলিজেন্সের মাধ্যমে।

ডিফেন্স ইণ্টেলিজেন্সকে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, অস্বাভাবিক কোথাও কিছু ঘটলে সাথে সাথে তা রিপোর্ট করতে হবে। ডেভিড কপার কিছুদিন আগে পর্যন্ত সি.আই.এ. অপারেটর ছিল, ড্রাগের সাহায্যে ঘুম পাড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে, ঘটনাটাকে স্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া ক্যাপটেনের পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, এবং অতিরিক্ত একটা ইউনিফর্মও খোয়া গেছে।

ইতোমধ্যে সি.আই.এ. কমপিউটর সেকশন থেকে রানার ফাইল পৌঁছে গেছে জেফ রিকার্ডের হাতে। সেটা খুলে নাড়াচাড়া

করতেই জানা গেল, মাসুদ রানার বন্ধুদের মধ্যে ডেভিড কপার একজন। ডিফেন্সের ইণ্টেলিজেন্সের রিপোর্ট পাবার সাথে সাথে প্রেসিডেণ্টের স্টাডিরূম থেকে এথেন্সে ফোন করলেন তিনি, গ্রীক ইণ্টেলিজেন্স চীফের সাথে কথা বলে বুঝলেন, ডি.আই. ঘটনাটা তাকে অনেক দেরি করে জানিয়েছে।

'ক্যাপটেন ডেভিড কপার এখনও এখানে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন,' গ্রীক চীফ বললেন। 'অথচ আজ সকালে তিনি এথেন্সের উদ্দেশে হেরাক্লিয়ন ত্যাগ করেছেন অলিম্পিক ফ্লাইটে।'

হতাশ হলেন জেফ রিকার্ড, সেই সাথে প্রভাবিতও হলেন। 'আপনি ঠিক জানেন, এ-ও সেই একই ডেভিড কপার?'

'যদি না আপনাদের একই নাম, একই পাসপোর্টে, একই চেহারায় দু'জন এয়ারফোর্স ক্যাপটেন থাকেন।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন জেফ রিকার্ড। রানা যে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কপারকে অনেক দিন থেকে চেনে রানা, তার চেহারা নেয়া কঠিন কিছু নয়, বিশেষ করে রানার ডোশিয়েতে বলা হয়েছে ছদ্মবেশে পটু সে। তাছাড়া, এ-ধরনের কৌশল অবল'ন করা রানার একটা বৈশিষ্ট্যও বটে। অপরপক্ষকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এথেন্সে রানার গন্ধ খুঁজে বের করা সম্ভব বলে মনে করেন?'

গ্রীক ইণ্টেলিজেন্স চীফ নির্ভেজাল আত্মতৃ—ির হাসি হাসলেন। 'আপনি যা আশা করছেন, আমরা তার চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে আছি, মি. রিকার্ড।'

'আচ্ছা,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন সি.আই.এ. চীফ। 'কি রকম?'

'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে, আপনার মাসুদ রানা গ্রীস ছাড়ার চেষ্টা করছেন। কিভাবে তাঁকে আটকাতে হবে আমরা জানি।'

বাকশক্তি হারিয়ে জেফ রিকার্ড অপেক্ষা করছেন।

'তিনজন মেয়ে,' গ্রীক চীফ বললেন। 'তিনটে নাম এবং জাতীয়তা, কিন্তু চেহারার বর্ণনা হুবহু এক।'

বাকিটুকুও নিঃশব্দে শুনে গেলেন জেফ রিকার্ড। তিনটে মেয়ে, প্রত্যেকে একটা বাচ্চাকে সাথে নিয়ে বা সাথে না নিয়ে এথেন্স ত্যাগ করতে চায়। গ্রীক, সুইস, আর ফ্রেঞ্চ। তিনজনই ভুয়া। ম্যাডাম সোফিয়া দেশের বাইরে। ম্যাডাম সসেলার সার্কাস পার্টি ন'মাসের জন্যে তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছে। আর অ্যাটিক পেনিনসুলার কোন হাসপাতালে চার বছর বয়সের কোন বাচ্চাকে ভর্তিই করা হয়নি। তারমানে ম্যাডাম অলিভাও মিথ্যে কথা বলেছে।

তিনটে মেয়ে, চোখে ধুলো দেয়ার তিনটে প্রয়াস।

শুধু কি এই তিনটেই? জেফ রিকার্ড ভাবলেন। নাকি আরও আছে?

পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগে আক্রান্ত হলেন তিনি। রাগ হলো, আবার মুগ্ধও হলেন, সবচেয়ে বেশি অসহায় বোধ করলেন। শুনতেই রানার মত লাগছে। প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, রানাই। কিন্তু জেফ রিকার্ড জানেন, মেয়ে তিনটেকে ধরা যাবে না, গেলেও তারা কেউ রানা হবে না–না এথেন্সে, না লণ্ডনে, বা পিরিয়াসে, গ্লাইফাদায়, বা অর্লিয়ান্সে।

একটাই কারণ–তিনটে মেয়েকেই পানির মত সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, রানাও সেটা জানে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন জেফ রিকার্ড। রানাকে নিয়ে ভাবছেন। ডাইভারশন তৈরি করা রানার স্টাইল। যুক্তিগ্রাহ্য পথে যাওয়াটা নয়। সহজেই ট্রেস করা যায় এ-ধরনের তিনটে ডাইভারশন কেন সে তৈরি করতে গেল? নিশ্চয়ই পালাবার অন্য কোন পথ ঠিক করে রেখেছে সে,

ডাইভারশনগুলোর একটাও তার ব্যবহার করার দরকার পড়বে না।

জেফ রিকার্ড একজন প্রফেশনাল, রানার ফাইল মুখস্থ করে ফেলেছেন তিনি। রানার অতীত অ্যাসাইনমেন্টগুলো সম্পর্কে জানেন। জানেন রানা কি ধরনের টেকনিক ব্যবহার করে। তার মন-মানসিকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা জন্মেছে। সবশেষে তিনি একটা উপসংহারে পৌঁছুলেন–আমেরিকার সাথে রানা বেঈমানী করবে না। অন্তত এই অ্যাসাইনমেন্টে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করবে না সে।

কিন্তু তবু এ-কথা সত্যি যে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে রানা। সম্ভবত খুনও করেছে দু'একটা। তবে এ-ও ঠিক যে পিকেরিং যে বিশ্বাসঘাতক তা তার জানার কথা নয়। রানা জানত পিকেরিং সি.আই.এ-র পক্ষ নিয়েই কাজ করছে।

নাকি জানত না?

নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। কপালে রেখা ফুটল। নসোসে পিকেরিঙের সাথে ছিল রানা। সম্ভবত প্ল্যান করে পরস্পরের সাথে দেখা করতে যায় ওরা। প্রথম পুলিসকে খুন করার সময় পিকেরিং রানার নাম ধরে জোরে একবার চিৎকার করে উঠেছিল। রাগে? সে হয়তো ভেবেছিল পুলিস লোকটা রানা। তবে কি রানাকেই সে খুন করতে চেয়েছিল?

রানা কি ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়? পিকেরিঙের দল ত্যাগ করে সে? নসোসেই ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

ধারণাটা দৃঢ় হতে শুরু করল জেফ রিকার্ডের মনে, সেই সাথে তাঁর মুখে হাসি দেখা গেল। নিঃসঙ্গ রানা, বি.সি.আই. কিংবা নিজস্ব এজেন্সির সাহায্য চাইতে পারছে না, কারণ জানে জেফ রিকার্ডের লোকজন হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। যা যুক্তিগ্রাহ্য, এই একবার অন্তত, তা করতে পারে রানা। আর তো কোন পথ

খোলা নেই তার সামনে। তিনটে মেয়েরই একটা করে চার বছরের বাচ্চা আছে। রানা যদি পিকেরিংকে ত্যাগ করে থাকে, তাহলে টিউলিপ নিশ্চয়ই রানার কাছেই আছে।

এটা নিঃসন্দেহে একটা সুসংবাদ, কারণ প্রাণ থাকতে টিউলিপের কোন ক্ষতি হতে দেবে না রানা।

সময়ের সাথে সাথে গোটা ব্যাপারটা জটিল থেকে জটিলতর রূপ নিচ্ছে। তাঁর আক্রোশ মেটাবার জন্যে পিকেরিংকে চাই, কিন্তু আরও বেশি দরকার রানাকে। কারণ রানার কাছে টিউলিপ রয়েছে। তবু সাবধান হবার প্রয়োজন আছে। এমন কিছু করা চলবে না যাতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে রানা। বিকল্প পথ না পেলে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে বাধ্য হবে সে, আর রানার ঝুঁকি নেয়া মানে টিউলিপের বিপদের মধ্যে পড়া।

তারপর আরেকটা চিন্তা মাথায় ঢুকল, নিভে গেল মুখের হাসি। রানা যদি পিকেরিংকে ত্যাগ করে থাকে, তাহলে পিকেরিং নিশ্চয়ই রানাকে গরু খোঁজা করছে–তার মতই। ব্যাপারটা তাহলে ধাওয়া নয়, প্রতিযোগিতা। গতিই এখন মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। শুধু যে রানাকে পেতে হবে তাই নয়, পেতে হবে পিকেরিঙের আগে।

অথচ লাখ লাখ মানুষের মধ্যে যে-কেউ রানা হতে পারে!

হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়লেন জেফ রিকার্ড। ক্লান্তি এবং ভয় তাঁকে গ্রাস করতে চাইল। এর শেষ কোথায়? কিভাবে শেষ হবে? শেষের পর অবশেষ, কি হবে তার চেহারা? পিকেরিঙের বিশ্বাসঘাতকতা আর কি কি সর্বনাশ ঘটাতে পারে? আর কতজন এজেন্টকে মারবে সে? তার সাথে আর কারা আছে? সি.আই.এ-র কোন্ লোকটা এখনও বিশ্বস্ত?

আর যাই হোক, রানা অন্তত সি.আই.এ. এজেন্ট নয়। এখন বোঝা যাচ্ছে, পিকেরিঙের লোকও নয় সে।

অল্লুত একটা অনুভূতি হলো জেফ রিকার্ডের। রানার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন তিনি।

কারণটাও তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। রানা বুদ্ধিমান, সে নীচ নয়, তার একটা কোমল হৃদয় আছে–সেজন্যেই এই কৃতজ্ঞতাবোধ। কৌশলজ্ঞানের কারণেই জেফ রিকার্ডের হাতে ধরা পড়বে না রানা, সেই একই কারণে পিকেরিং বা রাশিয়ানদের হাতেও ধরা পড়বে না সে।

কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। উপলব্ধি করলেন, রানার ওপর তিনি নির্ভর করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কেন? এখন কি করবে রানা? প্রশ্নের উত্তর ওই অল্লুত মানুষটার মতই অজ্ঞাত আর রহস্যময়।

তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে টিউলিপ রানার হাতে রয়েছে, ভাবলেন জেফ রিকার্ড। আর কেউ হলে এত সব বিরুদ্ধ শক্তির সামনে বারো ঘণ্টাও টিকতে পারত না।

যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে জেনোফন গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এল কেলী। বাসে চড়ে বাড়ি ফিরল সে, রোজই তাই ফেরে। পথে একটা মার্কেটে থামল, রুটি আর মাখন কিনল, সিগারেট কিনল এক প্যাকেট। কাউন্টারে বসা তরুণ ছেলেটির সাথে রসিকতা করল। আড়ষ্ট কোন ভাব নেই, মনটা প্রফুল্ল।

বাড়ি ফিরে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে গিয়েও ঢালল না, বদলে কফি তৈরি করল। ভাবল, নার্ভ ভোঁতা করার সময় নয় এটা। পিকেরিঙের সাথে কথা বলা দরকার।

কিন্তু যোগাযোগ করার উপায় নেই। পিকেরিং যোগাযোগ করবে এই অপেক্ষায় আছে সে।

অবশেষে টেলিফোন বাজল।

'হ্যালো?'

'ডিকসন আছে নাকি?'

কেলীর চেহারায় পরম স্বস্তি ফুটে উঠল। কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল সে, 'রঙ নাম্বার।'

'দুঃখিত।'

'নো ট্রাবল।'

অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো। ছোঁ দিয়ে পার্সটা তুলে নিয়ে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কেলী। দশ মিনিট পর একটা ফোন বুদের ভেতর দেখা গেল তাকে। বেল বাজতেই রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল।

হ্যাঁ, পিকেরিংই।

'বাঁচলাম!'

'কেন, কি হয়েছে?' পিকেরিং জিজ্ঞেস করল।

'ডেভিড কপারকে মনে আছে আপনার?'

'অবশ্যই। কেন?'

'আজ সে হঠাৎ গ্যালারিতে এসে গোলাপ কুঁড়ি সম্পর্কে কথা বলছিল।'

একেবারে থ হয়ে গেল পিকেরিং। 'বলো কি!'

'জ্বি হ্যাঁ,' বলল কেলী। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে। 'কি বলব, মানে, কেমন যেন লাগল। একবার মনে হলো লোকটা বোধহয় কপার নয়।'

অপরপ্রান্তে পিকেরিং কথা বলছে না।

'আমার ভুলও হতে পারে,' আবার বলল কেলী। 'দেখতে সে হুবহু কপারের মত, কথার ভঙ্গি, নড়াচড়া–সব কিছু তারই মত। কিন্তু সে চলে যাবার পর একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম।'

পিকেরিঙের নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। অপরপ্রান্তে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

'গোলাপ ফুলে অ্যালার্জি আছে কপারের,' বলল কেলী।

'আমার ডেস্কে অনেকগুলোই ছিল। অথচ তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।'

হিম কণ্ঠে পিকেরিং বলল, 'যা যা বলেছে সব রিপিট করো।'

চোখ বুজে কপারের অফিসে ঢোকার মুহূর্তটা স্মরণ করল কেলী। এক এক করে সব বলল সে, কিছুই বাদ দিল না। এয়ারফোর্স প্রসঙ্গ। চশমা আর ইউরিপিডিস। ইন্টেলিজেন্স কাজকর্ম, আর টিউলিপ। পল রিজওয়ে।

তার কথা শেষ হতে পিকেরিং একটা মাত্র প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে তার কোন আভাস পেয়েছ?'

'না,' বলল কেলী। 'তবে ভুয়া বলে যখন সন্দেহ হলো, কয়েক জায়গায় ফোন করে দেখলাম কিছু জানা যায় কিনা। এথেন্সের হোটেল অ্যামব্যাসাডরে ডেভিড কপার নামে এক লোক একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে।'

সময় দিতে রাজি হয়েছে মস্কো। বারোজন কে.জি.বি. এজেন্টের ওপর হেরাক্লিয়নের দায়িত্ব দিয়ে সারটভকে নিয়ে এথেন্সে ফিরে এসেছে পিকেরিং, শিডিউল-বিহীন একটা প্লেনে চড়ে। তার মন গাইছিল, রানাও এখানে আসবে–এথেন্স বড় শহর, সব সময় ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগে আছে, গা ঢাকা দেয়া যেমন সহজ, তেমনি প্রয়োজনে পালাবার রাস্তা আছে অনেকগুলো। প্রমাণ হয়ে গেল, ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে।

এথেন্সে নেমে সরাসরি কোলোনাকি স্কয়ারে চলে আসে পিকেরিং। এখানে একজন সোভিয়েত কূটনীতিকের বাড়ি আছে। সাময়িক ছুটি নিয়ে মস্কোয় গেছে সে, তার ফোনটা সম্পূর্ণ নিরাপদ–হতেই হবে, কারণ কূটনীতিক লোকটা আসলে লোকাল কে.জি.বি. রেসিডেন্ট।

ফোনটা পিকেরিং ব্যবহার করল সি.আই.এ-র ভেতর তার

নিজের লোকদের সাথে যোগাযোগ করার কাজে। দূতাবাসে আছে তিনজন, লোকাল স্টেশনে একজন। কেলীর সাথে যোগাযোগ করায় পয়সা উসুল হয়ে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সারটভের দিকে ফিরল সে। 'হোটেল অ্যামব্যাসাডরে উঠেছে রানা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সারটভ। ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে ছুটল। বিশ মিনিট পর রানার ঘরের সামনে দেখা গেল ওদেরকে। দরজার নিচ দিয়ে সরু এক ফালি আলো বেরিয়ে আসছে নির্জন করিডরে। মৃদু শব্দে একটা রেডিও বাজছে ভেতরে।

পিকেরিংকে পিস্তল বের করতে দেখে পিছিয়ে গেল সারটভ। দূরে সরে গিয়ে একটা কাঁধ নিচু করল সে, তারপর সবেগে ছুটে এসে দরজায় কাঁধ দিয়ে পড়ল। দড়াম করে খুলে গেল কবাট। এমন কি তালা পর্যন্ত দেয়া ছিল না।

না থাকারই কথা।

কুঁজো হয়ে পিস্তল ধরা হাতটা তুলল পিকেরিং। পরমুহূর্তে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল খালি কামরার দিকে। ডেভিড কপার কামরায় ছিল বটে, এখন শুধু তার ইউনিফর্মটা রয়েছে ক্লজিটে। ওটা ফেলে রেখে গেছে মাসুদ রানা। যাবার সময় সাথে করে নিয়ে গেছে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে।

শহর থেকে বেরুবার মুখে ফুটপাথের পাশে একটা মেইল বক্সের সামনে থামল রানা। বক্সের ভেতর একটা প্যাকেট রাখল ও। ভেতরে কপারের পাসপোর্ট আর মানিব্যাগ আছে, আর আছে নগদ পাঁচ হাজার ডলার। ছোট্ট একটা চিরকুটও আছে, কপার জানতে পারবে কোথায় পার্ক করা আছে তার সাদা ফিয়াট।

উপকারী বন্ধুর জন্যে এটুকু না করলে কেমন দেখায়, ভাবল

রানা।

নয়

মোলাঞ্জা রমিউলাসের সামনে চীনা মাটির প্রকাণ্ড একটা ধূমায়িত গামলা, পাশেই একটা রুপোর থালা। গামলাটা মশলাদার চর্বি আর মাংসে টইটু'র, থালায় ঘরে তৈরি রুটির পাহাড়। নিউ ইয়র্ক থেকে আসা লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকেই আবার মস্ত হাঁ করল সে, ভেতরে চালান হয়ে গেল কয়েক টুকরো লালচে মাংসের সাথে গোটা একটা রুটি। 'কলা'য়ান শিপমেন্টের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওগুলোর তো দারুণ চাহিদা হওয়ার কথা।'

'তা হওয়ার কথা,' লোকটা বলল। 'কিন্তু কিছু ডিস্ট্রিবিউটর তাদের মেক্সিকান মাল কলা'য়ান বলে চালাবার চেষ্টা করছে। কাজেই সমস্ত মালকেই সন্দেহের চোখে দেখছে সবাই। এই ঝামেলাটা না মেটা পর্যন্ত কেউ কিছু কিনবে না।'

'কোন্ ডিস্ট্রিবিউটর?'

'ইটালিয়ান।'

'হুঁ।' ছোট, চোঙ আকৃতির মাথাটা নাড়ল মোলাঞ্জা রমিউলাস। গ্লাস ভর্তি ওয়াইন এক চুমুকে শেষ করে আবার ভরে দেয়ার ইঙ্গিত করল।

'এখন আপনি যা ঠিক করেন, স্যার,' বলল লোকটা।

ছোটখাট রমিউলাস ভরা ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল। 'হ্যাঁ।' টেরেসের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল সে। তার এই বাড়ি, বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই উচিত, ডেলফি গ্রাম থেকে

অনেক ওপরে পারনাসাস পাহাড়ের ঢালে তৈরি করা হয়েছে। টেরেস থেকে নিচে তাকালে গ্রাম ছাড়িয়ে আরও বহুদূর দৃষ্টি চলে, অ্যাপোলোর মন্দির দেখা যায়, চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভৌতিক আর রোমাঞ্চকর মনে হয়। একটু দূরে ছোট কিন্তু আরও প্রশান্ত অ্যাথেন প্রোথেন মন্দির। তারপর, পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে থাকা সবুজ জলপাই ঝোপ। তারপর উপসাগর, উপসাগরের ওপারে প্যাট্রাস-এর আলো।

তার পিছনে চাঁদের আলো মাখা আকাশের গায়ে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে পাহাড়। এই চূড়া থেকেই তো অ্যাপোলো এক সময় পারসিয়ান সেনাবাহিনীকে পাথর ছুঁড়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। সেই একই চূড়ায় বসে অবৈধ ব্যবসার বিশাল জাল তৈরি করেছে মোলাঞ্জা রমিউলাস প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে।

মারিজুয়ানার খেতে মেক্সিকো সরকার যতদিন খুশি বিষ স্প্রে করুক, তার কিছু করার নেই ওখানে। ইটালিয়ানরা মেক্সিকোর বিষাক্ত মারিজুয়ানা কলম্বিয়ান বলে চালাবার চেষ্টা করছে করুক। সব রসাতলে যাচ্ছে এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। তার সঙ্গতি আছে, কাজেই উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার কি?

ছোট ছোট চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করল রমিউলাস। তারপর নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধির দিকে ফিরল। 'মাল সব গুদামজাত করো,' বলল সে। 'মউজুদ ভাল ব্যবসা। আগামী বছর এই মাল দ্বিগুণ দামে বিক্রি হবে।' একজন চাকর ভেতরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল সে।

'একজন ভিজিটর, স্যার। আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন।'

চোঙ আকৃতির মুখ বিকৃত হয়ে উঠল রমিউলাসের, যেন ভেংচাল। 'কারও সাথে আমি এখন দেখা করব না।'

'উনি একজন প্রিস্ট। সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে

আছেন।'

'প্রিস্ট হোক বা আর্চবিশপ হোক, বিদায় করো!'

কিন্তু চাকর নড়ল না। 'আপনাকে উনি বলতে বললেন, তাঁর নাম ফাদার মলিউস–আপনাকে নাকি পাঁচ বছর আগে চিনতেন।'

জমাট পাথর হয়ে গেল মোলাঞ্জা রমিউলাস। তার চেহারায় একাধারে রাগ এবং ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে। ধীরে ধীরে চোখ জোড়া ছোট হয়ে এল।

ফাদার মলিউস! মাই গড, ফাদার মলিউস? আবার কি চায় ওরা?

নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল রমিউলাস, নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চাকরের দিকে ফিরল রমিউলাস। ছোটখাট একটা দৈত্যই বলা যায় লোকটাকে, সাদা জ্যাকেটের তলায় হোলস্টারে রিভলভার আছে। তাকে কাছে ডেকে নিচু গলায় বলল রমিউলাস, 'ভালমানুষ ফাদারকে বোলো তিনি দয়া করে আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। যাও, তাঁকে সম্মানের সাথে নিয়ে এসো। কিন্তু তারপর কাছেপিঠেই থেকো।'

প্রজেক্ট মলিউস–সি.আই.এ-র সহজ একটা অপারেশন ছিল। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে, একজন লোককে প্যারাস্যুট যোগে নামানো। জায়গাটার নাম ক্যারেলিয়া পেনিনসুলা, ওখানে রাশিয়ানদের বেশ কয়েকটা টপ-সিক্রেট ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে।

লোকটাকে পাঠানো হবে, কিন্তু সে ধরা পড়লে সি.আই.এ-র সাথে তার সম্পর্ক আছে এটা প্রকাশ পাওয়া চলবে না–এই ছিল সমস্যা। সমাধানের দায়িত্ব চাপানো হয় মোলাঞ্জা রমিউলাসের ওপর। সে তার ব্যক্তিগত বিশাল বিমান বহর থেকে একটা বিমান ব্যবহার করতে দেয়। অবশ্যই স্বেচ্ছায় নয়।

তার বিরুদ্ধে প্রমাণ ছিল সি.আই.এ-র হাতে। মৌখিক প্রমাণ

নয়, সই করা কাগজ-পত্র, ফটো, ইত্যাদি। যা ফাঁস হয়ে গেলে বাকি জীবন জেলখানায় কাটাতে হত তাকে।

সেটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা। আর কখনও তার সাহায্য চাওয়া হবে না, ওদের এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিল সে। অথচ আবার ফিরে এসেছে।

কি মনে করে!

টেরেসে উদয় হলো ধর্মযাজক। লম্বা একহারা গড়ন, সারা মুখে কালো দাড়ি, পরনে গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্টের ঢিলেঢালা আলখাল্লা।

'ফাদার মলিউস।'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

'আবার আপনারা কি চান আমার কাছে?'

'সেই একই জিনিস, আগে যা চেয়েছিলাম। আপনার সহযোগিতা।'

গ্রীক ব্যবসায়ী একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল, তারপর নিজে আরেকটায় বসল। চেয়ারে হেলান দিয়ে ফাদারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। 'আবার ক্যারেলিয়া পেনিনসুলায়?'

'না,' বলল রানা। 'এবারকার টার্গেট নিউআর্ক।'

'নিউআর্ক?' বিমূঢ় দেখাল রমিউলাসকে। তারপর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে সশব্দে হেসে উঠল সে। 'আপনি ঠাট্টা করছেন! নিউআর্ক, নিউ জার্সি?'

'নিউআর্ক, নিউ জার্সি,' ওকে নিশ্চিত করল রানা।

'কিন্তু কেন?'

'কারণ যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার জন্যে নিউআর্ককেই নিয়মিত ব্যবহার করেন আপনি। কারণ ওখানে আপনার টাকা-খাওয়া প্রচুর অফিসার আছে যারা আপনার আসা-যাওয়া নিরাপদ করে তোলে।'

রমিউলাস হাসল। ভাবল, লোকটা বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে। 'তা ঠিক,' বলল সে। 'নিউআর্কে যাওয়ার নিজস্ব রাস্তা আমার আছে।'

'আর আপনার সাথে,' বলল রানা, 'আমার যাওয়ারও একটা উপায় হতে পারে।'

'আমার সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্লেনে আপনাকেও থাকতে হবে।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল রমিউলাস। 'না, অসম্ভব। প্লেনে আমি চড়ি না।'

'জানি,' বলল রানা। 'দুর্ঘটনায় আরেকটু হলে মারা যাচ্ছিলেন, ভয়টা এখনও কাটেনি। তিন বছর—হ্যাঁ।'

'কি তিন বছর?'

'তিন বছর আপনি প্লেনে চড়েননি।'

রমিউলাস তাকিয়ে থাকল। কিছুই কি সি.আই.এ-র অজানা থাকে না?

'আপনাকে আমি ভাল একটা ফি দিতে রাজি আছি,' বলল রানা।

রমিউলাস হাসল। 'টাকা দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত বদলাবেন?'

'টাকা নয়। একটা নাম?'

রমিউলাসের চোখ সরু হয়ে উঠল।

'আপনার বিরুদ্ধে ডকুমেন্টগুলো সি.আই.এ-র হাতে তুলে দিয়েছিল যে লোক,' বলল রানা। 'লোকটা আপনার প্রতিষ্ঠানেই ছিল—আজও আছে। তার নামটা আপনি জানতে চান না?'

রমিউলাস চোখ বুজল। গত পাঁচ বছর ধরে প্রশ্নটা কাঁটার মত বিঁধছে তার বুকে। কে সেই বেঈমান? চোখ খুলল সে। 'কে সে?'

'আপনি আমার সাথে নিউআর্কে যাবেন?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রমিউলাস। তারপর সে জিজ্ঞেস

করল, 'কবে আপনি রওনা হতে চান?'

'আজ রাতে।'

'আজ রাতে?'

'এখুনি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জেফ রিকার্ড, প্রেসিডেন্টের স্টাডিরুমে পায়চারি শুরু করলেন, আপনমনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করা গেছে, তার কাছ থেকে জানা গেছে এথেন্স এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ওমোনিয়া স্কয়ারে গিয়েছিল রানা।

ওমোনিয়া স্কয়ার? আরেকটু সামনেই তো সি.আই.এ. এথেন্স স্টেশন! ফোন করে মূল্যবান আরও কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ওখানেই গিয়েছিল রানা। আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে আসে সে।

তবে এবার রানা একটা ভুল করেছে।

একটা সূত্র ফেলে গেছে ও! উত্তরটা নিশ্চয়ই আর লেখা দেরাজে আছে, কোন সন্দেহ নেই। কিছু একটা দেখতে চেয়েছিল রানা, অবশ্যই রিজওয়ের ফাইলে নয়। রিজওয়ের ফাইলের সাথে আরও অনেক ফাইল আছে, প্রত্যেকের নামের প্রথম অক্ষর আর।

ওই একই ফাইল ল্যাংলির কমপিউটর টেপেও আছে। যা-ই রানা দেখতে চেয়ে থাকুক, সারারাত লেগে গেলেও, ঠিকই তিনি খুঁজে বের করবেন সেটা।

বের করতেই হবে। রানা একবার ভুল করেছে, দ্বিতীয়বার না-ও করতে পারে।

একটু মাথা ঘামাতেই পিকেরিং বুঝল, রিজওয়ের নয়, রানা আসলে রমিউলাসের ফাইল দেখে গেছে।

রিসিভার তুলে কেলীর নাম্বারে ডায়াল করল সে। বিশ মিনিট

পর অফিস থেকে কেলী তাকে ফোন করল। হ্যাঁ, রমিউলাসের ফাইল থেকে একটা পাতা চুরি গেছে। গ্রীক ইন্টেলিজেন্সে সি.আই.এ-র লোক আছে, তার সাথে এরই মধ্যে যোগাযোগ করে কেলী জেনেছে, রমিউলাসের একটা জেট উত্তর ডলফির এয়ার স্ট্রিপ থেকে একঘণ্টাও হয়নি টেক-অফ করেছে। রমিউলাস নিজে আছে প্লেনে, সাথে দু'জন বডিগার্ড, আর একজন গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্ট।

প্লেনের গন্তব্য–নিউআর্ক, নিউ জার্সি।

টিউলিপকে উদ্ধার না করে আমেরিকায় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, পিকেরিং জানে। মস্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। কিন্তু রানা রমিউলাসের প্লেনে রয়েছে, তারমানে নিশ্চয়ই রানার সাথে টিউলিপও আছে?

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পিকেরিং। এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। বড় একটা প্লেন দরকার তার, বড় আর শক্তিশালী। মাঝখানে রিফুয়েলিঙের দরকার হবে না, একটানে পৌঁছে যাবে নিউআর্ক, নিউ জার্সি।

রিসিভার তুলে আবার ডায়াল করল পিকেরিং, এবার অ্যারোফ্লটের নাম্বারে। নির্দিষ্ট একজনকে চাইল সে। আপন মনে হাসছে। গোটা ব্যাপারটার সাথে প্রজেক্ট মলিউসের প্রচুর মিল আছে, তবে এবারেরটা আরও বেশি কৌতুককর। এবার রমিউলাস মাসুদ রানাকে ডেলিভারি দেবে পিকেরিঙের হাতে।

দশ

একটানা মেঘের গর্জন কানে নিয়ে হেলিকপ্টার থেকে নামলেন জেফ রিকার্ড। সিঁড়ির মাঝখানে রয়েছেন, বিদ্যুৎ চমকে উঠল, কড়কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কাছে কোথাও। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় তিনি দেখলেন, টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে পার্ক করা রয়েছে আর্মি ট্রাকগুলো।

আকাশের দিকে মুখ তুললেন তিনি। ঝড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। ভাবলেন, কি ধরে নেবেন, প্রকৃতিও কি মাসুদ রানাকে সাহায্য করতে চাইছে?

নিউআর্কে নিজেই চলে এসেছেন জেফ রিকার্ড। রানা যখন প্লেন থেকে নামবে, তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে চান। টিউলিপের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা দরকার তাঁর। অবশ্য প্লেনটা যদি আদৌ নামতে পারে এখানে।

টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। বাতাসে হেলান দিয়ে হেঁটে এল সে, টানা বাতাসের জন্যে রেনকোটের কিনারা এক করে বুকের কাছে ধরে আছে।

'মি. জেফ রিকার্ড?' ওদের পিছনে রানওয়ে ধরে লিফট-অফে ঢুকে যাচ্ছে একটা জাম্বো জেট, তাই চিৎকার করে কথা বলতে হলো তাকে। 'আমি এফ.এ.এ-র উইলি কিপার। জঘন্য আবহাওয়া, তাই না?'

করমর্দন করার সময় গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন জেফ

রিকার্ড। 'কি মনে হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'প্লেনটাকে কি অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে হবে?'

আকাশটা দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল উইলি কিপার। 'এখনই বলা মুশকিল। বিশ মিনিটের মধ্যে মেঘ কেটে যেতে পারে। আবার জোরাল মেঘ শুরু হলেও আশ্চর্য হব না। বোস্টনে এই মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে বাতাস। গাছের ডালপালা ছাড়া আর কিছুই নড়ছে না ওখানে।'

'এখানের আবহাওয়া সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?'

'বৃষ্টি। কিন্তু পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে আমাদের কোন ধারণা নেই। মেয়েমানুষ আর ঝড়, কার সাধ্য এদের মতিগতি বোঝে!'

উইলি কিপারকে পাশে নিয়ে হাঁটা ধরলেন জেফ রিকার্ড। টার্মিনাল ভবনের দিকে যাচ্ছেন। বোমা ফাটার আওয়াজের সাথে আবার আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। ক্ষণস্থায়ী আলোয় জেফ রিকার্ড দেখলেন, ক্যানভাস ঢাকা আর্মি ট্রাকের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে হেলমেট পরা মাথা। ফোর্ট ডিক্স থেকে দুশো ট্রুপ নিয়ে আসা হয়েছে, অ্যাকশনের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে তারা।

রানার সাথে যুদ্ধ করতে হবে সে-ধরনের কিছু ভাবছেন না তিনি। এয়ারপোর্টের দুর্বল জায়গাগুলোয় সশস্ত্র লোক দরকার তাঁর, তা না হলে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টে খুঁত থেকে যাবে, সেজন্যেই ওদেরকে আনা। তাছাড়া, দক্ষ মার্কসম্যানও দরকার হতে পারে।

'ইতিমধ্যে,' দরজার কাছে পৌঁছে বলল উইলি কিপার, 'ম্যানেজারের সাথে আপনার একটু সমস্যা হতে পারে। বললেন, আবহাওয়া নিয়ে এমনিতেই তিনি বিপদের মধ্যে আছেন। বোস্টনে ল্যাণ্ড করতে না পেরে এখানে ল্যাণ্ড করেছে বেশ

কয়েকটা প্লেন–জায়গা দেয়া যাচ্ছে না। আপনার সমস্যাটাকে তিনি উটকো ঝামেলা হিসেবে দেখছেন।'

'তার কোন উপায় নেই,' জেফ রিকার্ড বললেন। 'যা বলব করতে হবে। কোথায় সে?'

'আপনার জন্যে তাঁর অফিসে অপেক্ষা করছেন।'

মালাঞ্জার চাকর সাদা জ্যাকেটের বদলে কালো স্যুট পরেছে। প্লেনের স্টারবোর্ড সাইডের জানালার দিকে ঝুঁকে বাইরে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, আমেরিকান,' নিশ্চিতভাবে জেনে তারপর বলল সে। 'এফ-ফিফটিন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রমিউলাস। পাশে বসা লোকটার দিকে ফিরল সে। 'আমরা এখন কি করব?'

'প্রার্থনা করলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করে নিজের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্ট। 'আরে, এদিকেও দেখছি রয়েছে একটা!' শব্দ করে হেসে উঠল সে। 'এসকর্টস! মাসুদ রানাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে!'

চোখে শক্তিশালী বিনকিউলার তুলল পিকেরিং। পেভমেন্টের ওপর চোখ বুলাল সে, তারপর বিল্ডিঙের পিছন দিকে দাঁড়ানো ছয়টা ট্রাকের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি।

কয়েক সেকেণ্ড পর সারটভের দিকে ফিরল সে, আরেক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারটভ। বিশতলা বিল্ডিংটা নিউআর্ক এয়ারপোর্ট থেকে এক মাইল দূরে, এখান থেকে এয়ারফিল্ড আর টার্মিনাল ভবন পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ওরা এসেছে নিউ ইয়র্ক হয়ে, নিয়মিত অ্যারোফ্লট ফ্লাইটের ক্রু হিসেবে ছদ্মবেশ নিয়ে।

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল পিকেরিং। জেফ রিকার্ড ওদের আগেই

পৌঁছে গেছে। সাথে সেনাবাহিনীর একটা ব্যাটালিয়ন! 'সারটভ?'

জানালার দিকে পিছন ফিরল সারটভ। 'ওখানে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার,' বলল সে। 'রিকার্ডের প্ল্যানটা কি জানতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার চোখে বিনকিউলার তুলল পিকেরিং। 'ঠিক। সময় মত জানতে পারব। কিন্তু আপাতত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

জেফ রিকার্ড অফিস ঘরে ঢুকে দেখলেন জোনাথন টড গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন তাঁর চেয়ারে। তিনি দাঁড়ালেন না।

তাঁর বয়স চল্লিশের মত, চুলে পাক না ধরলেও হালকা হতে শুরু করছে, একজোড়া ওয়্যার-ফ্রেম চশমার ভেতর ঠাণ্ডা হিম সাপের চোখ অন্তর ভেদ করে যায়।

'মি. টড। আমি জেফ রিকার্ড।'

'আমি জানি আপনি কে,' জবাব দিলেন জোনাথন টড। ভারী, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। এয়ারপোর্টের জেনারেল ম্যানেজার না হয়ে রেডিওর ঘোষক হলেই গলাটা মানাত ভাল। আমেরিকার কোন কোন এয়ারপোর্ট আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন এটা একটা। এ ধরনের এয়ারপোর্টগুলো সরকার কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে, শেয়ার হোল্ডাররাই বা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে, তা নিয়ে মাঝে মধ্যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কোন এয়ারপোর্টে এককভাবে কোন ব্যক্তির সার্বিক কর্তৃত্ব থাকে না, কিন্তু নিউআর্ক এয়ারপোর্টে জোনাথন টড প্রায় একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে চলেছেন। তাঁর মত দায়িত্বসচেতন, কঠোর পরিশ্রমী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং বুদ্ধিমান একজন যে নিজগুণে বিস্তর ক্ষমতার অধিকারী হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি।

'তাহলে আপনি জানেন, আমি আপনার পূর্ণ সহযোগিতা পাব

বলে আশা করি,' জেফ রিকার্ড বললেন।

এক মুহূর্ত কোন উত্তর দিলেন না জোনাথন টড। সি.আই.এ. চীফের মুখের ওপর ঠাণ্ডা চোখ বুলিয়ে চেয়ার ছাড়লেন। 'এইটুকু জানি আমি,' বললেন তিনি। 'আমাকে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা সি.আই.এ. রাখে না। আমরা কেউ এখানে সি.আই.এ-র নির্দেশ মানতে বাধ্য নই। এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেয়ার সময় বা ইচ্ছে, কোনটাই নেই আমাদের। এখন আমাকে ওয়াশিংটনে একটা ফোন করতে হবে।'

'হ্যাঁ, করবেন বৈকি,' একটুও অবাক হননি জেফ রিকার্ড। 'তবে তার আগে হয়তো আপনাকে আমার জানানো উচিত যে এখানে আমি সি.আই.এ. ডিরেক্টর হিসেবে আসিনি। এসেছি ফেডারেল মার্শাল হিসেবে। এই এয়ারপোর্ট জাতীয়করণ করার আইনগত অনুমতিও সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। হ্যাঁ, ঠিকই ভাবছেন আপনি, ইমার্জেন্সী পাওয়ার অ্যাক্ট-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুমতিটা দেয়া হয়েছে আমাকে।' পকেটে হাত ভরে চিঠিটা বের করলেন তিনি। জোনাথন টডের মুঠোয় সেটা গুঁজে দিয়ে হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে।

'কি করছেন?' জিজ্ঞেস করলেন জোনাথন টড।

'সাহায্য,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'আপনাকে। ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলবেন না?'

জেফ রিকার্ড শুনতে পেলেন অপর প্রান্তে বেল বাজছে। তারপর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন। অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর হ্যালো বলল। সি.আই.এ. চীফ বললেন, 'আমি চাই তুমি এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সাথে কথা বলো।' রিসিভারটা এবার তিনি জোনাথন টডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'নিন, কথা বলুন। প্রেসিডেন্ট।'

□

ত্রিশ মিনিটের মধ্যে নিউআর্ক এয়ারপোর্টে প্লেন আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। টেক-অফ করার জন্যে তেরোটা প্লেন অপেক্ষা করছিল, এখন থেকে ওগুলো জেফ রিকার্ডের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে থাকবে। আরও আটটা মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল, এক এক করে সেগুলোকে নির্দেশ দেয়া হলো আশপাশের এয়ারপোর্টগুলোয় ল্যাণ্ড করো। টার্মিনাল লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কাউকে প্লেনে চড়তে দেয়া হলো না। শুধু তাই নয়, ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে সব লোকজনকে আরও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

বাইরেও সমস্ত তৎপরতা থেমে গেল। এয়ারফিল্ড ছেড়ে চলে যেতে বলা হলো পোর্টারদের। গ্রাউণ্ড কনট্রোলারস এবং মেইন্টেন্যান্স স্টাফদের যে-ক'জনকে দরকার তাদের রেখে বাকি সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়া হলো, তবে দরকারের সময় ডাকলেই তারা চলে আসবে। আর থাকল ফোর্ট ডিক্সের দুশো ট্রুপ।

অবজারভেশন ডেকের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন জেফ রিকার্ড, তুমুল বর্ষণে গোটা এয়ারফিল্ড ঝাপসা হয়ে আছে। এফ.এ.এ-র উইলি কিপার তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ঘাবড়াবেন না, স্যার,' বলল সে। 'ঝড়-বৃষ্টি যতই জোরাল হোক, তার মধ্যে আপনি যদি গাড়ি চালাতে পারেন, তাহলে পাইলট প্লেনও ল্যাণ্ড করাতে পারবে।'

'আমাকে হতাশ করলেন। এই অবস্থায় আমি গাড়ি চালাতে রাজি নই।'

উইলি কিপার হাসল। 'আবহাওয়া সমস্যা হতে যাচ্ছে কিনা এখুনি তা বলার উপায় নেই। হাতে কম করেও এখনও চল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে। আর তাছাড়া, বিকল্প ব্যবস্থা তো করাই আছে, তাই না?'

'হুম।' মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। এয়ারফোর্স এসকর্ট ব্যবহার করার বুদ্ধিটা তাঁরই। একটাই উদ্দেশ্য ছিল, রানা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে জেট প্লেনটা, পুবদিকে পাবে লম্বা সৈকত, বিপদ টের পেয়ে রানা যদি প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দেয়?

তা রানা দেয়নি, এবং এখন আর তা করা সম্ভব নয়। জেটের দু'পাশে এসকর্ট ঠিকই এতক্ষণে লক্ষ করেছে ও। দুদিকে আঠার মত লেগে আছে দুটো এফ-ফিফটিন।

এসকর্ট এখন আরেক কাজে লাগবে। আবহাওয়ার জন্যে প্লেনটাকে যদি অন্য কোন এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করতে হয়, এফ-ফিফটিন দুটোও থাকবে সাথে। আশপাশের শহরে, উপকূলে, বা সাগরে, যেখানে যত ফেডারেল এজেন্ট আর ট্রুপস আছে, সবাইকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। শুধু যোগাযোগের অপেক্ষা, সাথে সাথে রওনা হয়ে যাবে তারা। কোথাও কোন ফাঁক রাখা হয়নি। সব দিক থেকে কাভার দেয়া হয়েছে রানাকে। পালাবার তার কোন উপায় নেই। শুধু একটা কথা ভেবে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। রানার প্লেন যদি অন্য কোথাও ল্যাণ্ড করে, প্লেনের আগে সেখানে তাঁর পৌঁছানো সম্ভব নয়।

অথচ রানা প্লেন থেকে নেমে আসার সময় সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে চান।

মোলাঞ্জা রমিউলাস প্লেনের সামনের অংশে বসে আছে। পিছনের চেয়ে সামনেই কম লাগে ঝাঁকি আর আওয়াজ। তবুও বেশিরভাগ সময় চোখ বুজে আছে সে। প্লেনে ওঠার আগে ঘুমের বড়ি খেতে চেয়েছিল সে, কিন্তু রানা তাকে বারণ করেছে।

এমনিতে ভয় পায়, তার ওপর ঝড়ের মধ্যে পড়েছে প্লেন। সীটের হাতল ধরা হাতের আঙুল সাদা হয়ে গেছে তার। এই

মুহূর্তে পাশে বসা গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্টের চেয়ে সে-ই ঈশ্বরকে বেশি স্মরণ করছে। ঠোঁট জোড়া সারাক্ষণ নড়ছে তার, নিঃশব্দে।

মাঝে মধ্যে চোখ খুলছে রমিউলাস। বাঁ দিকে জানালা। চট্ করে একবার তাকিয়েই ফিরিয়ে নিচ্ছে চোখ। দৃষ্টি চলে না, কিছুই দেখার নেই। ঘন কালো মেঘ যেন গিলে ফেলেছে প্লেনটাকে।

আবার চোখ বুজে রানাকে অভিশাপ দিল সে, ব্যর্থ চেষ্টা করল নিজেকে শান্ত করার। তারপর তার মনে পড়ল উপহার হিসেবে রানার কাছ থেকে কি পাবে সে।

অমূল্য একটা তথ্য। তার প্রতিষ্ঠানে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। নামটা জানার জন্যে দরকার হলে আরও হাজার বার প্লেনে চড়তে রাজি আছে সে।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠতেই ছোঁ দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল পিকেরিং।

অপরপ্রান্তের লোকটা নিউআর্ক এয়ারপোর্টের গ্রাউণ্ড ক্রু, বিশ বছরের চাকরি তার। 'যা যা জানতে চেয়েছিলেন সব এখন বলতে পারব আমি।'

'শোনাও।'

'আবহাওয়া আরও খারাপ না হলে প্লেনটাকে ওরা নামাতে দেবে,' বলল গ্রাউণ্ড ক্রু। 'তারপর ওরা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে বেরিয়ে যাবে। সামনে থাকবে দুটো আর্মি ইউনিট, পিছনে থাকবে দুটো আর্মি ইউনিট। সোজা ফোর্ট ডিক্সে ফিরবে ওরা, ওখানে ওদের জন্যে এয়ারফোর্স ওয়ান অপেক্ষা করছে।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'পজিটিভলি। সিকিউরিটিতে আমার বন্ধু আছে, সরাসরি তার মুখ থেকে শুনেছি।'

'কি ধরনের গাড়ি?' জানতে চাইল পিকেরিং।

'গাড়িটাই সমস্যা হবে। ওটা একটা আর্মার্ড কার। ট্যাংকের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

পিকেরিঙের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, টিউলিপকে তারা এয়ারপোর্ট থেকে ছিনতাই করতে পারবে না। কাজটা সারতে হবে নিউ আর্ক আর ফোর্ট ডিক্সের মাঝখানে কোথাও। রাস্তার তলায় ডিনামাইট বসিয়ে আর্মি কারগুলোকে ধ্বংস করা কঠিন কোন কাজ নয়, দেখে মনে হবে আয়োজনটা রানাই আগে থেকে করে রেখেছিল। কিন্তু আর্মার্ড কার-কে থামাবার মত যথেষ্ট ডিনামাইট ব্যবহার করলে ভেতরে যারা থাকবে তারা সবাই মারা পড়বে।

মৃত টিউলিপকে কারও কোন দরকার নেই।

'আরোহীদের কোথায় থাকতে দেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল পিকেরিং।

'মেইন টার্মিনালে।'

'ওখানকার সিকিউরিটি?'

'নেই। তবে এয়ারফিল্ড আর গাড়িটার কাছে অনুমতি ছাড়া কেউ যেতে পারবে না।'

'গাড়ির কাছে তুমিও যেতে পারবে না?'

'তা হয়তো পারব। এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।'

'গুড,' বলল পিকেরিং। 'শোনো আমরা কি করব। আরোহী হিসেবে একজন লোককে পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে একটা প্যাকেট দেবে।'

'প্যাকেট?'

'একটা টাইম মেকানিজম,' পিকেরিং বলল। 'আর যথেষ্ট প্লাস্টিক। বিস্ফোরণে গাড়ির দরজাগুলো খুলে যাবে।'

রমিউলাসের পাইলট রেডিও খুলল। 'নিউআর্ক অ্যাপ্রোচ কনট্রোল, দিস ইজ চ্যারিয়টিয়ার সেভেন। ডু ইউ রিড মি?'

সাথে সাথে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর শোনা গেল দ্রুতগতি শব্দজট। সব শেষে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'দিস ইজ নিউআর্ক। রিড ইউ, চ্যারিয়টিয়ার। হাউ ইজ দা ওয়েদার আপ দেয়ার?'

'চপি। হেভী ক্লাউডস। নাথিং উই ক্যান-নট হ্যাণ্ডল অন ইনস্ট্রুমেন্টস।'

'দা উইণ্ড ইজ আউট অভ দা নর্থ ইস্ট অ্যাট টোয়েনটি সিক্স নটস অ্যাণ্ড গাস্টিং। ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট অ্যাবাউট ল্যাণ্ডিং?'

'নান্,' শান্তভাবে উত্তর দিল পাইলট। তারপর সে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুরোধ করল, 'চ্যারিয়টিয়ার সেভেন রিকোয়েস্টিং ফাইনাল অ্যাপ্রোচ টু নিউআর্ক অন ইনস্ট্রুমেন্টস।'

আবার সাড়া পেতে বেশ একটু দেরি হলো। 'রাইট, চ্যারিয়টিয়ার। টার্ন লেফট থ্রী জিরো সিক্স।'

'লেফট থারটি সিক্স,' বলল পাইলট।

'উই আর হ্যাণ্ডিং ইউ অফ টু দা টাওয়ার নাউ।'

'রজার, অ্যাপ্রোচ কনট্রোল। দিস ইজ চ্যারিয়টিয়ার সেভেন, আউট।'

পাইলট মাথা ঝাঁকিয়ে শেষ বারের মত ল্যাণ্ডিং সিস্টেম আর ব্রেক চেক করার নির্দেশ দিল কো-পাইলটকে। তারপর থ্রটল ঘুরিয়ে 306 ডিগ্রী বাঁক নিতে শুরু করল।

টাওয়ারে দাঁড়িয়ে রাডার স্কোপের খুদে আলোক বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে আছেন জেফ রিকার্ড, বিন্দুটা ধীরে ধীরে ডান দিকে সরে যাচ্ছে।

'নিউআর্ক টাওয়ার, দিস ইজ চ্যারিয়টিয়ার সেভেন। উই জাস্ট টার্ন অন ফাইনাল।'

হেডসেট পরা রাডার স্কোপের সামনে বসা লোকটা মুখ তুলে জেফ রিকার্ডের দিকে তাকাল। তারপর মাউথ পীসে বলল, 'উই আর চার্টিং ইউ, চ্যারিয়টিয়ার। রাইট হেডিং টু-জিরো। ইউ আর ক্লিয়ারড ফর রানওয়ে ফোর-ই।'

'রাইট, নিউআর্ক। ডিসেনডিং টু ওয়ান থাউজ্যাণ্ড ফিট।'

হেডসেট পরা অপারেটর সি.আই.এ. চীফের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

'ব্রেক সিস্টেম?' কো-পাইলটকে জিজ্ঞেস করল পাইলট।

'ওকে।' উত্তর এল।

'ল্যাণ্ডিং গিয়ার?'

'ইন প্লেস অ্যাণ্ড লকড্।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর আবার শোনা গেল পাইলটের গলা, 'উই আর অ্যাট টু থাউজ্যাণ্ড ফিট, নিউআর্ক।'

'অ্যাণ্ড ক্লিয়ারড ফর ফাইনাল অ্যাপ্রোচ,' বলল অপারেটর। 'ব্রিং হার অন ডাউন।'

'রজার।'

প্রায় ছুটতে ছুটতে একটা প্রাইভেট এলিভেটরে ঢুকলেন জেফ রিকার্ড, সাথে উইলি কিপার। নিচেরতলায় নেমে এসে দেখলেন, ওঁদের জন্যে একটা ব্যাগেজ ট্রাক অপেক্ষা করছে। গিয়ার দিল ড্রাইভার, কিপারের পিছু পিছু লাফ দিয়ে ট্রাকের পিছনে উঠে পড়লেন জেফ রিকার্ড। ফোর-ই রানওয়ের দিকে ছুটল ট্রাক।

চশমা থেকে বৃষ্টির পানি মুছলেন জেফ রিকার্ড। উত্তেজনায় উল্লাসিত হয়ে আছে তাঁর চেহারা। তালু ঘামছে। পাঁজরের গায়ে দ্রিম দ্রিম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ফিল্ডের দিকে চোখ পড়তে দেখলেন, সৈনিকরা চারদিকে পজিশন নিয়েছে। নিউআর্ক এয়ারপোর্ট থেকে পিঁপড়ে গলে বেরোবার উপায় নেই।

রানা তাহলে ধরা পড়ল। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই টিউলিপ কনওয়েকে ফিরে পাবেন তিনি।

দেখার আগেই প্লেনের আওয়াজ পেলেন তিনি। তারপর নিচু স্তরের মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জেটটা। দ্রুত, সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। সরাসরি রানওয়ের দিকে।

'এসো রানা,' বিড়বিড় করে বললেন জেফ রিকার্ড।

শুনতে পেয়ে হেসে উঠল উইলি কিপার।

তারপরই থেমে গেল হাসি, কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে। চোয়াল ঝুলে পড়ল, বিস্ফারিত হলো চোখ। জেফ রিকার্ডেরও একই অবস্থা। বুকের ভেতর লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

বড় বেশি দ্রুতবেগে খসে পড়ছে প্লেন। রানওয়ের দিকে নয়, পেভমেণ্টের দিকে ধেয়ে আসছে।

উইলি কিপারের বিকট চিৎকার শুনতে পেলেন জেফ রিকার্ড, 'বাতাসের ধাক্কা!'

দমকা বাতাস। ঝড়ের স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক বেশি গতি, অনেক বেশি শক্তিশালী–এই অবস্থায় পড়ে বহু প্লেন ডিগবাজি খেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

প্লেন ওপরে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল পাইলট, কিন্তু রানওয়ের বড় বেশি কাছাকাছি নেমে এসেছে আগেই। পোর্ট সাইডে কাত হয়ে রয়েছে জেট। ডান দিকের ডানা তুলতে গিয়ে অনেক বেশি তুলে ফেলল, সেই সাথে অনেক বেশি নিচের দিকে নেমে গেল বাঁ দিকের ডানা। উঁচু আকাশে ফিরে যাবার চেষ্টা বাদ দিল পাইলট, প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল এবার।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন খচ্ করে বিঁধল জেফ রিকার্ডের মনে। রানা কি নিজেই প্লেন চালাচ্ছে? গোটা ব্যাপারটা কি তার চালাকি? ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পালাবার পথ তৈরি করতে চায়?

পেভমেন্ট স্পর্শ করল প্লেন। উঁচু হয়ে থাকল নাক। প্রথমে নামল চাকাগুলো। পেভমেন্ট ধরে ছুটল জেট, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল লক্ষ কোটি আগুনের ফুলকি। তারপর সমান হলো পেট।

জেফ রিকার্ডের মনে হলো, হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। চোখের সামনে দৃশ্যটা মিথ্যে বলে মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি। সশস্ত্র সৈনিকরা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটছে, আড়াল খুঁজছে তারা। পিছন থেকে ভেসে এল সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, প্লেনের দিকে রওনা হয়ে গেছে কয়েকটা ফায়ার ট্রাক। প্লেনের চাকা গড়াচ্ছে না, হড়কাচ্ছে। পেভমেন্টের কিনারা থেকে নামার সময় সিগন্যাল লাইট ভেঙে চুরমার করে দিল। তারপর কাদা আর ঘাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, আর যেন এগোবার শক্তি নেই।

তুমুল বৃষ্টিতে নিভে গেল ফুলকিগুলো। আগুনের কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। নিরাপদে নেমে এসেছে চ্যারিয়টিয়ার সেভেন।

চোখ বুজে সীটে হেলান দিলেন জেফ রিকার্ড। ভয় কেটে গিয়ে হঠাৎ পরম স্বস্তি বোধ করায় আশ্চর্য দুর্বল লাগল নিজেকে তাঁর। তারপর দ্রুত চোখ খুললেন, জোরে একবার ঝাড়া দিলেন মাথাটা। হ্যাচ খুলে গেছে, প্লেনের দরজায় পাইলটকে দেখা গেল। প্লেনের পেটে সিঁড়ি লাগানো হলো।

ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলেন জেফ রিকার্ড, ছুটলেন প্লেনের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মোলাঞ্জা রমিউলাস। চোঙ আকৃতির মুখে কোন রক্ত নেই। চোখ দুটো বিস্ফারিত, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার পিছু পিছু এল কালো স্যুট পরা এক লোক, তার পিছনে আরেকজন।

চোখ সরু করে তাকালেন জেফ রিকার্ড। খোলা দরজায় কালো আলখাল্লা পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন প্রিস্ট। দু'জনের চোখ এক হলো, কিন্তু ভাবের কোন আদান-প্রদান হলো

না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগল প্রিস্টও।

ইস্টার্ন জেট রানওয়েতে থামল, ঘাড় ফিরিয়ে সীট-মেটের দিকে তাকাল গিয়াকোমো অগাস্টিন। 'অত্যন্ত খুশি হলাম আপনার সাথে আলাপ করে,' বলল সে।

'মাই প্লেজার,' অপর লোকটা নিঃশব্দে হাসল। 'স্বীকার করা উচিত, এর আগে কোন প্রফেশনাল গলফার-এর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। পি.জি.এ. প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হোন, এই প্রার্থনা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সীট ছেড়ে উঠল গিয়াকোমো অগাস্টিন, প্লেন থেকে নামার জন্যে আরোহীদের সাথে লাইন দিল। কয়েক সেকেণ্ড পরই খুলে গেল দরজা, এক এক করে নামতে শুরু করল আরোহীরা।

একজন স্টুয়ার্ডেস আগেই তার গলফ ব্যাগটা বের করেছে। বড়সড় প্রফেশনাল মডেল। ফার্স্ট আর ট্যুরিস্ট ক্লাস কেবিনের মাঝখানে ক্লজিটের ভেতর ছিল ওটা। গিয়াকোমো অগাস্টিনকে এগিয়ে আসতে দেখে হাসল মেয়েটা। বলল, 'আমার ধারণা, গলফ ব্যাগটাকে আপনি কখনও ব্যাগেজ হিসেবে লেখান না।'

'নো, ম্যা'ম,' ভুবন ভোলানো হাসি দেখা গেল সুদর্শন গিয়াকোমো অগাস্টিনের মুখে। 'এই ক্লাবগুলো আমার জীবন আর শরীরের অঙ্গ।'

বাইরে রোদ ঝলমলে প্রকৃতি। মৃদু বাতাসে পাম গাছের পাতা ঝিরঝির আওয়াজ করছে। মিয়ামি। তাপমাত্রা আশি ডিগ্রী।

গভীর করে শ্বাস টানল রানা। পিঠে গলফ ব্যাগ ঝুলিয়ে সামনে এগোল ও। সুপুরুষ, সপ্রতিভ, নিশ্চিন্ত। নিউআর্ক এয়ারপোর্টে যে প্রিস্টকে দেখা গেছে সে ছিল মোলাঞ্জা রমিউলাসের আরেকজন চাকর। ওই প্লেনের ধারে কাছে কখনও

যায়নি রানা। যায়নি টিউলিপ কনওয়েও।

এগারো

'চলো দূতাবাসে যাই,' বলল সারটভ। 'ওরা তোমাকে ডেকেছে।'

একদৃষ্টে সারটভের চেহারা দেখল পিকেরিং। কিছুই বোঝা গেল না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাই অনেক কিছু ফাঁস করে দেয়। অ্যাসাইনমেন্টের বারোটা বেজে গেছে, চরম ব্যর্থতা। শেষ চেষ্টা করে দেখা হয়েছে নিউআর্কে। যে-কোন সরকারের উঁচু মহলে সহিষ্ণুতা দুর্লভ একটা ব্যাপার; যাওবা একটু ছিল, ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গেছে মস্কোর।

না বোঝার ভান করল পিকেরিং। 'কেন?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল সারটভ। 'ওরা সম্ভবত তোমাকে বাড়িতে ফেরত পাঠাবে।'

বাড়ি? কোথায় সেটা? মস্কোয়? কৃষ্ণসাগরের তীরে সাজানো একটা বাংলো? সুখস্বপ্ন, কিন্তু মিছে আশা। তাকে আর দরকার নেই মস্কোর। সে যা জানে সব তারা জেনে নেবে, সব বের করে নেবে নিংড়ে, তারপর ছিবড়ের মত ফেলে দেবে। কিংবা আরও খারাপ কিছু ঘটবে। বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ উন্মোচিত হলে সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। একবার দল বদল করলে, আবারও সে তাই করতে পারে। না, পিকেরিঙের মনে কোন মিথ্যে আশা নেই। পরিচয় ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে তার প্রয়োজন এবং মূল্য ফুরিয়েছে। অতীতের বিশ্বস্ততার জন্য বর্তমানের ঝুঁকিকে কেউ

ছোট করে দেখে না। কে.জি.বি. তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

মাথা ঝাঁকাল পিকেরিং। 'চলো। দাঁড়াও, ব্যাগটা গুছিয়ে নিই।'

নিউআর্কে ব্যর্থ হবার পর এই অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠেছে ওরা। নিউআর্ক থেকে চলে এসেছে ওয়াশিংটনে, পিকেরিঙের বাসা থেকে এই অ্যাপার্টমেন্ট খুব বেশি দূরে নয়।

প্লেনে নেই জানার পর, বহু চেষ্টা করেছে কোথায় সে থাকতে পারে জানার জন্যে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। রানার কোন খবর তারা সংগ্রহ করতে পারেনি।

এখন আর তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না।

অ্যাসাইনমেন্টটা সম্পর্কেও পিকেরিঙের কোন ভুল ধারণা নেই। মস্কোর সিদ্ধান্তই ঠিক, ওরা ব্যর্থ হয়েছে। অনেক দিন কোন যোগাযোগ নেই সি.আই.এ-র সাথে, এর কোন ব্যাখ্যা জেফ রিকার্ডকে দিতে পারবে না সে। এখন জেফ রিকার্ড শুধু সন্দেহ করছেন না, তিনি জানেন। না, তার আর ফিরে যাবার পথ নেই। ল্যাংলি এখন আর তার অফিসের ঠিকানা নয়। নয় দয়েরঝিনস্কি স্কয়্যারও।

পাশের ঘরে চলে এল পিকেরিং। মনটা স্বভাবতই খারাপ। তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা জিনিস সুটকেসে ভরে নিল সে। তারপর পিস্তলটা নিল।

ফিরে এসে পিকেরিং দেখল, চেয়ারে বসে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে সারটভ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, উঠে দাঁড়াতে গেল।

গুলি করল পিকেরিং।

বিস্মিত হবার সুযোগটাও পেল না সারটভ। দু'চোখের মাঝখানে ঢুকল বুলেটটা, মাথার পিছনটা বিস্ফোরিত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বুলেটের ধাক্কায় আবার চেয়ারে বসে পড়ল

সারটভ। বসেই মারা গেল লোকটা, কি ঘটেছে না বুঝেই।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল পিকেরিং। কোথায় যাবে জানে না। কিন্তু জানে কি করতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখনও তার একমাত্র ভরসা টিউলিপ কনওয়ে। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে জিম্মি রাখতে পারলে সে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা চালাতে পারবে।

সে যা যা জানে, জেফ রিকার্ড সব জানতে চাইবে। কিন্তু টিউলিপ হাতে থাকলে আলোচনাটা হবে তার সুবিধেমত। জানতে চাও জানো সব, কিন্তু বিনিময়ে চাই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমা এবং রাশিয়ার হিংস্রতা থেকে নিরাপদ আশ্রয়।

একজন জিম্মি দরকার তার। টিউলিপ কনওয়ে। কিন্তু টিউলিপকে পেতে হলে রানাকে পেতে হবে আগে। ইশ্‌শ্‌, কেন যে এই লোকটাকে বাছাই করেছিল সে!

ওভাল অফিসের বাইরে দাঁড়ানো সেক্রেটারির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ডেস্কের পিছনে বসে আছেন রিচার্ড কনওয়ে। বন্ধুকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

জেফ রিকার্ড হ্যালো বললেন না। দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। 'পামেলাকে ফোনে ডেকে পাঠাও,' বললেন তিনি। 'তোমাদের দু'জনের সাথেই আমার জরুরী কথা আছে।'

'কি কথা?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'রানাকে আটকাবার জন্যে ফাঁদ পাতব।'

বারো

মানুষটা সুঠামদেহী। মিশমিশে কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। চকচকে ধাতব সাইনবোর্ডের ওপর একবার চোখ বুলাল সে। এ.জি.ভি.এ.। আমেরিকান গিল্ড অভ ভ্যারাইটি আর্টিস্টস–ওয়াশিংটন অফিস। একটা হাত তুলে বোতামে চাপ দিল সে। ভেতরে একটা বেল বাজার সাথে দরজার অটোমেটিক তালা খুলে গেল। কবাটে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে দেখে মনে হলো বোধহয় কিছুদিন আগেও শো-গার্ল ছিল। দেখতে ভালই, নিখুঁত মেকআপ নেয়ায় আরও ভাল লাগছে। সকালের প্রথম কাপ কফি থেকে মুখ তুলে তাকাল সে। আগন্তুককে দেখে মিষ্টি করে হাসল।

'ইয়েস, স্যার?'

দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এল আগন্তুক। তার হাঁটার সপ্রতিভ, সাবলীল ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হলো রিসেপশনিস্ট, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার একটা তাগাদা অনুভব করল। মনে হলো কর্তৃত্ব আর প্রভাবের একটা অদৃশ্য বলয় সারাক্ষণ ঘিরে আছে লোকটাকে। পরনে অত্যন্ত দামী স্যুট, পালিশ করা নখ, জুতোয় মুখ দেখা যায়। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে হীরের আংটিটা জানালা পথে আসা রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল।

'আমি এম.এন. গডফেলো।'

এবার সটান দাঁড়িয়ে পড়ল রিসেপশনিস্ট। এম.এন. গডফেলো আমেরিকার বড় একটা সার্কাস পার্টির মালিক, গিল্ডের বেশিরভাগ সদস্য-সদস্যার চাকুরিদাতা। শুধু ওয়াশিংটনে নয়, হলিউডেও তার সমান প্রতিপত্তি। শো-বিজনেসের যাদুকর বলা হয় তাকে। আয়োজনের পিছনে যেমন টাকার সাগর উপুড় করতে পারে, তেমনি তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে অহরহই বেরিয়ে আসে নিত্য-নুতন চমক লাগানো অনুষ্ঠান-সূচী। এর আগে কখনও গিল্ড অফিসে আসেনি সে, ফোন করেনি। তার কাজ করে দেয়ার জন্যে এক পাল লোক আছে।

'ইয়েস, মি. গডফেলো?'

'একটা নাম আর ঠিকানা দরকার,' বলল রানা। জানে, গডফেলো খোশগন্ধ করে সময় নষ্ট করার লোক নয়। 'আমার খুব তাড়া আছে। আজই আমি ইউরোপ রওনা হব।'

গিল্ডের পত্রিকা ভ্যারাইটিতে তাই বলা হয়েছে। শো-বিজনেসে যারা কেউকেটা তাদের সমস্ত খবর এই পত্রিকায় ছাপা হয়, কারও সর্দি লাগলে সেটাও।

'কি নাম, স্যার?' সবিনয়ে জানতে চাইল রিসেপশনিস্ট।

নিজের সমস্যাটা ব্যাখ্যা করল রানা।

দশ মিনিট পর মেয়েটার হাতে একটা ফাইল দেখা গেল। 'এই নিন, স্যার,' বলল সে। 'রিপ নরটন। গেইথার্সবার্গ, মেরীল্যাণ্ডে থাকেন উনি।'

নোটবুকে নামটা লিখে নিল রানা। তারপর ঠিকানা। 'ফোন?'

রিসেপশনিস্ট মাথা নাড়ল। 'তার ফোন নেই, স্যার।'

নেই, ভালই তো।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। নোটবুক পকেটে ভরে মেয়েটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, তারপর বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

রিপ নরটন মধ্য বয়স্ক, মাথায় চকচকে টাকের বিস্তার ঘটতে শুরু করেছে। অসংখ্য রেখা আর ভাঁজ তার মুখে, চোয়ালের নিচে ঢিলে হয়ে ঝুলে আছে চামড়া, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। অতিরিক্ত মদ্য পানের কুফল। অবশ্য কাজ করতে তার কোন অসুবিধে হয় না, যত নেশাই হোক কাজের সময় সব টুটে যায়। তবে তার দরজায় রানা যখন উপস্থিত হলো, মদে একেবারে চুর হয়ে আছে সে। রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন অন্তরের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। 'কি যেন পরিচয় দিলেন?'

'আমি এ.জি.ভি.এ-র গ্যালি সোবার্স,' আবার বলল রানা। 'ফোনই করতাম, কিন্তু আমাদের কাছে আপনার নাম্বারটা নেই।'

দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করে হাসল রিপ নরটন। 'ফোনই রাখি না, নাম্বার পাবেন কিভাবে! ঢুকে পড় ন।'

'ধন্যবাদ।'

একটা চেয়ার থেকে একজোড়া মোজা সরিয়ে বসল রানা। 'আপনার জন্যে আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, মি. নরটন।'

মুখের কাছে গ্লাস তুলল নরটন। জল-রঙ তরল পদার্থ, দেখে পানি মনে হলেও তা নয়। ঢক ঢক করে দু'ঢোক খেলো সে। 'দুঃসংবাদ যত তাড়াতাড়ি শোনা যায় ততই ভাল।'

'পিকনিকটা বাতিল করা হয়েছে।'

প্রথমে হতাশা, তারপরই নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল নরটনের চেহারায়। 'এরকম আগেও হয়েছে। কি আর করা—কপাল মন্দ।'

'তবে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'আপনার জন্যে আরেকটা অফার আছে। দ্বিগুণ পারিশ্রমিক, সমস্ত খরচ কোম্পানির।'

রক্ত বর্ণ চোখের দৃষ্টি এতটুকু বদলাল না। 'রাজি না হবার কি

কারণ আছে?' সিলিঙের দিকে চোখ মটকে হাসল নরটন, এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল।

'কোন কারণ নেই,' বলল রানা। পকেট থেকে বের করে দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা এয়ারলাইন টিকেট ফোল্ডার ফেলল ও। তারপর সেটার ওপরে বিশটা একশো ডলারের নোট রাখল।

নরটন টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। কুঁচকে আছে ভুরু। হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল সে, গুনল। অবাক চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে। এখন আর নির্লিপ্ত নয় চেহারা। 'মাই গড, তারমানে আপনি সিরিয়াস!'

'অবশ্যই সিরিয়াস।'

টিকেট ফোল্ডার নিয়ে খুলল নরটন। আবার অবাক হয়ে তাকাল রানার দিকে। 'নাইরোবি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওখানে একটা সার্কাস পার্টির সাথে ছয় হ—ার এনগেজমেন্ট।'

'কিন্তু আমি? আমাকে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ওদের একজন স্টার ক্লাউন দরকার, আর কোথাও যার চুক্তি নেই।' সামনের দিকে ঝুঁকল ও। 'এটা মাত্র স্রেফ অগ্রিম। এর অর্ধেক খরচের খাতে ধরা হবে। বাকিটা আপনার প্রথম সা—াহিক বেতন।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল রিপ নরটন।

'আজই আপনাকে ফ্লাইট ধরতে হবে,' বলল রানা। 'কাল রাতটা আপনাকে লণ্ডনে কাটাতে হবে, পরদিন পৌঁছে যাবেন নাইরোবি। পারবেন তো?'

'পারব?' ঠোঁট মুড়ে হাসল নরটন। 'আপনি ঠাট্টা করছেন? এই পরিমাণ টাকা পেলে নাইরোবি কেন, চাঁদে যেতেও আমার

আপত্তি নেই!'

হোয়াইট হাউসের উত্তরে, ফরটি∫ স্ট্রীটের একটা বারে ঢুকল পিকেরিং। রঙচটা জিনস আর পুরানো শার্ট পরে আছে সে, ক্যাপটা ভুরুর কাছে নামানো। তাকে আসতে দেখে বারটেণ্ডার তাকাল কি তাকাল না। শেষ মাথার একটা বুদে ঢুকল পিকেরিং।

সময় মত ওয়েট্রেস এল। বিয়ারের অর্ডার দিল পিকেরিং। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল ফোন বুদে লোক রয়েছে। তারমানে অপেক্ষা করতে হবে।

সি.আই.এ-র ভেতর বিশ্বস্ত দু'চারজন যারা আছে, আবার তাদের সাথে যোগাযোগ করবে পিকেরিং। ওরাই এখন তার শেষ অবল'ন, যদিও তেমন শক্তিশালী নয়। এখন পর্যন্ত এমন কোন সূত্র বা তথ্য ওরা দিতে পারেনি যার সাহায্যে মাসুদ রানার সন্ধান করা যায়। তবে ওদের তথ্য থেকেই জানা গেছে, জেফ রিকার্ডও রানার সন্ধান পাচ্ছে না। তার মানে, এখনও বোধহয় খানিকটা সময় হাতে আছে তার।

ফোন করে যাকে যা বলার বলে, বার থেকে বেরিয়ে এল পিকেরিং। সামনে একটা নিউজ স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখতে হবে। ওয়াশিংটন পোস্ট, সান্ধ্য সংস্করণ কিনল সে। না, কেউ ওর ওপর নজর রাখছে না।

কাগজের প্রথম পাতায় শুধু আন্তর্জাতিক খবর, সরকারি আর রাজনৈতিক। এখন আর এ-সবে তার আগ্রহ নেই। ভেতরের পাতা খুলল সে। স্টাইল এবং মেট্রো সেকশনের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। তারপর, বরাবরের অভ্যেসবশে, বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ রাখল।

একটু পরই চমকে উঠল পিকেরিং। প্রথম দর্শনেই বুঝল, বিজ্ঞাপনটা তাকে উদ্দেশ্য করে ছাপানো হয়েছে। এমনিতে

বিজ্ঞাপনটা আরগুলোর মতই, কিন্তু দুটো শব্দ, বড় বড় অক্ষরে ছাপা, যার অর্থ শুধু সে আর রানা জানে।

গোলাপ কুঁড়ি।

বিজ্ঞাপনটার শিরোনাম দেয়া হয়েছে–সাহায্য প্রয়োজন।

শিরোনামের নিচে ছাপা হয়েছে–গোলাপ কুঁড়ির জন্যে ডিলার আবশ্যক। অপূর্ব সুযোগ। মুন রক। এখুনি যোগাযোগ করুন, বক্স সেভেন-ফোর-ফাইভ পি।

পিকেরিং হাসল। এও কি সম্ভব? তার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাইছে রানা?

এখুনি যোগাযোগ করুন মানে আজই, কিংবা আজ রাত পৌনে আটটায়। সময় মত পৌঁছুতে চাইলে দু'ঘণ্টা সময় আছে হাতে। কিন্তু পৌঁছুতে হবে আরও আগে। ইতোমধ্যে খেয়ে নেয়া দরকার, খিদে পেয়েছে। কিন্তু খেতে বসার আগে গোসল করা দরকার। কাপড় পাল্টাতে হবে।

রানার যদি কোন প্রস্তাব থাকে, অন্তত প্রায় গ্রহণযোগ্য হবে সেটা। আবার এটা ওর একটা চালাকিও হতে পারে। তবে খারাপ ভাল যাই হোক, রানাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার একটা সুযোগ তো বটে!

মুন রক প্রদর্শনীতে নিশ্চয় যাবে পিকেরিং।

ক্যাপিটল আর ওয়াশিংটন মনুমেন্টের মাঝখানে চওড়া মল, মলের দু'পাশে নয়টা মিউজিয়ামের একটা হলো এয়ার অ্যাণ্ড স্পেস মিউজিয়াম। সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল সুদর্শন এক যুবক।

সাড়ে সাতটা বাজে। তবে প্রধান প্রদর্শনী হলের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা জানালাগুলো দিয়ে এখনও দিনের আলো ঢুকছে। প্রায় বিল্ডিংটার সমানই উঁচু সিলিং, সিলিং থেকে ঝুলছে এরোপ্লেনগুলো, দেখে মনে হলো যেন উড়তে উড়তে হঠাৎ মাঝ

আকাশে স্থির হয়ে গেছে। ওগুলোর মধ্যে রাইট ব্রাদার্সের ফ্লাইয়ার রয়েছে, রয়েছে লিণ্ডবার্গের স্পিরিট অভ সেণ্ট লুইস, বেল এক্স-ওয়ান–প্রথম যেটা শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়েছিল। বিশাল ফ্লোর জুড়েও দেখার মত অনেক বস্তু রয়েছে–পাইওনিয়ার টেন, ফ্রেণ্ডশিপ সেভেন, জেমিনি ফোর–সবগুলো মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার সময় কালো হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড আরেক হলে, ডান দিকে, রয়েছে প্যাসেঞ্জার প্লেনগুলোর প্রথম দিককার সংস্করণ। বাঁ দিকের হলে রয়েছে নাসা-র রকেট, গাইডেড মিসাইল, বোমা নিক্ষেপণ মঞ্চসহ বাহন, এবং একটা লুনার ল্যাণ্ডিংক্রাফট।

আর আছে শয়ে শয়ে দর্শক।

বছরের এই সময়টায় ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে মিউজিয়াম। বিভিন্ন রাজ্যের ট্যুরিস্টরা তো দল বেঁধে আসেই, ওয়াশিংটনবাসীদের কাছেও এই মিউজিয়ামের আবেদন পুরানো হবার নয়। সময় পেলেই চলে আসে লোকজন। মলের উল্টোদিকে ন্যাশনাল গ্যালারির মত নয় এটা, এখানে ওখানে থেমে থেমে বা লাইন দিয়ে প্রদর্শনী দেখতে হয় না। বিশাল ফাঁকা জায়গা ছাড়া আছে, যার যেদিক খুশি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধা নেই।

জায়গাটাই এমন, ভিড় থাকলে নির্দিষ্ট একজন লোকের ওপর নজর রাখা প্রায় অসম্ভব।

অলসভঙ্গিতে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে রানা, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে, বাঁধনহীন ভবঘুরের মত লাগছে ওকে। এখানে কাউকে দেখতে আসেনি ও, দেখা দিতে এসেছে। ঘড়ির দিকে একবারও তাকাল না, তবে আন্দাজ প্রায় দশ মিনিট পর ঘুরে দাঁড়িয়ে মেইন হলের দিকে এগোল।

এক ধারের মেঝে থেকে একটা মেটাল শ্যাফট ওপর দিকে

উঠেছে, প্রায় দশ ফিটের মত। কোমর সমান উঁচুতে শ্যাফটের গায়ে একটা ফাঁক। ভেতরে ছুঁয়ে দেখার জন্যে রয়েছে চার বিলিয়ন বছরের পুরানো একটা নমুনা। চাঁদ থেকে নিয়ে আসা তেকোনা একটা পাথর। মসৃণ, কালো।

শুধু এখানেই একটা লাইন দেখা গেল। শ্যাফটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে মানুষ, তারপর সামনে বাড়ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় চারদিকে চোখ বুলাল রানা।

কে জানে কি করবে পিকেরিং!

সময়ের আগেই পৌঁচেছে পিকেরিং। প্রদর্শনী হলগুলো একবার দেখে নিয়ে এসক্যালেটরে চেপে ওপরতলায় উঠে এসেছে সে। ঝুল-বারান্দার রেইলের কাছে ভাল একটা আড়াল পেয়ে গেছে, সেখান থেকে লক্ষ রাখছে নিচের দিকে। কালো একটা এক্সফিফটিন, হাই অলটিচ্যুড রিসার্চ প্লেন, ঝুল-বারান্দার সমান উঁচুতে ঝুলছে–চমৎকার আড়াল। চোখে ক্যামেরা তুলল সে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে ছবিও তুলছে, লোকজনদের চেহারাও দেখে নিচ্ছে।

সময়ের আগে রানাও পৌঁচেছে, কাজেই পিকেরিঙের চোখে ধরা না পড়ার কারণ নেই। প্রথমে পিকেরিং চেহারাটা চিনতে পারল না। সুদর্শন এক যুবক, পরনে জিনসের ট্রাউজার, মাথাভর্তি এলোমেলো কালো চুল, কাকের বাসা বললেই হয়। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার হাবভাব পরিচিত লাগল পিকেরিঙের। ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, কিন্তু রানাই। মুন রক দেখার জন্যে লাইনে দাঁড়াল ও। ক্যামেরার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে আবার তাকাল পিকেরিং। না, আর কোন সন্দেহ নেই।

পিকেরিঙের ভেতর থেকে খুশির ফোয়ারা উথলে উঠল। রেইলের কাছে থেকে পিছিয়ে এল সে। কিন্তু রানার সাথে

যোগাযোগ করার জন্যে নিচে নামল না।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। আরও কিছুক্ষণ দেখল সে, কিন্তু পিকেরিং যোগাযোগ করল না। বাইরে কালো হয়ে আসছে আকাশ। এতক্ষণে ঘড়ি দেখল রানা। সোয়া আটটা বাজে। নাহ, আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ও।

বিল্ডিঙের পিছনের রাস্তায় রেখে যাওয়া গাড়িটা দূর থেকেই দেখতে পেল রানা। গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সিগারেট ধরাল একটা। তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টার্ট দিল, রওনা হলো পুব দিকে।

ওর বাঁ দিকে পড়ল ক্যাপিটল, প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে উঁচু গ'ুজটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। হাউজ অফিস বিল্ডিং পেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি, ফিরে যাচ্ছে ক্যাপিটল হিলে ভাড়া করা গ্রাউণ্ড ফ্লোর অ্যাপার্টমেন্টে।

আকাশ কালো হতে শুরু করলেও, কোথাও মেঘ নেই, অনেকগুলো তারা পিটপিট করে জ্বলছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট ভালই, কাল দিনটা শুকনো খটখটে থাকবে। পিকনিকের জন্যে চমৎকার একটা দিন।

কিন্তু সে কালকের কথা।

বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ডাডিংটন প্লেসে ঢুকল গাড়ি। ফুটপাথের পাশে থামল রানা। সার সার বাড়ি, বাড়ির সামনে গাছপালা, লাইটপোস্টের হলুদাভ আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক। গাড়িতে তালা লাগাল রানা, কটা ধাপ টপকে সামনের দরজায় দাঁড়াল। তারপর ঘুরল ও।

রাস্তায় কেউ নেই। একটা বিড়াল পর্যন্ত না।

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

স্বামীর দিকে তাকালেন পামেলা কনওয়ে, তারপর কামরার আরেক প্রান্তে বসা জেফ রিকার্ডের দিকে ফিরলেন। 'তোমার কি সত্যি মনে হয়, এতে কাজ হবে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের ওপরতলায় রয়েছেন ওঁরা, লিংকন সিটিং রুমে। ছোট কামরা, রুচি স্নিগ্ধ আসবাবে সাজানো, পর্দা আর দেয়াল একই রঙের। লিংকন পরিবারের যদি নাও হয়, রোজ উডের তৈরি চেয়ারগুলো লিংকন আমলের তো বটেই।

একটা চেয়ারে প্রায় শুয়ে আছেন জেফ রিকার্ড, তাঁর তুলনায় চেয়ারটা আকারে ছোট হওয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে সেটা। পামেলার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে রিচার্ড কনওয়ের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আবার পামেলার দিকে ফিরলেন। বাঁ দিকের কাঁধটা একটু উঁচু করলেন তিনি। 'রানা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নেই,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন তিনি। 'ইতিমধ্যে যা বলেছি আরেকবার তোমাদের শোনাতে পারি। আমার ধারণা–স্রেফ ধারণা–টিউলিপকে রানা বাড়ি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পামেলা কনওয়ে। 'ভাল হত যদি জানতাম...'

'তা হত বৈকি। কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু জানার উপায় কোথায়? যা ঘটছে তার ওপর চোখ রেখে হিসেব মেলাতে হবে। প্রশ্ন হলো, টিউলিপকে রানা সাথে করে রাখবে কেন? কেন সে ঝুঁকিটা নিতে যাবে? টিউলিপ সাথে না থাকলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যেতে পারে সে। সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো আর কোনদিনই আমরা খুঁজে বের করতে পারব না। কিন্তু টিউলিপ সাথে থাকলে?' কাধ ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড, প্রশ্নের উত্তর সবাইকে আন্দাজ করে নেয়ার সুযোগ দিলেন।

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন পামেলা। তিনিও আশা করছেন,

কিন্তু বিশ্বাস রাখতে পারছেন না।

'আরও একটা ব্যাপার,' আবার মুখ খুললেন, সি.আই.এ. চীফ। 'রানার জন্যে এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তাই না? যা কারও কল্পনায় আসে না, সে-ধরনের কাজ করতে ভালবাসে রানা। তার অতীত ইতিহাস অন্তত তাই বলে। হোয়াইট হাউসে টিউলিপকে ফিরিয়ে আনা সে-ধরনের একটা কাজ। শুধু ফিরিয়ে আনা নয়, টিউলিপকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালানো।'

'কিন্তু দুটোই অসম্ভব···।'

পামেলাকে থামিয়ে দিয়ে জেফ রিকার্ড বলে উঠলেন, 'আমিও তো ঠিক তাই বলতে চাইছি। অসম্ভব। আর অসম্ভব বলেই এই কাজ করবে রানা। কাজেই, আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করব।'

পামেলা তার হাতের কাগজটার দিকে তাকালেন। অতিথিদের তালিকা। 'এদের মধ্যে কে হবে বলে তোমার ধারণা?'

'আন্দাজ করা অসম্ভব। স্পীকার? একজন কেবিনেট সেক্রেটারি?'

'সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত?' জানালার দিকে পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। সাউথ লনের সামনে, ওয়াশিংটন মনুমেন্টের চারধারে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেই আলোর আভা লাগল তাঁর মুখের একদিকে। ঘরের মৃদু আলো পড়েছে তাঁর মুখের আরেক দিকে।

চোখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। 'সে যদি তোমার ছদ্মবেশ নিয়ে আসে, তাতেও আমি আশ্চর্য হব না, রিচার্ড।'

'কোন মানুষ এত দক্ষ হয় কি করে?' পামেলা কনওয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

'আমার ধারণা সত্যি হলে সেটা তুমি নিজের চোখেই দেখতে

পাবে,' বললেন পারিবারিক বন্ধু জেফ রিকার্ড।

ওঁদের দু'জনের দিকেই কটমট করে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'সে কতটা দক্ষ আমি জানতে চাই না। আমি চাই রানা ধরা পড়ক। প্রথমে আমি টিউলিপকে ফিরে চাই, তারপর রানাকে। সবশেষে, যদি সম্ভব হয়, হেনরি পিকেরিংকে। রানা···টিউলিপকে ফিরিয়ে আনলেই তার অপরাধ মাফ হয়ে যাবে না। তাকে ধরতে হবে। কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। আমি চাই তার যাবজ্জীবন হোক।'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে জেফ রিকার্ড বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবছ আবার মৃত্যুদণ্ড চালু করা গেলে মন্দ হত না, তাই কি?'

কিন্তু রিচার্ড কনওয়ে কৌতুক বোধ করলেন না। 'লোকটা কিডন্যাপার। একজন খুনী। রাশিয়ার একজন গুপ্তচরও হতে পারে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন জেফ রিকার্ড। 'এখানে তোমার ভুল হচ্ছে। মাসুদ রানা যেমন সি.আই.এ-র স্পাই নয়, তেমনি কে.জি.বি-রও স্পাই নয়। এ আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি।'

'সে ধরা পড়বে এই গ্যারাণ্টি দিতে পারো না?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

একমুহূর্ত চুপ করে থাকলেন জেফ রিকার্ড। তারপর বললেন, 'পারি। রানা ধরা পড়বে। তোমার কাছে এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।'

রাত প্রায় দুটোর দিকে বাইরে থেকে রানার ঘরের জানালা খোলার চেষ্টা করল পিকেরিং। ফ্রেমের চারদিকে আলতোভাবে আঙুল বুলাল সে, লুকানো তার আছে কিনা দেখছে।

আছে তার, অন্তত দুই সিস্টেমের দুটো, বেশিও হতে পারে।

যার নাম মাসুদ রানা, ভাবল পিকেরিং, প্রতিটা মুহূর্ত সতর্ক থাকে বানচোত। নিশ্চয় ভেতর দিকেও আরেক প্রস্থ তার আছে। সবগুলো তার নাগালের মধ্যে পেলেও, কেটে ফেলা বা খুলে নেয়া সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া উপায় নেই।

জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এল পিকেরিং। অন্ধকারে ঘুরল। তারপর নিঃশব্দে পা বাড়াল বেসমেন্ট দরজার দিকে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার।

ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটাই জানালা, বন্ধ থাকার কথা। সেদিক থেকে কোন শব্দ এল না। শুধু রানার কানে খুদে একটা প্লাগ মৃদু শোঁ শোঁ আওয়াজ করছে। তারমানে জানালাটা এখন আর বন্ধ নয়।

স্থির হয়ে শুয়ে থাকল রানা, জানালার দিকে পিঠ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কোন পরিবর্তন ঘটল না, যেমন বইছিল তেমনি বইতে লাগল–ধীর ভাবে, নিয়মিত–একজন ঘুমন্ত লোক যেভাবে শ্বাস ফেলে আর নেয়। শুধু চোখ দুটো ঘুরল রানার, বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটা নেই। আছে নিশ্চয়, কিন্তু লিউমিনাস ডায়াল নিভে গেছে। তারমানে বিদ্যুৎ নেই। মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে কেউ।

বাড়ির ইলেকট্রিকাল সার্কিটে চারটে অ্যালার্ম সিস্টেম সেট করেছিল রানা। সবগুলোই অকেজো করে দেয়া হয়েছে। ফিউজ বক্সটা বেসমেন্টে। বিদ্যুৎ সরবরাহ সেখান থেকে বন্ধ করা হয়েছে।

যান্ত্রিক গোলযোগের ওপর হাত নেই। তাছাড়া অপরাধপ্রবণ মানুষের ওপরও বিশ্বাস নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে, এ রানা আগেই আশঙ্কা করেছিল। সে-কথা ভেবেই আরও একটা ব্যবস্থা করা আছে ওর, এমনকি প্রফেশনাল কারও চোখেও ধরা

পড়বে না। জানালার ফ্রেমে, গোড়ার দিকে, ব্যাটারিচালিত একটা অ্যালার্ম, সামান্য নড়াচড়াতেই জ্যান্ত হয়ে উঠবে।

সতর্ক সঙ্কেত, তার বেশি কিছু না। তবে যথেষ্ট।

শুধু হাতটা নাড়ল রানা, বালিশের তলায় সুইচে আঙুল ঠেকাল। তারপর রিভলভারের ওপর হাত পড়তেই পিছন থেকে কর্কশ গলায় নির্দেশ এল, 'নড়বে না, রানা। আমার হাতে পিস্তল।'

পিকেরিং।

রানা নড়ল না।

পিছনে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। 'এবার এদিকে ফেরো। ধীরে ধীরে।'

ধীরে ধীরে পাশ ফিরতে শুরু করে বিছানায় পিঠ দিল রানা। ডান হাতের কনুই দিয়ে চোখ ঢাকল, উজ্জ্বল আলো সহ্য হলো না। কনুইয়ের আড়াল থেকে চোখ পিট পিট করে তাকাল ও। টর্চের পিছনে কিছু দেখা গেল না, অন্ধকার। ক্ষীণ একটু তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

'বাঁ হাতটাও বের করো, রানা,' বলল পিকেরিং। 'সাবধান। কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না।'

রিভলভারটা ছেড়ে দিয়ে চাদরের তলা থেকে হাতটা বের করে আনল রানা। পিস্তলের মুখে আর কিই বা করতে পারে ও?

'মেয়েটা কোথায়?'

'তোমারটা আসলে ওয়ান-ট্র্যাক মাইণ্ড,' বলল রানা। 'বড় মেয়ে ঘেঁষা লোক, বাবা! দেখা হলেই শুধু মেয়েটা কোথায়, মেয়েটা কোথায়। আর বুঝি কিছু ভাবতে পারো না তুমি?'

'কোথায় মেয়েটা?'

'নেই। অন্তত এখানে নেই। এমনকি ওয়াশিংটনেও তাকে আমি রাখিনি।'

'বলবে না?'

রানা উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

কয়েক সেকেণ্ড আর কিছু বলল না পিকেরিংও। ঘরের চারদিকে টর্চের আলো ফেলল সে। এতক্ষণে তার মুখ দেখার সুযোগ হলো রানার। ছায়া পড়ায় ভাঙাচোরা লাগল চেহারা।

'ভেবেছ তোমার কথা আমি বিশ্বাস করব?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যা খুশি বিশ্বাস করতে পারো তুমি। আমার কি!'

হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল। উল্টোদিকের দরজার ওদিক থেকে এল আওয়াজটা। কোমল একটা গোঙানির মত আওয়াজ। চট করে একবার সেদিকে তাকিয়েই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ বাড়ি, গভীর রাত, ঘুমন্ত শিশুর কোমল গোঙানির আওয়াজ–কালা না হলে যে-কেউ শুনতে পাবে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো পিকেরিঙের চেহারা। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা। রানার দিকে তাক করা থাকল পিস্তল আর দৃষ্টি, পিছাতে শুরু করল সে।

বিছানার ওপর উঠে বসার চেষ্টা করল রানা। উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল ওকে। 'ওদিকে যেয়ো না!'

'খবরদার!' দাঁড়িয়ে পড়ে গর্জে উঠল পিকেরিং।

পিকেরিং গুলি করতে যাচ্ছে দেখে আবার শুয়ে পড়ল রানা।

পিকেরিঙের পিস্তল ধরা হাতে ঢিল পড়ল। আবার পিছাতে লাগল সে। এক পা এক পা করে।

রাগে আর হতাশায় নিঃশব্দে ছটফট করছে রানার চোখ জোড়া। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ও। এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই ওর।

দরজার পাশে পিঠ ঠেকল পিকেরিঙের। নিরেট ওক কাঠের

কবাট, তামার চকচকে নব। একশো বছরের পুরানো বাড়ি। তারপর, মুহূর্তের জন্যে, রানার ওপর থেকে তার দৃষ্টি সরে গেল।

চাদরের তলায় ঢুকে গেল রানার হাত। 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি...'

'চোপ শালা!' গর্জে উঠল পিকেরিং। 'হাত বের কর!'

চাদরের তলা থেকে খালি হাতটা বের করল রানা।

টর্চটা পিস্তল ধরা হাতে নিল পিকেরিং, তারপর বগলের নিচে ঢোকাল সেটা, আলোটা এখনও রানার দিকে তাক করা থাকল। এবার সে তার মুক্ত হাতটা বাড়াল নব ধরার জন্যে।

কাছে পৌঁছল, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি হলো না। নব আর হাতের মাঝখানে চুল পরিমাণ দূরত্ব থাকল, সংযোগ ঘটতে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ বাকি, এই সময় দৈত্যাকার একটা স্ফুলিঙ্গ মুক্তি পেল। ঘন নীল আগুনের স্বচ্ছ একটা শিখা। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল, বিদ্যুৎ শক্তির ৪৪,০০০ ভোল্ট পিকেরিঙের হাত বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে।

অসম্পূর্ণ একটা আওয়াজ বেরুল তার মুখ থেকে। গোঙানির মত, তেমন জোরাল নয়, শুরু হতে না হতেই থেমে গেল। খিঁচ্ ধরে গেল শরীরে। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাথার সব চুল। তারপরই অদৃশ্য হলো নীল আলোর প্রবাহ, থেমে গেল গুঞ্জন ধ্বনি। মেঝেতে পড়ে গেল পিকেরিং।

আধ মাইল দূরে ক্যাপিটল গম্বুজের উজ্জ্বল আলো দু'চারবার কেঁপে উঠে ম্লান হয়ে গেল। মাঝখানের বাকি সব আলো নিভে গেল। রেডিও-টিভি চলছে না, লাইটপোস্টে আলো নেই। গোটা এলাকা ঢাকা পড়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে। পাওয়ার শর্ট-সার্কিট।

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা, লম্বা তিন পা ফেলে পিকেরিঙের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। একটা হাত তুলে লোকটার বুকে চাপড় মারল ও। তারপর বুকে কান ঠেকাল।

কোন আওয়াজ নেই। বুকটা আবার চাপড়াল রানা। এবার হার্টবিট শোনা গেল। বেঁচে আছে পিকেরিং, কিন্তু জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে।

দরজার সামনে পাপোশের ওপর বসল রানা। আর্থিং-এর জন্যে পাপোশটা ভিজিয়ে রেখেছিল ও। হাত দিয়ে দেখল, ভেজা ভেজা লাগছে, তার বেশি কিছু না–পিকেরিং ব্যাপারটা লক্ষই করেনি।

তামার নব থেকে একটা তার নেমে এসে ঢুকে গেছে পাপোশের ভেতর। দ্বিতীয় একটা তার বেরিয়েছে বাইরের দরজার কাছে, দরজার নিচ দিয়ে এগিয়ে গেছে উঠানের কিনারা ঘেঁষে একটা ম্যানহোলের দিকে। তারটাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড মেইন পাওয়ার লাইনের সাথে টেপ দিয়ে আটকে রেখে এসেছিল রানা।

এখন আর সাবধান হওয়ার দরকার নেই, পাওয়ার লাইন অফ হয়ে গেছে। এক প্রস্থ তার উদ্ধার করল রানা, সেটা দিয়ে বাঁধল পিকেরিংকে। এবার দাঁড়াল ও, তামার নবটা ছুঁলো। চাপ দিতেই খুলল সেটা। চৌকাঠ পেরিয়ে পাশের ঘরে এল ও। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে টিউলিপ।

শেষ ইঞ্জেকশনটা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দিয়েছে রানা, জানত যা-ই ঘটুক না কেন, টিউলিপের ঘুম ভাঙবে না।

টিউলিপের বিছানার পাশে টেবিলের ওপর একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে। সুইচটা পাশের ঘরে, রানার বালিশের তলায়। এখনও ঘুরছে টেপ, তবে আর কোন আওয়াজ বেরোবে না। একমাত্র যে আওয়াজটা হবার কথা তা খানিক আগেই হয়ে গেছে–কোমল একটা গোঙানির শব্দ। ওই শব্দটাই এ-ঘরের দরজার কাছে টেনে এনেছিল পিকেরিংকে।

তেরো

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে নেমে এসেছে সিঁড়িটা। পরিচিত সিঁড়ি, তবু হোয়াইট হাউসের ঝুল-বারান্দা থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নামার সময় কেমন যেন দিশেহারা বোধ করলেন পামেলা কনওয়ে। মন ভাল নেই, নাকি শরীরও খারাপ? নিচে প্রচুর লোকজন, বেশিরভাগই তাঁর পরিচিত, অথচ কয়েক মুহূর্ত তাদের কাউকেই তিনি চিনতে পারলেন না। মাসুদ রানা নামে কিডন্যাপার লোকটা কি এদের মধ্যে আছে? যদি থাকে, কোথায় সে? কে সে? তাকে চেনার কি কোন উপায় নেই?

আছে! তার সাথে টিউলিপ থাকবে!

সত্যিই কি থাকবে? সত্যিই কি টিউলিপকে ফিরিয়ে দেবে লোকটা? একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন তিনি। মাথার ভেতর কত রকম দুশ্চিন্তা আনাগোনা করছে। জেফ হয়তো নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে তাঁদের। টিউলিপ হয়তো··· অনেক কষ্টে চিন্তার লাগাম টেনে ধলেন তিনি।

ভিড়ের মধ্যে স্বামীকে দেখতে পেলেন পামেলা। পুরানো বন্ধুদের সাথে গল্প করছেন প্রেসিডেন্ট, পুরুষ আর মহিলারা ঘিরে

আছে তাঁকে, এরা সবাই তাঁর সেই কংগ্রেসে থাকাকালীন সুহৃদ।

রঙিন পর্দার ফাঁক দিয়ে ফালি ফালি রোদ ঢুকছে ভেতরে। হোয়াইট হাউস কর্মীরা সাদা জ্যাকেট পরে হট ডগস, হ্যামবার্গার, আইসক্রীম, আর কটন ক্যাণ্ডি পরিবেশন করছে। চারদিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েদের ভিড়। কংগ্রেস সদস্য আর সিনেটরদের সন্তান ওরা, পিকনিকে এসেছে। কেউ কেউ বাবা-মার গায়ের সাথে সেঁটে আছে, বেশিরভাগই দৌড়াদৌড়ি করছে লনের ওপর–গাছে চড়ছে, লুকোচুরি খেলছে, ফোয়ারার কাছে সফট বল খেলছে।

বাচ্চাদের দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল পামেলা কনওয়ের। সবাই আছে, শুধু নিজের বাচ্চাটা এখানে নেই।

চারদিকে হাসি-আনন্দ, উৎসব-উৎসব ভাব। ছোঁয়াচে। উঁচু মঞ্চের স্কয়্যার ডান্সাররা এইমাত্র একটা অনুষ্ঠান শেষ করে নতুন আরেকটা ধরল। সংগীতের তালে তালে খোকা-খুকিরা মার্চ করে গেল লনের এক দিক থেকে আরেক দিকে। আবার তারা ফিরে আসছে। তাদের সাথে ভিড়ে গেল পামেলার পরিচিত একজন সিনেটর, বয়স আশির ওপর। নিজের অজান্তেই হেসে ফেললেন পামেলা। আরেক মঞ্চে যাদু খেলা দেখানো হচ্ছে। খালি তালু থেকে রঙচঙে মাছ বের করছে যাদুকর, একের পর এক অনেকগুলো। আরেক দিকে পুতুল নাচের আসর বসেছে। ক্লাউনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে। চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে পামেলা আন্দাজ করলেন, অতিথিদের সংখ্যা হাজার না ছাড়ালেও, কাছাকাছি হবে।

স্বামীর সাথে পামেলাও কংগ্রেস সদস্যা ছিলেন। ওঁরা চলে আসার পর কংগ্রেস অনেক বদলে গেছে। চারদিকে এমন অনেক মুখ ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের তিনি চেনেন না। ওদের মধ্যে কে

অতিথি কে সিকিউরিটি গার্ড তাও বোঝার কোন উপায় নেই।

এদের মধ্যে কেউ একজন মাসুদ রানা? সে কি সত্যি এসেছে? নাকি এখনও পৌঁছায়নি, তবে আসবে?

টিউলিপকে অন্য কোথাও যদি রেখে আসে?

তাঁর মাথা ঘুরে উঠল। নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। আচ্ছন্ন ভাবটা একটু পরই কেটে গেল। ভাবলেন, জেফের প্ল্যান সফল হতেও পারে, নাও পারে। প্ল্যানটা মোটামুটি মন্দ না। বড় একটা পিকনিকের আয়োজন করা, রানা যাতে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সুযোগটা নেয়। সে যদি টিউলিপকে ফিরিয়ে দিতে চায়, তবেই আসবে, তাই না? প্ল্যানটা জেফের, আয়োজনটাও তার। পিকনিক হবে হোয়াইট হাউসের লনে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে নামমাত্র। নিমন্ত্রণ পাবে শুধু কংগ্রেস আর সিনেটর পরিবারগুলো। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা থাকবে, ছেলেমেয়েদের অবশ্যই সাথে আনতে হবে।

শর্তটা রানার জন্যেও প্রযোজ্য।

তবে জেফ কোন গ্যারাণ্টি দেয়নি। সম্ভাবনা আছে ফাঁদে পা দিতে পারে রানা, তার বেশি কিছু না।

চিন্তায় ছেদ পড়ল, পামেলা দেখলেন সপরিবারে একজন সিনেটর তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করলেন তিনি। হাসলেন জোর করে।

কেউ জানে না টিউলিপ কিডন্যাপ হয়েছে। সম্পূর্ণ শান্ত আর স্বাভাবিক থাকতে হবে তাঁকে। সবার সাথে কথা বলতে হবে। হাসতে হবে। সবার সাথে বসে খেতে হবে।

কেন? আমার মেয়ের কোন খবর নেই, আমি কেন হাসব?

'হাই!' সিনেটরের স্ত্রী জড়িয়ে ধরলেন পামেলাকে।

'হাই!' সাড়া দিয়ে বান্ধবীর উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন ফার্স্ট লেডি। হাসছেন তিনি। কুশলাদি জানতে

চাইছেন।

জোর করে হাসলেও, তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। হঠাৎ করেই পামেলা কনওয়ের মনে হলো, প্ল্যানটা সফল হবে। আসবে রানা। মেয়েকে আবার ফিরে পাবেন তিনি।

সিনেটর তার ছোট্ট দল নিয়ে আরেক দিকে সরে গেল। স্বামীর দিকে তাকালেন পামেলা। প্রেসিডেন্ট কাছাকাছিই রয়েছেন, তবে তাঁর দিকে পিছন ফিরে। পামেলা জানেন, এই ভিড়ের মধ্যে স্বামী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না, তবু তাঁর পাশে থাকতে ইচ্ছে করল। আর কিছু না হোক, চোখের দৃষ্টি, হাতের একটু চাপ, এ-সবও এখন পরম শান্তি এনে দেবে তাঁর মনে। এ-সব এখন তাঁর দরকার। জানেন, তাঁর স্বামীও এ-সবের জন্যে কাঙাল হয়ে আছেন।

কিন্তু এত কাছে, তবু যেন দু'জনের মধ্যে এক সাগর ব্যবধান। এদিক ওদিক থেকে ডাক এসে তাঁকে থামিয়ে দিল, একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে হলো। স্বামীর সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

ওয়েজ অ্যাণ্ড মীনস চেয়ারম্যান তাঁর পথ আগলে ধরল, বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীর সাথে করমর্দন করলেন পামেলা। বাড়িয়ে দেয়া আরেকজনের হাত নিজের হাতে নিতে হলো।

'তারপর বলুন,' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল একজন। 'আপনার মেয়েকে যে দেখছি না? কেমন আছে সে?'

পামেলা মিষ্টি করে হাসলেন। 'ভাল আছে।'

'ভাল আছে?' সাথে সাথে আরেকজন প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'কিন্তু কোথায় যেন পড়লাম টিউলিপ অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, মানে...'

'সিরিয়াস কিছু না, কি বলেন?' তৃতীয় কণ্ঠস্বর।

স্বামীকে খুঁজলেন পামেলা, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে এখন আর

তাঁকে দেখতে পেলেন না। মনে হলো খোলা লনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন তিনি। আতঙ্কবোধটা আবার ফিরে আসতে শুরু করল মনে। 'টিউলিপ ভাল আছে। সত্যি। আগের চেয়ে অনেক ভাল।'

সম্ভবত পামেলার কথা বলার ধরনেই সহানুভূতি-মাখা হাসি হাসি মুখগুলোয় কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব ফুটল। তাঁর মনে হলো, এরা সবাই তাঁর শত্রু, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

'বাড়ি থেকে দূরে অথচ অসুস্থ, আহা বেচারি,' অচেনা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন পামেলা। 'নিশ্চয়ই মায়ের জন্যে তার মন খুব খারাপ হয়ে আছে।'

'খাঁটি কথা। অসুস্থ বাচ্চা তোমাকে কাছে চাইবেই।'

'আপনারও নিশ্চয়ই কিছু ভাল লাগছে না?'

'কার লাগে, বলুন? কিন্তু যাই কিভাবে, এখানেও যে আমাকে দরকার,' বলে ওদের দিকে পিছন ফিরলেন পামেলা। কোন কারণ নেই, অথচ সবার ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো তাঁর। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইল, অনেক কষ্টে ঠেকালেন। আরেক দল অতিথি তাঁর সামনে দাঁড়াল। জোর করে হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা করছে। চোয়ালের ভেতর মাংস কাঁপছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন তিনি। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলেন, এভাবে আর আমি হাসতে পারব না!

তবু হাসতে হবে। হাসলেন। ঘিরে থাকা লোকজনের দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। পুরানো কৌশলটা ব্যবহার করলেন। 'দুঃখিত। রিচার্ডের সাথে জরুরী কথা বলতে হবে আমাকে।'

সাথে সাথে ভিড় ফাঁক হয়ে গেল। স্বামীকে দেখতে পেলেন পামেলা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, তিনিও স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। হাসলেন তিনি, একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হন হন করে স্বামীর কাছে চলে এলেন পামেলা।

'তোমাকে আমি খুঁজছিলাম,' বললেন রিচার্ড কনওয়ে। একটা হাত দিয়ে স্ত্রীর কোমর পেঁচিয়ে ধরলেন তিনি। নরম একটু চাপ, কথার চেয়ে বেশি সান্ত্বনাদায়ক। 'লিজা আর রিপনকে তোমার মনে পড়ে?'

পামেলার পেশীতে ঢিল পড়ল, সুস্থ বোধ করলেন তিনি। কংগ্রেস সদস্য আর তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মহিলা একটা পত্রিকার সম্পাদিকা। ওদের দু'জনকেই তাঁর ভাল লাগে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই—কি যে বলো! হাউ আর ইউ?'

আলাপ শুরু হলো।

কথা বলার ফাঁকে এক সময় পামেলা লক্ষ করলেন, আইসক্রীম তাঁবুর কাছে একজন ক্লাউন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে ঘিরে আছে পনেরো বিশজন শিশু-কিশোর। ক্লাউনের নামটা তিনি জানেন না, শুধু চেহারায় চেনেন। এই একই পোশাক পরে আগেও হোয়াইট হাউস পিকনিকে এসেছে লোকটা। গাঢ় কমলা রঙের চুল—রঙ করা। লাল স্যুট। দুধের মত সাদা মুখ—পেইন্ট করা, অবশ্যই। নাকটা টকটকে লাল। তাকে ঘিরে থাকা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালেন পামেলা। এক এক করে সবগুলো মুখ দেখলেন। হেসে ফেললেন তিনি।

শিশু-কিশোরের দলটা ক্লাউনের সাথে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করে চারপাশের দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল হাসি। হায়, ওদের মধ্যে তাঁর নিজের মেয়েটা যদি থাকত! একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন। নতুন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব জুটল।

কমলা রঙের চুল নিয়ে ক্লাউন লোকটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকল, আইসক্রীম তাঁবুর কাছাকাছি, পামেলা কনওয়ের চোখের কোণে। খানিক পর তার দিকে আরেকবার তাকালেন তিনি। শিশু-কিশোরদের দলটা আগের চেয়ে আরও বড় হয়েছে। এই

প্রথম তাঁর চোখে পড়ল, বাচ্চাদের ভিড়ের মাঝখানে আরও একজন ক্লাউন রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ট্র্যাম্প ক্লাউন–কালো টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি স্যুট পরনে, এক রঙা মুখে বড় বড় বহুবর্ণের চোখ আঁকা। দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারা গেল না, ক্লাউন মুখোশ পরে আছে, নাকি সত্যি সত্যি রঙ মেখেছে মুখে। এ-ও পরিচিত একটা দৃশ্য, তবে এই ক্লাউনকে আগে তিনি দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। কিন্তু আইডিয়াটা চমৎকার। ট্র্যাম্প ক্লাউন একটা বামন।

পামেলা বড় ক্লাউনের দিকে তাকালেন। দু'জনের চোখাচোখি হলো। ক্লাউনের রঙ মাখা চেহারায় কোন ভাব ফুটলেও বোঝার উপায় নেই। তবে তার হাত নড়ে উঠল। বামন ক্লাউনের কাঁধ ছুঁলো সে। হাস্যকর, বেমানান লাগল বামনটাকে। কাঁধে স্পর্শ পেয়ে মুখ তুলে বড় ক্লাউনের দিকে তাকাল সে। তারপর ওস্তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল পামেলা কনওয়ের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল বামন। তারপর অকস্মাৎ ওপর দিকে লাফ দিল সে। খিলখিল করে হেসে উঠল ছেলেমেয়ের দল।

বামন লাফাচ্ছে, ছুটছে। লাফাতে লাফাতে এদিকে আসছে।

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন পামেলা কনওয়ে। এত ছোট একটা শরীর, দেখলে মায়া হয়। আহা বেচারির মনে কত দুঃখ! কিন্তু এত কি আনন্দের ঘটল যে হঠাৎ এমন লাফাচ্ছে? এদিকেই বা আসছে কেন? এদিকে আসছে, তাঁর দিকে?

তারপর সমবেত অতিথিদের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠল একটা মধুর শব্দ।

'মা!'

সত্য উন্মোচিত হবার মুহূর্তে গলায় দম আটকে এল পামেলা

কনওয়ের। এখনও তাঁর বিশ্বাস করতে ভয় লাগছে। রঙচঙে মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। অপরিচিত পোশাকের ভেতর পরিচিত নড়াচড়া!

হঠাৎ সব ভুলে গেলেন পামেলা কনওয়ে।

লনের ওপর হাঁটু ঠেকালেন তিনি। বাহু দুটো বাড়িয়ে দিলেন সামনে। চিরন্তন একটা ভঙ্গি–বাহুডোরে ফিরে আসার জন্যে সন্তানের প্রতি মায়ের ব্যাকুল আহ্বান।

টিউলিপ! ও টিউলিপ!

পিছু হটল ভিড়। প্রতিটি মানুষ যেন স্তব্ধ পাথরের মূর্তি। কিন্তু এ-সব দিকে কোন খেয়ালই নেই পামেলা কনওয়ের। তিনি পাগলের মত হাসছেন। তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণপ্রিয় সন্তান। ওকে তিনি বাহুবন্ধনে আটকালেন। অস্থির করে তুললেন আদরে আদরে। চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিলেন মেয়ের রঙ করা মুখ।

'মা, আমার লাগছে!' হাঁস ফাঁস করে উঠল টিউলিপ।

চমকে উঠলেন পামেলা। উপলব্ধি করলেন, এতক্ষণ তিনি বুকের সাথে পিষছিলেন মেয়েকে। এখনও তাঁর ভয়, কেউ বুঝি আবার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে টিউলিপকে।

রিচার্ড কনওয়েও ছুটে এসেছেন। স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে তাঁরও কোন খেয়াল নেই। স্ত্রী এবং কন্যাকে জড়িয়ে ধরে আছেন তিনি। চোখ জোড়া চিকচিক করছে, কিন্তু হাসছেন।

দু'হাতে ধরে মেয়ের মুখ একটু উঁচু করলেন পামেলা। টিউলিপের চোখেও পানি, সে পানিতে তার মুখের রঙ এরই মধ্যে মুছে যেতে শুরু করেছে। নিজের মুখের সাথে মেয়ের মুখ আবার তিনি চেপে ধরলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন স্বামীর দিকে। কথা হলো না। শুধু দৃষ্টি বিনিময় হলো। চরম বিজয়। গভীর ভালবাসা। পরম শান্তি।

ওঁদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন এজেন্ট তার মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল, তারপর সগর্জনে নির্দেশ দিল একটা। কিন্তু পামেলা কনওয়ে খেয়াল করলেন না। লনের একদিকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা লাফ দিয়ে তৈরি হলো। আগে থেকে ঠিক করা পজিশনের দিকে ছুটল তারা। কিন্তু এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে।

ক্লাউন হাওয়া!

রঙিন পর্দার পিছনে দাঁড়াল রানা। ক্লাউন-স্যুট খুলে ফেলেছে, মঞ্চের তলায় ফেলে দিয়ে এসেছে সেটা। স্যুটের সাথে ফেলে দিয়েছে কমলা পরচুলা, লাল নাক, পাতলা রাবার মাস্ক। উপস্থিত আর সব অতিথিদের মত ওর পরনেও এখন অত্যন্ত দামী বিজনেস স্যুট।

ধনুকের মত বাঁকা গাড়ি-পথ ধরে ধীর পায়ে হেঁটে এগোল রানা। সামনেই লোহার গেট। গেট পেরিয়ে যেতে পারলেই স্বাধীনতা।

ওর পিছনে লন থেকে একটা শোরগোল ভেসে এল। ঘাড় ফেরাল রানা, টিউলিপকে তার মায়ের বুকে দেখতে পেল। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন রিচার্ড কনওয়ে।

পুনর্মিলন।

ওর দায়িত্ব ও পালন করেছে। এবার চাচা আপন পরাণ বাঁচা।

জানে, খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না। গেট আর বেড়ার বাইরে বেরিয়ে যাবার পর ওরা যদি ধাওয়া শুরু করে, চোখে ধুলো দেয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগেই যদি···

গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ও। গার্ডদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বড়সড় একটা বাড়িকে পাশে রেখে এগোল রানা। হোয়াইট

হাউসেরই একটা অংশ এই বাড়ি। সাদা ভ্যান গাড়িটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে, এটায় চড়েই এসেছে ও।

ঝনাৎ করে আওয়াজ হলো পিছনে। চেইন তুলে দেয়া হলো, বন্ধ হয়ে গেল গেট। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। এদিকেই আসছে। পিছন দিকে তাকাল না ও। একজন ক্লাউনকে খুঁজছে ওরা। তল্লাশি চালাবে সাদা ভ্যানে।

হাঁটার গতি একই রকম থাকল। শুধু বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে।

সামনে একটা বাঁক। বাঁক ঘুরে সেভেনটি[স্ট্রীটে পড়ল রানা। যেখানে রেখেছিল সেখানেই রয়েছে ফিয়াট একশো চব্বিশ স্পাইডার–শক্তিশালী ইঞ্জিনসহ ছোট একটা গাড়ি। যানবাহনের ভিড় গলে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। ছয় ব্লক দূরে আরও একটা গাড়ি রাখা আছে, একটা চার্চের সামনে, চার্চের নিজস্ব পার্কিং এরিয়ায়। শেষ গাড়িটা আছে একটা হাসপাতালের ভেতর, উঠানের একধারে। হাসপাতালটা ওয়াশিংটন সার্কেলের কাছে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা। লোকজনের ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল ও। পকেট থেকে স্পাইডারের চাবিটা বের করে হাতে নিল। ফুটপাথ থেকে নামল ও। গাড়িটার পিছন দিক হয়ে ড্রাইভার সাইডে চলে এল। কিন্তু আরও একজন লোক ফুটপাথ থেকে নেমে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে লোকটা। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে। ডানহাতে নিশ্চয়ই রিভলভারের বাঁট ধরে আছে। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। কোন কথা বলল না। রানা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

পিছন থেকে এগিয়ে এল আরও দু'জন।

তারপর কালো একটা গাড়ি ঠিক ওর পাশে এসে থামল। একটা সরকারি লিমুসিন। প্রথমে নামল ড্রাইভার। লিমুসিনের

নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে এল সে, দরজা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

লিমুসিনের পিছনে বসা লোকটা মৃদু হাসল। উত্তরে হাসতে পারল না রানা। ওর কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। চোখ জোড়া নিষ্প্রভ।

ধরা পড়ে গেছে রানা। লিমুসিনের পিছনের সীটে বসা ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছে ও। জেফ রিকার্ড। সি.আই.এ. চীফ।

চোদ্দো

'ভেতরে ঢুকুন,' জেফ রিকার্ড বললেন।

এক মুহূর্ত নড়ল না রানা। তারপর কথা না বলে গাড়ির ভেতর ঢুকল। সাথে অস্ত্র নেই, তিনজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে একা কি করতে পারে ও?

ড্রাইভারের উদ্দেশে মাথা কাত করলেন সি.আই.এ. চীফ, গাড়িটা আবার যানবাহনের দ্রুতগতি মিছিলে ঢুকে গেল। জেফ রিকার্ড একটা বোতামে চাপ দিলেন, ড্রাইভারের সীটের পিছন থেকে কাঁচের একটা পার্টিশন সিলিং পর্যন্ত উঠে গেল।

দক্ষিণ দিকে ঘুরে কনেকটিকাট এভিনিউয়ে পড়ল লিমুসিন, হোয়াইট হাউস এবং মলের দু'পাশে সরকারি ভবনগুলো অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ওরা।

রানা ভাবল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ল্যাংলিতে?

কাঁচের পার্টিশনের দিকে ইঙ্গিত করলেন জেফ রিকার্ড। 'সাউণ্ডপ্রুফ,' বললেন তিনি। 'আমরা কথা বলতে পারি।'

এক কথায় জানিয়ে দিল রানা, 'আমার মূড নেই।'

'তাহলে তো আমাকে একাই কথা বলতে হয়,' শ্রাগ করলেন সি.আই.এ. চীফ।

ভাল-মন্দ কিছুই বলল না রানা।

'জানতে ইচ্ছে করছে, মানসিকভাবে নিজেকে আপনি তৈরি করেছেন কিনা,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'কি ঘটতে যাচ্ছে, আশা করি নিশ্চয় আপনি তা আন্দাজ করতে পারছেন?'

'দু'জনের আন্দাজ দু'রকম হতে বাধ্য,' বলল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ও।

'আচ্ছা! আপনার বুঝি তাই ধারণা?' মৃদু হাসলেন জেফ রিকার্ড। 'ঠিক আছে, আমি কি আন্দাজ করেছি বলি, দেখুন আপনারটার সাথে মেলে কিনা।' নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'কিডন্যাপিঙের ম্যাক্সিমাম শাস্তি যাবজ্জীবন। জানি, দুনিয়ার সেরা আইনবিদরা আপনার হয়ে লড়বে। সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যাবে তারা। কিন্তু অপরাধটা পূর্ব পরিকল্পিত, আর বিস্তর সাক্ষী প্রমাণ থাকায় ম্যাক্সিমাম শাস্তি না দিয়ে বিচারকদের কোন উপায় থাকবে না। রায়ের শেষে তাঁরা শুধু বলবেন, আসামী ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে একমাত্র আমেরিকার প্রেসিডেন্টই শুধু সেটা বিবেচনা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। ঠিক জানি না, আপনি ক্ষমা ভিক্ষা নাও চাইতে পারেন, তবে আপনার পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খান, আপনার বস্, অবশ্যই শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

'কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাঁর আবেদন শুনবেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁরই মেয়েকে কিডন্যাপ করেছিলেন আপনি। ইতিমধ্যে, মামলা চলাকালে, রোমাঞ্চকর কিছু ঘটনা ঘটবে। হ্যাঁ, কমাণ্ডো

স্টাইলে হামলা চালানো হবে আপনাকে পুলিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। জেলখানায়, কোর্টে আনা-নেয়ার সময়। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হবে না। মঝখান থেকে শুধু শুধু কিছু লোক অকালে মারা যাবে। তারপর, সাজা ভোগ করার সময়, জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন আপনি। কিন্তু কারারক্ষীদের মনে থাকবে কার মেয়েকে আপনি কিডন্যাপ করেছিলেন, কাজেই আপনার ওপর বিশেষ নজর রাখবে তারা। তারমানে, কোন উপায় নেই, বাকিটা জীবন চোদ্দ শিকের ভেতরই কাটাতে হবে আপনাকে।' জেফ রিকার্ড চুপ করলেন, কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলছেন না যে? মিলল?'

'না,' বলল রানা, এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'মিলল না।'

'তাহলে তো শুনতে হয় আপনি কি আন্দাজ করেছেন,' আগ্রহের সাথে বললেন জেফ রিকার্ড।

'তার আগে একটা প্রশ্ন করি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনি তো আমার ফাইল পড়েছেন। ওতে এমন কিছু পেয়েছেন নাকি যাতে আমাকে ইডিয়ট বলে মনে হয়? মনে হয়, আমি একটা গর্দভ?'

কেমন একটু থতমত খেয়ে গেলেন জেফ রিকার্ড। 'না···মানে, ঠিক উল্টোটাই বরং মনে···'

'তাহলে কিভাবে ধরে নিলেন নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না রেখে বাঘের ঘরে ঢুকেছি আমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'তারমানে? আপনি জানতেন ধরা পড়ে যাবেন?'

'জানতাম ধরা পড়তে পারি।'

'এবং আপনি বলছেন, নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা আপনার করা আছে?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল রানা।

বিস্মিত হলেন জেফ রিকার্ড। 'জানতে পারি, কি সেটা?'

'অবশ্যই জানতে পারেন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এবং জানার পরই আমাকে নিয়ে আপনাদের যে প্ল্যান সেটা বাতিল হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, বাতিল করে দিতে বাধ্য হবেন।'

'প্লীজ বলুন, প্লীজ।' সকৌতুকে জানতে চাইলেন সি.আই.এ. চীফ।

'হেনরি পিকেরিং রাশিয়াকে কি কি তথ্য দিয়েছে আমি জানি,' বলল রানা। 'আরও জানি, কি কি ফাইল ল্যাংলি থেকে সরিয়ে গোপন জায়গায় রেখেছে সে, কিন্তু সময় আর সুযোগের অভাবে কে.জি.বি-র হাতে শেষ পর্যন্ত তুলে দিতে পারেনি। ফাইলগুলো কোথায় আছে তা-ও আমি জানি। টপ-সিক্রেট তথ্যগুলো পিকেরিঙের কাছ থেকে পাওয়ার পর কে.জি.বি সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের ডিফেন্স সিস্টেমে ব্যাপক রদবদল করে···।'

রানার কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিলেন জেফ রিকার্ড, হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'রাশিয়া ডিফেন্স সিস্টেম বদলালে আপনার তা জানার কথা নয়! এসব কিছুই আপনার জানার কথা নয়!'

'নয়। কিন্তু জেনেছি।' হাসল রানা। 'বলতে পারেন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড তথ্য। কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনারা উৎস থেকেও এ-সব তথ্য আবার সংগ্রহ করতে পারবেন।'

'পিকেরিং? ইয়েস, মাই গড, পিকেরিং!' রানার দিকে ঝুঁকলেন সি.আই.এ. চীফ। 'তারমানে আপনি জানেন কোথায় আছে সে?'

'জানি।'

'কোথায়?'

কথা না বলে মুচকি হাসল রানা।

একটু থেমে জেফ রিকার্ড বললেন, 'আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার আন্দাজটা মিথ্যে ছিল,' অকপটে স্বীকার করলেন তিনি।

'বলুন ভুল ছিল,' সংশোধন করে দিল রানা।

'না,' জেফ রিকার্ড বললেন, 'মিথ্যে ছিল।'

'মানে?'

'আপনাকে আসলে আমি যাচাই করছিলাম,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই আমি আন্দাজ করিনি। আপনার ভবিষ্যৎ কি তা আমি জানি।'

'জানেন!'

'ব্যাপারটা বোধহয় প্রথম থেকেই ব্যাখ্যা করা উচিত, একটা ব্যাখ্যা আপনার পাওনা হয়েছে,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'পিকনিক। ওটা একটা ফাঁদ ছিল।'

'হ্যাঁ, একটু দেরিতে বুঝেছি।'

'দুঃখিত, কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না। আপনার মত পিচ্ছিল মানুষকে আর কিভাবে আটকানো যেত বলুন! খুশি লাগছে এই ভেবে যে ফাঁদটা কাজে দিয়েছে।'

'কংগ্রাচুলেশন্স।'

চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ দুটো রুমাল দিয়ে মুছলেন জেফ রিকার্ড। 'আমি চাইনি ওখানে ওদের হাতে আপনি ধরা পড়ন। কারণ, প্রেসিডেন্ট চাইছেন একটা ট্রে-তে করে আপনার কল্লাটা তাঁর সামনে রাখা হোক।' আবার চশমা পরলেন তিনি, রানার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আমি আপনাকে অখণ্ড অবস্থায় রাখতেই পছন্দ করব।'

রানা একটা সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ ওর খেয়াল হলো: জেফ রিকার্ড কি বললেন? প্রেসিডেন্ট চান ওর শাস্তি হোক,

কিন্তু জেফ রিকার্ড চান না! 'তারমানে?'

'মানে হলো, মাসুদ রানা টিউলিপ কনওয়েকে কিডন্যাপ করতে পারে না। প্রথমে আমারও তাই ধারণা হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি ধারণাটা একদম ভুল।' মুচকি মুচকি হাসছেন জেফ রিকার্ড। 'কি করে রানা টিউলিপকে কিডন্যাপ করে, বলুন? টিউলিপ কিডন্যাপ হবার আগেই তো সে অসলো-য় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। দরকার হলে কবর থেকে আবার লাশ তুলব আমরা, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হব সত্যি ওটা মাসুদ রানারই লাশ। জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে টিউলিপকে কিডন্যাপ করেছিল কে?' শ্রাগ করলেন তিনি। 'জানি না। সারটভও হতে পারে। যে-ই হোক, সে পালিয়েছে।'

রানার মুখে কথা ফুটল না। জেফ রিকার্ডের মত ব্যক্তিত্ব মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবেন না। তারমানে প্রেসিডেন্টের চোখে ধুলো দেবেন তিনি। রানার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

একটা হাত তুলে জানালার বাইরেটা দেখালেন জেফ রিকার্ড। 'হোয়াইট হাউসের ওদিকে রাস্তার ওপারে, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট,' বললেন তিনি। 'কিন্তু তথাকথিত সুবিচার নিশ্চিত করা আমার কাজ নয়। আমার হাতে আরও অনেক সমস্যা আছে—যেমন, বিশ্বাস করতে পারি না এমন লোকজনে ভরা সি.আই.এ.। ওটা আমাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, এবং ক্ষীণ একটু আশা রাখি, অনুরোধ করলে কাজটায় আপনি হয়তো আমাকে কিছুটা সাহায্য না করে পারবেন না।'

'আসলে,' হাসি মুখে বলল রানা, 'প্রথম থেকেই আমি আপনাদের বিরুদ্ধে ছিলাম না।' গোটা ব্যাপারটা খুলে বলল ও।

'কিন্তু আমি সেটা অনেক পরে বুঝেছি,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'একটা সময় গেছে, যখন আপনাকে খুন করতে পারলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হত না। কিন্তু নসোসের পর, হ্যাঁ,

আপনার উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে। আপনি কি করতে চাইছেন, আমি আন্দাজ করতে পারি। টিউলিপকে হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দিয়ে কেটে পড়বেন। পিকনিকের আইডিয়াটা আমার ছিল, আপনি যাতে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পারেন।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, তারপর হঠাৎ রানার দিকে ফিরলেন। 'কংগ্রাচুলেশন্স, মি. রানা। আপনি একটা কাজই করেছেন।'

'কিন্তু আপনার হাতে আমি ধরা পড়ে গেলাম,' রানার গলায় ক্ষীণ একটু খেদ।

'তার কারণ আমার ব্যাপক ক্ষমতা,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'কিন্তু আপনার সাফল্যের কোন তুলনা হয় না। টিউলিপকে আপনি বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন, কারও সাহায্য ছাড়া, ওদিকে দুনিয়ার অর্ধেক ইন্টেলিজেন্স আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমি আর আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক ছাড়া এখনও কেউ জানে না আপনি কোথায়।' হাত তুলে বাতাসে ঝাপটা দিলেন তিনি। 'অতীত ইতিহাস। আপনার নতুন কেস হেনরি পিকেরিং। রানা এজেন্সির ফি খুব বেশি, জানি। কিন্তু পিকেরিংকে আমার খুব বেশি দরকার। আমাকে মক্কেল হিসেবে রানা এজেন্সি পছন্দ করবে তো?'

'নো, ফি,' বলে পকেট থেকে একটা চাবি বের করল রানা। বাড়িয়ে দিল জেফ রিকার্ডের দিকে। বলল, 'এটা আমি ডাকযোগে আপনার কাছে পাঠাতাম।'

'কিসের চাবি?'

'পিকেরিং।'

চাবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন জেফ রিকার্ড। তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'পিকেরিংকে আপনি কোনও ঘরে আটকে রেখেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্যাঁচার মত মুখ করে মেঝেতে পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।' ডাডিংটন প্লেসের ঠিকানাটা জানিয়ে দিল ও।

'সেক্ষেত্রে আপনারও একটা চাবি পাওনা হয়েছে,' বলে পকেট থেকে আর একটা চাবি বের করলেন জেফ রিকার্ড। চাবিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা। রিঙের সাথে একটা প্লাস্টিক ট্যাগও রয়েছে, তাতে রোড আইল্যাণ্ড এভিনিউয়ের একটা ঠিকানা। রূম নং ৩০২, একজিকিউটিভ হোটেল।

একটা বোতাম টিপলেন জেফ রিকার্ড। গাড়ির গতি কমে এল, ফুটপাথের পাশে থামল ড্রাইভার।

জেফ রিকার্ড রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

করমর্দন করল রানা। 'একটা সুতো ঢিল রয়ে গেছে,' বলল ও। 'রিপ নরটন নামে এক ক্লাউনকে দশ হাজার ডলার পেমেন্ট করতে হবে।'

'ঠিক আছে। কোথায় সে?'

'ইতিমধ্যে নাইরোবিতে পৌঁছে গেছে।'

'নাইরোবি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা।

নেমে গেল গাড়ি থেকে।

***